সুবোধ ঘোষ

ত্রিবেণী প্রকাশন

২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

লেখকের অন্যান্য বই

ভারত প্রেমকথা

ফসিল

ত্রিযামা

শ্রেয়সী

সুজাতা

কিংবদন্তীর দেশে

অমৃতপথযাত্রী

কুসুমেষু

রূপসাগর

শতকিয়া

পলাশের নেশা

শহরের পাকা চেহারার গা ঘেঁষে একটি কাঁচা চেহারার জায়গা। নাম রাজা-পার্ক। মিউনিসিপ্যালিটির হাতে আসবার পর থেকে রাজা-পার্কের অনেক উন্নতি হয়েছে।

মাঝখানে বেশ বড় একটা জংলা ঝিল ; সে-ঝিলের চেহারা এখন অবশ্য ঠিক সে-রকম জংলা নয়, যদিও এখানে-ওখানে সবুজ পানা আর জলো লতাপাতায় ঠাসা দাম দোলে, আর দামের উপর দাঁড়িয়ে বকের সারি ঝিমোয়। ঝিলের কোণে কোণে শালুক ফোটে ; এদিকে-ওদিকে জলপদ্মের পাতা ভাসে।

ঝিলের এ-পারে আর ও-পারে অনেকখানি জায়গা জুড়ে কাঁচা সবুজের মেলা। ঝিলের এ-পারের মাটিতে ফুলের ফসল একটু বেশী ফলে। তাই এ-পারটা একটু বেশী রঙিন। আর, ও-পারে বড় বড় গাছের সারি আর ছোট ছোট গাছের কুঞ্জ। ও-পারটা তাই একটু বেশী ছায়াঘন।

পূর্বদিকে একটা সাঁতারু ক্লাবের ঘর আছে ; পশ্চিমে একটা জিমনাসিয়াম। এ-পারে মাধবীলতার ঘেরান দেওয়া ছোট ছোট ঘরে মালীরা থাকে। তার মধ্যে একটি ঘর একটু বড়। সেই ঘরে থাকে সত্যনাথ।

ছায়াঘন ও-পারে একের পর এক অনেকখানি তফাত রেখে রেখে এক একটি লোহার বেঞ্চ পড়ে আছে। তাই সকাল ও বিকাল, সন্ধ্যায় ও রাতে ও-পারেই বেশী লোকের আনা-গোনা আর বৈঠক জমে। বাদামওয়ালার হাঁক ও-পারেই বেশী শোনা যায়।

পূজার জন্য ফুল খুঁজতে এসে বুড়ো ভদ্রলোকেরা এ-পারের ঝোপেঝাপে উকিঝুকি দিয়ে খোঁজ করেন—হেড মালীটা কোথায় গেল ?

সত্যনাথ হঠাৎ দেখা দিয়ে প্রশ্ন করে, "কী খুঁজছেন স্যার" ?

পাঁচ বছর কাজ করার পর সত্যনাথের মাইনে এখন একটু বেড়েছে। এখন বেয়াল্লিশ টাকা পায়। মালীরা সত্যনাথের কাছেই আক্ষেপ করে, "তোমার ত তবু কিছু বেড়েছে মাস্টার, আমাদের যে এক পয়সাও না !"

সত্যনাথের ঘরটাই হল বাগানের অফিস-ঘর। আর, অফিস বলতে ঐ একটি বড় খাতা। পার্কের মরা গাছের কাঠ ওজন করে তার হিসাব ঐ একটি বড খাতাতেই লিখে রাখে সত্যনাথ। মালীদের হাতে এক-আধ তোলা ফুলের বীজ যখন তুলে দিতে হয়, তখন তারও একটা হিসাব লিখে রাখতে হয়। কিছু লেখা-পড়া জানে সত্যনাথ, তাই হেড মালী হয়ে বেয়াল্লিশ টাকা পর্যন্ত উঠতে পেরেছে।

সত্যনাথও মালীদের আক্ষেপের উত্তরে ওর নিজেরই জীবনের একটা আক্ষেপ শুনিয়ে দেয়, "ওরে ভাই, যদি গরিব না হতাম, আর, সামান্য এক-আধটা পাস-টাস দিতাম, তাহলে আমিও যে আমার মেজ মামা দিবাকর মুখুজ্যের মত বুক ফুলিয়ে সাহেবের দোকানে হিসাব লিখতাম। এই বেয়াল্লিশ টাকার প্যাঁচে জড়িয়ে পড়ে থাকতাম না।"

সকালবেলা জিমনাসিয়ামে এসে যে-সব ছেলেরা কসরত করে, তারা বলে, "আসুন মাস্টারদা, আর একবার পীককটা একটু দেখিয়ে দিন।"

বেশ খুশী হয়ে, প্যারালাল বারের উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সত্যনাথ। কত সহজে, একটু দুলতেও হয় না, সত্যনাথ তার মজবুত দুটি হাতের উপর ভর দিয়ে আকাশের দিকে পা ছুঁড়ে দিয়ে পীকক হয়।

ছেলেরা বলে, "রিং-এর টি-ফিগারটা আর একবার, মাস্টারদা!"

সত্যনাথ বলে, "আজ থাক।"

তারপর আর দেরি না করে চলে যায় সত্যনাথ। কাজের জীবন শুরু হয়ে যায়। একটি ময়লা হাফপ্যাণ্ট পরে, ময়লা গেঞ্জি গায়ে দেয়, কোমরে গামছা জড়ায়, খুরপি ঝারি হাতে নিয়ে পার্কের এ-পারের মাটির এখানে-ওখানে আর ঝোপে-ঝোপে কাজ করতে থাকে সত্যনাথ। বয়সটা বোধ হয় বত্রিশ হল। কাজ করতে করতে সত্যনাথের মনটাও যেন নীরবে হিসাব করে। খড়দহ থেকে ছোট খুড়ির চিঠি এসেছে—তোমার মতিগতি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি কি ঠিক করিয়াছ যে বুড়ি খুড়িমাতা বেটি মরিয়া যাইবার পর বিবাহ করিবে?

বিকাল হলে এহেন সত্যনাথই একেবারে মিথ্যানাথ হয়ে ওঠে। সত্য-নাথের কপালে তখন আর সেই মাটিমাখা ঘামের চিহ্নও থাকে না। বেশ ফরসা একটি আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে দেয়, সরু কালো পাড়ের ফরসা ধুতি পরে। আর পায়ে থাকে লাল নাগরা চটি। পান বিড়ি সিগারেটের

হাঁক শুনতে পেলেই এগিয়ে যায় সত্যনাথ; দু পয়সা দিয়ে একটি সিগারেটও কেনে।

আস্তে আস্তে আয়েস করে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ে সত্যনাথ। আস্তে আস্তে হাঁটে, ঝিলের চারদিকে একটা পাক দিয়ে বেড়িয়ে এসে আবার এ-পারের মালীঘরের কাছে ফিরে আসে। সত্যনাথের জীবনটা রোজই বিকালে যেন ফাঁকি দিয়ে এই পৃথিবীর পরিচ্ছন্ন জনতার গায়ের হাওয়া নিজের গায়ে লাগিয়ে এই ভাবে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ায়, তারপর ফিরে এসে ঐ মাধবী লতার ঘেরানের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

এগিয়ে যায় সত্যনাথ; মরসুমী ফুলের নতুন কেয়ারিটার দিকে তাকায়। তারপর ওদিকে। বকুল টগর আর স্থলপদ্মের তিনটে চারাঘর। ছোট ছোট বকুল-চারার ঝুঁটি ধরে হেলিয়ে দুলিয়ে দেখতে থাকে সত্যনাথ, পাতাগুলো চুপসে গেল কেন।

সেদিন বিকালের আলো যখন প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, আর স্থলপদ্মের চারাগুলির গা থেকে টোকা দিয়ে দিয়ে কুচো শামুকের কামড় ছাড়িয়ে দিচ্ছে সত্যনাথ, ঠিক এমনই শখের কাজের সময়ে একটি ডাক শুনে চমকে উঠতে হল। কে যেন হঠাৎ এসে প্রশ্ন করছে, "আপনি কি এই রাজা-পার্কের কেয়ার-টেকার?"

বুঝতে না পেরে, এবং বেশ বিব্রতভাবে পাঞ্জাবির পকেটে কোঁচার খুঁট গুঁজে, তারপর রুমাল বের করে হাত মুছতে মুছতে সত্যনাথও প্রশ্ন করে, "আজ্ঞে?"

প্রশ্ন করছেন এক মহিলা। দেখতে বেশ সুন্দর ও অল্প বয়সের একজন মহিলা। পায়ে ভেলভেটের চটি, গায়ে ফিনফিনে ভয়েলের শাড়ি, গলার সোনার হারে নীল পাথরের লকেট। সিঁদুরের সরু একটা দাগও মহিলার সিঁথির ফাঁকে শুকিয়ে আছে মনে হয়। বড় বেশী ব্যস্ত মহিলার হাবভাব, বড় বেশী তীব্র হয়ে ছটফট করছে মহিলার চোখের দৃষ্টি।

আবার প্রশ্ন করেন মহিলা, "আপনি বোধ হয় বোটানিস্ট?"

"আজ্ঞে?" সত্যনাথ আবার বিব্রত বোধ করে; চোখের রকমটাই যেন লজ্জা পেয়ে আমতা-আমতা করে।

মহিলা চেঁচিয়ে ওঠেন, "বলুন না, আপনি এই পার্কের কেউ কিনা?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"দয়া করে আপনার নামটা বলুন।"

"সত্যনাথ বন্দোপাধ্যায়।"

"আমাকে একটা খবর দিতে পারবেন ?"

"বলুন।"

"দেখতে বেশ ফরসা আর লম্বা, তসরের ট্রাউজার পরেন, গলায় লাল রং-এর টাই, এই রকম কোন ভদ্রলোক কি এখানে কোন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে আসেন ?"

উৎসাহের সঙ্গে উত্তর দিতে গিয়ে সত্যনাথও চেঁচিয়ে ওঠে, "হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই ত তাঁরা দুজন, এই দশ মিনিট আগে এই পথ দিয়ে ওদিকে গিয়েছেন।"

"কোন্ দিকে ?"

"ঐ যে ঝিলের ও-পারে ; পলাশের কাছে একটা বেঞ্চি আছে, সেখানে।"

"ওখানে তাঁরা কী করেন ?"

"আমি ত দেখতে পাই, দুজনে বেঞ্চির উপর বসে গল্প করেন।"

"মহিলা খিল খিল করে হাসেন না ?"

"আজ্ঞে ?" সত্যনাথ অপ্রস্তুত হয়ে মহিলার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে, এই মহিলার মাথায় কোন দোষ নেই ত ? মহিলার সুন্দর দুটি কালো-চোখের তাকানিটা জ্বলছে কী ভয়ানক! বেশ একটু ভয়ে-ভয়ে উত্তর দেয় সত্যনাথ, "তা প্রায়ই ত শুনতে পাই ; সত্যিই সেই মহিলা একটু বেশী হাসেন।"

মহিলার গলার হারের নীল লকেটে শেষ-বিকালের লাল আলো মৃদু মৃদু জ্বলে। চুপ করে কী যেন ভাবছেন মহিলা। তারপর আনমনার মত বিড় বিড় করেন, "মহিলা দেখতে কেমন ? আমার মত কুৎসিত ?"

সত্যনাথ হাসে, "এ আবার কী রকম কথা বলছেন ? সে-মহিলা দেখতে ভালই, আর আপনিও ত…।"

মহিলা আর একবার যেন নিজের মনেই চমকে ওঠেন, মুখে রুমাল ছুঁইয়ে কিছুক্ষণ কী ভাবতে থাকেন। তারপরই প্রশ্ন করেন, "ওরা কখন আসে আর কখন চলে যায় ?"

"আজকাল বিকাল হতেই আসেন, আর বেশ একটু রাত হলে চলে যান!"

"দুজনে দুজনের হাত ধরে থাকে বোধ হয় ?"

"তা ত লক্ষ্য করিনি। মহিলার হাতে একটা ক্যামেরা থাকে দেখেছি।"

বিকালের আলো আর নেই, ঝিলের ও-পারের ছায়াঘন চেহারা বেশ কালো-কালো হয়ে এসেছে। ঝিলের পদ্মপাতার পাশে জলের মধ্যে একটা বড় তারার ছায়া আস্তে আস্তে কাঁপে। সন্ধ্যাতারা উঠেছে। ওপারের কালোর মধ্যেও ফাঁকে ফাঁকে ল্যাম্পপোস্টের মাথা জ্বলে উঠেছে। ঝিলের ও-পারের আলো আর কালোর দিকে আর না তাকিয়ে ক্লান্ত মানুষের মত আস্তে আস্তে হেঁটে পার্কের গেটের দিকে চলে গেলেন মহিলা। দেখতে পায় সত্যনাথ, গেটের কাছেই একটা রিকশার উপর উঠে বসলেন সেই নীল পাথরের লকেট-দোলান মহিলা।

সন্ধ্যাতারা ফুটে উঠতেই ঝিলের ছায়াঘন ও-পারের এক লোহার বেঞ্চে বেশ ফরসা ও লম্বা অমিয়কুমারের পাশে বসে খিল খিল করে হেসে ওঠে যে, তারই হাত ধরে অমিয়ও হাসে। "সত্যি বলছি বেলা, আমার কথাটা তুমি একবার বিশ্বাস কর, আজকাল আর কোন অশান্তি সৃষ্টি করে না নমিতা। একেবারে চুপ হয়ে গিয়েছে।"

দু হাত তুলে খোঁপাটাকে চেপে ধরে, আর শরীরটাকে একটু টান করে, অতি লঘু একটা মোচড় দিয়ে ঘাড়টিকে দুলিয়ে অমিয়র কাঁধে কনুই দিয়ে মৃদু একটি অবিশ্বাসের আঘাত সঁপে দেয় বেলা। "যতই বল, আমি একটুও বিশ্বাস করি না।"

"বিশ্বাস কর বেলা।"

"এটা না হয় বিশ্বাস করলাম, কিন্তু আর একটা? সেটা ত বিশ্বাস করতে পারি না।"

"সেটা আবার কী?"

"সেটা হল তুমি। তুমি কি ঘরে চুপটি করে থাকতে পার? নমিতার সঙ্গে দুটি কথা না বললে যে তোমার প্রাণ আই-ঢাই করে।"

"মিথ্যে কথা। কোনদিন আই-ঢাই করেনি, আজও করে না। এমন কি, ফুলশয্যার রাত্রিতেও নমিতার সঙ্গে আমি বিশেষ কোন কথাই বলিনি। সারা রাত তোমারই কথা ভেবেছিলাম।"

আবার খিল খিল হাসি। বেলা বলে, "কী যেন সেই কথাগুলো, বিয়ের আগের দিন, সেই যে একখানা মস্ত বড় প্রেমের চিঠিতে নমিতা তোমাকে

লিখেছিল ? 'জীবনে শুধু একটী বার তোমার গলা জড়িয়ে ধরতে চাই, তারপর যদি মরেও যেতে হয়...' "উঃ, কী কাণ্ডরে বাবা ! ভদ্রলোকের মেয়ে হয়ে একজন পুরুষ ভদ্রলোককে চিঠিতে এ-সব কথা লিখতে...উঃ, ছি ছি।" বলতে বলতে শিউরে ওঠে বেলা ; তারপরেই যেন বিপুল এক অভিমানের ভারে অলস হয়ে অমিয়র মুখের একেবারে কাছে বড় বড় চোখ দুটিকে ভাসিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করে, "কিন্তু আমি কি কোন দিন চিঠিতে তোমাকে ওসব কথা লিখেছি ?"

"কোন দিনও না।"

"কেন লিখিনি ? কেন লিখতে পারিনি ? বল, শিগগির বল।"

"লেখবার দরকার কী ?"

"ঠিক বলেছ, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারনি। যে-মানুষ কাজে ওসব করে দেখাতে পারে, সে ও-সব কথা চিঠিতে লেখে না। আর, যে চিঠিতে ও-সব কথা লিখতে পারে, সে কাজে ও-সব করতে পারে না।"

"বুঝেছি বেলা।"

হঠাৎ শক্ত করে অমিয়র হাত চেপে ধরে বেলা। "এইবার বল একেবারে দিব্যি করে বল।"

"কী ?"

"নমিতা কি কোনদিন তোমার সঙ্গে ওসব কাণ্ড...!"

"কোন দিনও না।"

"তুমি কোন দিন...।"

"এক দিনও না।"

শান্ত হয় বেলা। অমিয়র কোলের উপর বেলার অলস হাতটা এইবার ঢলে পড়ে। অমিয়র সঙ্গে বেলার তিন বছরের ভালবাসার ইতিহাসটাই যেন একটা সংশয়ের দংশন থেকে মুক্ত হয়ে এতক্ষণে হাঁপ ছাড়ে, স্বস্তি পায়।

ভরা ঝিলের জলের মত টলটল করে বেলা ঘোষের চেহারাটা। পলাশের ঐ শাখার মত যেন হঠাৎ নতুন হাওয়ার ছোঁয়া লেগে বেলার চেহারাটা দোলে, সেই সঙ্গে দোলে পায়ের উপর তোলা পা। হাই-হিল জুতোর উপর বেলার রঙিন শাড়ির বর্ডার-এর লেসও লুটিয়ে লুটিয়ে দুলতে থাকে। বেলার সিঁথিতেও সিঁদুরের দাগ আছে। বেলার ক্যামেরার পাশে একখানা ইংরেজী নভেলও পড়ে আছে। নভেলের প্রথম পাতায় একটা নামও লেখা আছে, টি এন ঘোষ।

অমিয় বলে, "মিষ্টার ঘোষ কি এখনও তোমাকে চিঠি লিখে বিরক্ত করছেন ?"

"না, এখন একেবারে থেমে গিয়েছেন। যদি আবার ও-সব বাড়াবাড়ি করেন, তবে আমি একেবারে আইনমত সেপারেট হয়ে যাব।...কিন্তু...কিন্তু... আমার কী উপায় হবে অমি ?"

বেলার চোখে জল। মাথা ঝুঁকে পড়েছে। বেলার পিঠে হাত বুলিয়ে সান্তনা দেয় অমিয়, "বল, আমি তোমার জন্য কী করতে পারি ?"

"কিছু করতে হবে না। আমি আবার দার্জিলিং-এ গিয়ে সেই একশ টাকা মাইনের চাকরিটা নিয়ে, যত বাজে বড়-লোকের লোভ আর উইকেডনেস থেকে প্রাণটাকে বাঁচাতে বাঁচাতে, হয়রান হয়ে, পাগল হয়ে, মরতে মরতে...।"

ছলছল করতে করতে বেলার গলার স্বরটা যেন হঠাৎ একটা ঢেউ হয়ে আছাড় খেয়ে ভেঙে পড়তে চাইছে। অমিয় বলে, "আমি ত তোমাকে আগেই কথা দিয়েছি বেলা, বেহালার বাড়িটা তোমাকেই গিফ্‌ট করে দেব।"

"কবে ?"

"ধর, এই পুজোর ছুটির পরেই দু-এক দিনের মধ্যে।"

"কত রাত হল অমি ?"

"বেশী নয়। আরও কিছুক্ষণ থাকা যাক।"

"সত্যনাথবাবু।"

বিকালের শেষে সন্ধ্যাটা একটু আবছাময় হয়ে উঠেছে, মাধবীলতার ঘেরানের পাশে দাঁড়িয়ে ডাক শুনতে পেয়ে চমকে ওঠে সত্যনাথ। গলার সোনার হারে নীল পাথরের লকেট, সেই মহিলা আবার এসেছেন।

কাছে এগিয়ে আসেন মহিলা। প্রশ্ন করেন, "আজও কি ওরা আবার এসেছে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কী বলাবলি করছিল ওরা ?"

"আমি ও-সব কিছুই শুনিনি।"

"আমার মনে হয়, আজকাল সকালের দিকেও ওরা এখানে একবার আসে।"

"না, সকালের দিকে আসেন না।"

"নিশ্চয় আসে।"

"আজ্ঞে না।"

"আপনি কেমন করে দেখবেন যে, ওরা সকালের দিকে আসে কি না আসে?"

"আমি সব সময় এখানেই থাকি যে।"

মহিলার চোখে যেন একটু আশ্চর্যের আভা চমকে ওঠে। "আপনি এখানে সব সময় থাকেন, তার মানে?"

"আমি এখানেই কাজ করি।"

"কিসের কাজ?"

কুণ্ঠিতভাবে মুখে হাসি টেনে সত্যনাথ বলে, "সামান্য একটা কাজ। কেউ বলে বাগান-মাস্টারের কাজ, আবার অনেকেই বলে, হেড মালীর কাজ।"

মহিলা যেন আনমনার মত বলতে থাকেন, "তার মানে, এই সব মাধবীলতা, বকুল-চারা, গাছের ছায়া আর ঝিলের শালুক নিয়ে পড়ে আছেন আপনি? বাঃ, বেশ সুন্দর চাকরি করেন দেখছি?"

সত্যনাথের মনটাই যেন হাঁফ ছেড়ে একটা ভয়ের ভার থেকে মুক্ত হয়ে খুশিতে মুখর হয়ে ওঠে, "তা ঠিকই বলেছেন। সকাল-সন্ধ্যা ঐ নিয়েই আছি।"

সন্ধ্যাতারা উঠেছে অনেকক্ষণ আগেই। ঝিলের ও-পারের আলো আর কালোর দিকে তাকিয়ে থাকেন মহিলা। তারপর আস্তে আস্তে হেঁটে পার্কের গেটের কাছে গিয়ে যেন এক রহস্যময় রিকশার কোলে চড়ে এই জগৎ থেকে অদৃশ্য হয়ে যান।

আর, ঠিক সেই মুহূর্তে খিল খিল করে হেসে ওঠে ঝিলের ছায়াঘন ও-পার।

বেলা প্রশ্ন করে, "শুধু শুয়ে শুয়ে বই পড়ে; আর কিছু করে না নমিতা?"

অমিয় বলে, "না।"

"তোমার মুখের দিকে একটিবার তাকায়ও না?"

অমিয় হাসে, "তা, মাঝে মাঝে তাকায় বৈকি।"

"উদ্দেশ্যটা কী?"

"তা বলতে পারি না।"

"বোধহয়, শুধু একটিবার তোমার গলা জড়িয়ে ধরে তখখুনি মরে যেতে চায়।"

খিল খিল করে হেসে দুলতে গিয়ে বেলা ঘোষের কাঁধ থেকে পিছল সিল্কের শাড়ির আঁচল আরও পিছল হয়ে পড়ে যায়।

অমিয় হাসে, "তোমার সন্দেহটা একেবারে মিথ্যে নয় বেলা। আমারও মনে হয় যে…।"

বেলা বলে, "তোমার গলাটি জড়িয়ে ধরে, তোমার দমটি বন্ধ করে দিয়ে, নিজে বেশ টগবগ করে বেঁচে থাকতে চায় নমিতা, এই ত ওর মতলব। কেমন? ঠিক বলেছি কি না? কথা বলছ না যে?"

"বলবার আর কী আছে? তুমি ঠিকই ধরেছ বেলা। এই তিন বছর ধরে অকারণে শুধু সন্দেহ করে করে নমিতা আমাকে সকাল-সন্ধ্যা ঘরেব ভেতরে আটক করে রাখবার চেষ্টা করেছে।"

"মিস্টার ঘোষও আমাকে পাঁচটি বছর ঐরকম যন্ত্রণা দিয়েছিলেন।"

"কী আশ্চর্য!" অমিয়র গলার স্বরও যন্ত্রণায় আক্ষেপ করে ওঠে, "শুধু বিয়ে করা হয়েছে, এই জোরে ওরা মানুষকে আটকে রাখতে চায় বেলা, ভালবাসার জোরে নয়।"

সন্ধ্যাতারা ফুটে ওঠে আবার। রাজা-পার্কের জংলা ঝিলের এ-পারে মাধবীলতার ঘেরানের কাছে আলো আর ছায়ার পাশে পাশে সত্যনাথের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বেড়াতে থাকেন মহিলা; গলার হারের নীল পাথরের লকেটও যেন আলোর ছোঁয়া পেয়ে জ্বলে ওঠে, আবার কালোর ছোঁয়া লেগে নিভে যায়। মহিলার কালো চোখের তারা হঠাৎ বড় বেশী আশ্চর্য হয়ে যেন ঝিলিক দিয়ে ওঠে। "এ কী কথা বলছেন সত্যনাথবাবু? এ যে একটা ভয়ানক রূপকথা!"

সত্যনাথ হাসে, "তা আপনি যা-ই বলুন। এই জন্যই মিউনিসিপ্যালিটি আর পুলিশ আমাকে একটু খাতির করে। আর, এই জন্যই বোধহয় এই চাকরিটা আজও আছে। নইলে কবেই চলে যেতে হত।"

মহিলা শঙ্কিতভাবে বলেন, "যা-ই হক, আর এরকম ভয়ানক কাজের মধ্যে যাবেন না সত্যনাথবাবু।"

"আপনি মিথ্যে ভয় করছেন। এই জংলা ঝিলের জলে নামতে

আমার একটুও ভয় করে না, বরং বেশ…কেমন যেন…ইয়ে…একটা মজা লাগে।"

হ্যাঁ, মিথ্যে বলেনি সত্যনাথ। রাজা-পার্কের এই জংলা ঝিলের জলে নেমে, একেবারে জলের গভীরে গিয়ে ডাকাতের মত উল্লাস নিয়ে হাতড়ে হাতড়ে মাটির পৃথিবীর এক একটা দুঃখের শরীরকে তুলে নিয়ে আসতে হেড মালী সত্যনাথের প্রাণে বোধহয় একটা মজাই লাগে। এই পাঁচ বছরে এই ঝিলের জলের আড়াল থেকে কম করেও পঞ্চাশটি লাশ তুলেছে সত্যনাথ। সাঁতারে কুমিরও ওর কাছে হার মেনে যাবে বোধ হয়। কী ভয়ানক দম বন্ধ করে রাখতে পারে সত্যনাথ! জিমনাসিয়ামের ছেলেরা ঘড়ি ধরে পরীক্ষা করে দেখেছে, জলের নীচে তলিয়ে গিয়ে পুরো তিনটি মিনিট পরে তাজা শুশুকের মত হুস করে ভেসে উঠল সত্যনাথ।

সত্যনাথ হাসে, "এই রূপকথার কৃপায় কিছু রোজগারও ত করেছি।"

মহিলা আশ্চর্য হন, "রোজগার?"

"হ্যাঁ। একটা লাশ তুলতে পারলে পুলিশ দু টাকা আর মিউনিসিপ্যালিটি দু টাকা বকশিশ দেয়।"

হ্যাঁ, এ এক ভয়ানক রূপকথা। পৃথিবীর যত লজ্জা ভয় আর দুঃখ, যত জ্বালা হতাশা আর নিষ্ঠুরতা যেন এক একটা প্রাণকে চিরকালের মত নীরব করে দেবার জন্য এই জংলা ঝিলের বুকে ছুঁড়ে দেয়, আর ঝিলের জল আদর করে একেবারে বুকের গভীরে নিয়ে গিয়ে তাদের লুকিয়ে রাখে। সব সময় জাল ফেলে তাদের তোলা যায় না। পুলিশের লোক হয়রান হয়। ঝিলের জলের আড়ালে যে লক্ষ লক্ষ সাপের জটলার মত ডুবো লতার ঝোপ ছড়িয়ে আছে! কে জানে, কোন ডুবো ঝোপে ফেঁসে আছে লাশ? কিংবা জলের তলের সেই অথৈ পাঁক, যেন তুলতুল করছে নরম মরণের লালা। কিন্তু আঠার মত তার ছোঁয়া, ফোকলা পাগলের কামড়ের মত কি শক্ত সেই পাঁকের কামড়!

ডুবো লাশ তুলবার আগে শুধু লম্বা একটা লগি হাতের কাছে ভাসিয়ে রেখে ঝিলের এদিক-ওদিকে সাঁতার দেয় সত্যনাথ। ছোট হাফ-প্যান্টের কোমর শক্ত করে গামছা দিয়ে বাঁধা। এই সময় সত্যনাথের চেহারাটাকে দেখতে বড় অদ্ভুত লাগে। যেন মাটির মানুষের তাজা প্রাণের একটা সুন্দর

অহংকার জলের বুক তোলপাড় করছে। সত্যনাথ যেন জলের গায়ের চোরা গন্ধ শুঁকে বুঝতে পারে, কোথায় থাকতে পারে লাশ। খাড়া লগি পুঁতে দিয়ে একটি ডুব দেয় সত্যনাথ। ডুবো লতার জাল ছিঁড়ে মানুষের লাশ বের করে সেই লাশকে একটি হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে দুমিনিটের মধ্যে উপরে ভেসে ওঠে। ঝিলের কিনারায় দাঁড়িয়ে লোকের ভিড় চটপট হাততালি দিতে থাকে।

সত্যনাথ হাসে, "ঝিলের জল আমার ওপর বড্ড রাগ করে; তাও বুঝতে পারি। ডুবো লতার জাল কিলবিল করে কতবার আমাকে বেঁধে ফেলবার চেষ্টা করেছে। পাঁকের জোঁক কান কামড়ে ধরেছে। বুড়ো সাপ চোখের উপর লেজের বাড়ি মেরেছে, জলে উঠেছে বুড়ো সাপের আঁশ। আমি কিন্তু……!"

নীল পাথরের লকেট শিউরে ওঠে, "ছিঃ, আপনি কেন এই সব পচা-গলা নোংরামি উদ্ধারের জন্য……।"

হ্যাঁ, এই পৃথিবীর জীবন থেকে যত গ্লানি যেন ছুটে গিয়ে ঐ ঝিলের জলের আড়ালে মুখ লুকোয়। কেউ পাগল হয়ে; কেউ কুষ্ঠরোগের ঘৃণা আর জ্বালা সইতে না পেরে; কেউ ভালবেসে ঠকে গিয়ে; কেউ গোপন পাপের লজ্জায় চমকে উঠে এই জংলা ঝিলের জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আর মরেছে। বৃদ্ধ ও যুবক, গর্ভবতী বিধবা আর কুমারী, তহবিল-তছরুপের ক্যাশিয়ার আর মামলায় হেরে-যাওয়া সর্বস্বান্ত জমিদার! সত্যনাথের হাত ঝিলের ঠাণ্ডা জলকে ঘাঁটিয়ে আর ক্ষুব্ধ করে লুট করে আনে মাটির পৃথিবীর যত কলঙ্কের প্রমাণ। খুনীর ছুরিতে গলা-কাটা মানুষের প্রাণহীন দেহ, কিংবা মাছে খোবলান একটা শিশু-শরীর; নাড়ী-জড়ান একটা পিণ্ড, সেই শিশুর বয়স এক ঘণ্টাও হবে কিনা সন্দেহ। জংলা ঝিলের জলের কাছে যে-জিনিস এত আদরের ঐশ্বর্য, সে-জিনিস লুট করে আনলে জলের যে রাগ হবারই কথা।

সত্যনাথ হাসে, "তবে আমার কেমন একটা দুঃখও আছে। বড় দেরিতে খবর পাই; আমি এসে জলে নামবার আগেই সুইসাইড হাসিল হয়ে যায়। জলের ভিতরে মানুষটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে তখুনি বুঝতে পারি, হয়ে গেছে। একবার অবিশ্যি……।"

মহিলার গলার স্বর কেঁপে ওঠে, "কী?"

"একটা বাচ্চা ছেলে জলে পড়ে গিয়েছিল। হাঁক-ডাক শুনে ছুটে এসে তিন ডুবে তিন মিনিটের মধ্যেই ছেলেটাকে পাঁক থেকে ছাড়িয়ে নিলাম। জড়িয়ে ধরেই বুঝলাম, ধুকপুক করছে ছেলেটার বুক। কিন্তু……কী বলব……ভেসে ওপরে উঠতেই ছেলেটা আমারই বুকের ওপর ঠাণ্ডা হয়ে নেতিয়ে পড়ল। বাঁচেনি ছেলেটা··এ কী, আপনি কাঁদছেন কেন? ঠিকই · ···এসব কথা আপনার কাছে বলা ভুল হয়েছে, বুঝতে পারিনি।"

রুমাল দিয়ে চোখ মোছেন মহিলা। তারপরেই সত্যনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে যেন দু চোখের নিবিড় কালোর সব আশ্চর্য ঢেলে দিয়ে দেখতে থাকেন। তারপর বলেন, "আপনি সত্যিই সুন্দর একটি রূপকথা, সত্যনাথ বাবু।"

ঘেরানের মাধবীলতার দোলায় সন্ধ্যার বাতাস ফুরফুর করে। মহিলা বলেন, "আমি তাহলে আজকের মত···এখন যাই, কেমন?"

সত্যনাথ বলে, "আসুন।"

ঝিলের এ-পারে, রাজা-পার্কের ফটক পার হয়ে চলে গেল সোনার হারের নীল পাথরের লকেট। আর, ছায়াঘন ও-পারে পলাশের কাছে তখন কালো আর আলোর মধ্যে খিল খিল হাসির স্বর হেলে দুলে লুটিয়ে পড়তে থাকে।

বেলা ঘোষ বলে, "কী আশ্চর্য, এ আবার কোন বুজরুগি ধরল নমিতা?"

অমিয় বলে, "ধরলে আমি আর কী করব বল?"

"তোমার দিকে না হয় ভুলেও একবার তাকায় না, কিন্তু কোন দিকে তাকায়?"

"একটা খাতার দিকে! আজকাল সব সময় নমিতার হাতে একটা খাতা থাকে, তার মধ্যে যা খুশি তাই, কী-সব যেন লেখে।"

সন্ধ্যাতারা ফুটে ওঠবার অনেক আগে। তখন পশ্চিমের আকাশে ফাল্গুনের বিকাল বেলার রূপ মাত্র একটু রঙিন হয়েছে। রাজা-পার্কের হেড মালীর ছোট ঘরের প্রায় দরজা পর্যন্ত এসে সোনার হারের নীল পাথরের লকেট ঝিক করে হেসে ওঠে।

সত্যনাথ এগিয়ে এসে বলে, "কখন এসেছেন?"

"এই ত আসছি।"

সত্যনাথ তার ফরসা আদ্দির পাঞ্জাবির পকেটে ফরসা ধুতির কোঁচা

গুঁজে দিয়ে, হঠাৎ যেন বড় বেশী ফুল্ল হয়ে, সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বলে ওঠে, "একটা সুখবর আছে।"

মহিলা হেসে ওঠেন, "ওরা বোধ হয় আজ আর আসেনি ?"

"বলেন কী ! ওরা ত আজ সেই দুপুর থেকেই এসে বসে আছে।"

"যাকগে ওদের কথা। আপনার কথা বলুন।"

"এই বাগান-মাস্টারির কাজ ছেড়ে দিয়ে আমি কালই চলে যাচ্ছি।"

কেঁপে ওঠে নীল পাথরের লকেট, "কী বললেন ?"

"যাচ্ছি শিউড়িতে, একটা স্কুলের জিমনাষ্টিক মাষ্টারের কাজ পেয়েছি, মাইনে আশি টাকা।"

নীরব হয়ে, আর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, বেশ কিছুক্ষণ ধরে মাধবীলতার ঘেরানের দিকে তাকিয়ে রইলেন মহিলা। ফিনফিনে ভয়েলের শাড়ির আঁচল তুলে কপালটাকে আস্তে আস্তে মুছতে থাকেন। তারপর যেন আধ ঘুমে জড়ান ভাষার মত আস্তে আস্তে বলেন, "শিউড়ি, সে ত অনেকদূর।"

আরও প্রায় এক মিনিটকাল কোন কথা না বলে দাঁড়িয়ে রইলেন মহিলা। তারপর ছায়াঘন ও-পারের দিকে তাকিয়ে বলেন, "ওরা ওই, পলাশের কাছে একটা বেঞ্চিতে বসে আছে, না ?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা চলি।"

চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে সত্যনাথ। ফটকের দিকে নয়, ঝিলের ওপারের ঐ পলাশের দিকে বেশ শান্তভাবে আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যাচ্ছেন মহিলা। হ্যাঁ, চলেই যাচ্ছেন। একবার হোঁচট খেয়ে টলে উঠলেন মনে হল। কিন্তু তবুও থামলেন না।...এ কী ? মহিলা হঠাৎ ছুটতে শুরু করলেন কেন ?...সর্বনাশ, ও কী কাণ্ড করলেন মহিলা ?

মালীরা চেঁচিয়ে হাঁক দেয়, "মাস্টারদা !" ও-পার থেকে ভিড়ের লোকের আতঙ্কিত স্বর শোনা যায়, "মাস্টার ! মাস্টার !" সকলেই যে জানে, জংলা ঝিলের জলের সব নিষ্ঠুরতার সঙ্গে লড়াই করবার মত মজবুত এক ডাকাত থাকে এই রাজা-পার্কে, তার নাম মাস্টার।

এক দৌড়ে ঘরের ভিতর গিয়ে গামছাটা হাতে তুলে নিয়ে এসে ছায়াঘন ও-পারে ঝিলের কালো জলের কাঁপুনির দিকে ক্রুদ্ধ দস্যুর মত একবার তাকায় সত্যনাথ। তার পরেই ছুটে যায়।

পলাশের কাছে লোহার বেঞ্চির পাশে শুধু একা দাঁড়িয়ে আছে লম্বা ফরসা অমিয়, লাল নেকটাই আর তসরের ট্রাউজার অমিয়। কে জানে, কখন উধাও হয়ে গিয়েছে খিল খিল হাসির বেলা ঘোষ! আর, মস্ত একটা ভিড় জমাট হয়ে ঝিলের কিনারায় দাঁড়িয়ে রুদ্ধ নিঃশ্বাসের আবেগ সামলে তাকিয়ে আছে ঝিলের বুকের দিকে, যেখানে জলপদ্মের পাতা ভাসছে। জলের শত্রু মাস্টার, এক ডুব দিয়ে তিন মিনিট ধরে তলিয়ে আছে; খুঁজছে এক সুন্দরী মহিলাকে, যিনি সুইসাইড করার জন্য ছুটে এসে, এই ত কতক্ষণই বা হল, ওই ট্রাউজার পরা ভদ্রলোকের চোখের সামনে এক সেকেণ্ড মাত্র দাঁড়ালেন, তারপরই ঝিলের জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। পুলিশের কাছে খবর দিতে লোকও চলে গিয়েছে।

"বেঁচে আছে। বেঁচে আছে! সাবাস মাস্টার!" ভিড়ের উল্লাস আর হাততালি আকুল হয়ে বেজে ওঠে। সুন্দরী মহিলাকে দু হাতে বুকে জড়িয়ে উপরে ভেসে উঠেছে মাস্টার।

ভিড়ের কাছে এগিয়ে এসে কাঁপতে কাপতে, আর গলার স্বরের থরথরানি নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে প্রশ্ন করে অমিয়, "কী করে বুঝলেন যে, বেঁচে আছে?"

ভিড়ের লোক বলে, "ঐ ত, দেখছেন না, মহিলা দু হাত দিয়ে কী-রকম শক্ত করে মাস্টারের গলা জড়িয়ে ধরে রয়েছে?"

হ্যাঁ, ঠিকই, অমিয়র দু চোখের উপর একটা ভয়ানক ঠাট্টা যেন জ্বালাভরা ঘৃণার থুথু ছুঁড়ে দিয়েছে। বেশ ত দিব্যি, কী ব্যাকুল আগ্রহে একটা লোকের গলা জড়িয়ে ধরে, মরণ থেকে বেঁচে উঠতে চাইছে নমিতা। লোকটার কপালের উপর কপাল নামিয়ে দিয়ে যেন ঘুমিয়ে রয়েছে নমিতা।

অ্যাম্বুলেন্স এল। হাসপাতালে চলে গেল মহিলার সংজ্ঞাহীন শরীর। ভিড়ের লোক বলে, "বেঁচে যাবে, নিশ্চয় বেঁচে যাবে। সাবাস মাস্টার।"

পুলিশ এল। অমিয় বলে, "হ্যাঁ, আমারই স্ত্রী।"

অমিয়র দিকে তাকিয়ে ভিড়ের লোক চেঁচায়, "আগে মাস্টারকে ভাল বকশিশ করুন মশাই।"

"বকশিশ?" আশ্চর্য হয়ে তাকায় সত্যনাথ। তারপর আর কোন কথা না বলে, কোন দিকে না তাকিয়ে, সোজা হেঁটে এসে জংলা ঝিলের এপারে মাধবীলতার ঘেরানের কাছে ক্লান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

অনেক তদন্তের পর পুলিশ রিপোর্ট দিল, সুইসাইডের চেষ্টা নয়। হিস্টিরিয়া। মহিলা কিছুদিন থেকে শুধু শুয়ে থাকতেন, কোন কথা বলতেন না, আর খাতা ভরে কবিতা লিখতেন। রাজা-পার্কের জংলা ঝিলের নামে যত সব কবিতা।

সেদিনই খুশী হয়ে থানা থেকে বাড়ি ফিরে, সন্ধ্যাতারা ফুটে উঠবার পর, বেলা ঘোষের বাড়িতে যাবার আগে নমিতার কাছে এগিয়ে ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে প্রশ্ন করে অমিয়, "তুমি আমার ওপর রাগ করে এরকম কুৎসিত একটা কাণ্ড করলে কেন?"

নমিতার ভ্রূকুটিও বেশ কঠোর হয়ে ফুটে ওঠে। "কী বললে? তোমার ওপর রাগ করে?"

"হ্যাঁ।"

হেসে ফেলে নমিতা। তার পরেই মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, "না, তোমার ওপর নয়, রাগ করেও নয়।"

চমকে ওঠে অমিয়। যেন হঠাৎ একটা হোঁচট লেগেছে, পা দুটো অনড় হয়ে গিয়েছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অমিয়।

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যাতারার দিকে তাকিয়ে নমিতা বলে, "আর, কাণ্ডটাও মোটেই কুৎসিত নয়।"

অঙ্গদা

ড্রামের শব্দ আবার মৃদু হয়ে ডুরু ডুরু করে। আর, ক্লেরিওনেটও যেন গম্ভীর হয়ে আস্তে আস্তে বাজে। কেমন যেন কাটা-কাটা সুর, চাপা-চাপা স্বর। গ্যালারির ভিড়ও বড শান্ত। হঠাৎ মরে গিয়েছে সব মুখরতা। অনেকের নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়েছে। অনেকের বিস্ময় এরই মধ্যে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে। দর্শকদের অপলক চোখগুলি তখন নিরুদ্দাম হয়ে সেই বিরাট তাঁবুর ভিতরেই উপরের শূন্যলোকের দিকে তাকিয়ে সুন্দর এক উদ্দামতার খেলা দেখছে। ট্রাপিজের খেলা খেলছে মিস সুধালক্ষ্মী। একটার পর একটা নূতন খেলা।

ঘাড় অনেকখানি কাত করে আর মুখ বেশ খানিকটা তুলে নিয়ে দেখতে হয়। অনেক উপরে, তাঁবুর সব চেয়ে উঁচু দুই খুঁটির মাথায় নীল আর লাল আলো জ্বলে। দুই আলোর মাঝখানের ব্যবধান জুড়ে জরির ঝালর লাগান লম্বা একটি চাঁদোয়া। ঠিক তারই নীচে দুলছে দুটি ট্রাপিজ—একটি এদিকে এবং আর-একটি ওদিকে। ট্রাপিজের রডে দুই পায়ের পাতা হুকের মত এঁটে দিয়ে, আর ছিপছিপে শরীরটাকে সাপের মত নীচের দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে, দুলছে ডেকান গ্র্যাণ্ড সার্কাসের মিস সুধালক্ষ্মী। সাদা সিল্কের টাইট দিয়ে সারা দেহটাই মোড়া। অতি নিখুঁত আর বড় স্পষ্ট একটি মেয়েলী গড়ন নিয়ে দুলছে সাদা সিল্কের একটা স্তবক। সেই স্তবকের কোমর ঘিরে সবুজ মখমলের খাটো জাঙিয়া। বুকটা এক টুকরো চওড়া মসলিন দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। সেই বাঁধনের ফাঁস যেন একটা রঙিন চিঁড়িতন, পিঠের কাছে কেঁপে কেঁপে দুলছে। মোটা চাবুকের মত শক্ত করে বাঁধা বিনুনিটাও অনেক নীচের রিংএর মাটিকে যেন ছলনা করে বাতাস কেটে শোঁ শোঁ করে দুলছে। বুকের মসলিনের উপর গাঁথা পর পর তিনটে মেডাল। মেডালের সারিও উল্টে গিয়ে, মাথা নীচু করে দুলছে। এলোমেলো নয়, বেশ সুন্দর ছন্দে বাঁধা সেই উদ্দামতা, সেই

ভয়াল কুহকের খেলা। দর্শকের চোখের শঙ্কাকে আনন্দে শিউরে দিয়ে, আবার কখনও বা চোখের আনন্দকে শঙ্কিত করে দিয়ে, দুলে দুলে ট্রাপিজের খেলা দেখাচ্ছে মিস সুধালক্ষ্মী। উপরের ঐ সুন্দর দোলানির দেহটা যদি হঠাৎ ভুলে ফসকে গিয়ে অনেক নীচে রিংএর এই ভয়ানক শক্ত মাটির উপর পড়ে যায়? সুধালক্ষ্মী দোলে, সেই সঙ্গে গ্যালারির ভিড়ের আতঙ্কও দোলে।

কিন্তু কোন আতঙ্কে দোলে না, আর, একেবারে ধীর ও স্থির হয়ে চুপ করে রিংএর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে একজন। সে-ও সুধালক্ষ্মীর ঐ সুন্দর দোলানির দিকে তাকিয়ে আছে। ওর খেলা এখন থেমে রয়েছে। সুধালক্ষ্মী যখন খেলা থামিয়ে ট্রাপিজের রডের উপর বসে জিরোয় তখন ওর খেলা শুরু হয়। ওর খেলা হল রিংএর এই মাটির উপর ঘুরে-ফিরে আর নেচে-কুঁদে যত উদ্ভট রগড়ের হুল্লোড় তুলিয়ে দেওয়া। বিদঘুটে স্বর, কুতকুতে হাসি, ড্যাবডেবে চাউনি আর যত কটর-মটর বোল-বুলি আওয়াজ। রং ঢং আর মস্করা।

"লাপ্‌টি লিটিল্‌! লাপ্‌টি লিটিল্‌!" দর্শকদের দিকে তাকিয়ে রগুড়ে বুলি ছাড়ে আর তিন পেয়ে কুকুরের মত থমকে থমকে হাঁটে; রিংএর মধ্যে ছোট একটা চক্কর দেবার পর, সোজা টান হয়ে দাঁড়িয়ে গ্যালারিকে লক্ষ্য করে বীরদর্পে একটা মিলিটারী স্যাল্যুট ছাড়ে; তার পরেই ভাঙা কাঁসার বাসনের মত খ্যানখেনে স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে এই সার্কাসের জোকার দাসগুপ্ত, "বাবা আমার নাম দিয়েছেন কর্নেল পোটাটো। ওরে আমার বাবা রে!"

গ্যালারিতে হুল্লোড় ফেটে পড়ে। "কর্নেল পোটাটো ইধার আও। এদিকে এস কর্নেল পোটাটো।" কখনও এদিক থেকে, কখনও বা ওদিক থেকে তারস্বরের আহ্বান শোনা যায়।

চট করে মাটির উপর হাত দুটোকে থাবার মত পেতে আর শরীর-টাকে উপরের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে একটা ভল্ট খায় কর্নেল পোটাটো। হাতে ভর দিয়ে উলটো শরীরটাকে খাড়া রেখে তড়বড় করে দৌড়তে থাকে, আর আনন্দে আত্মহারা হয়ে পা-তালি বাজায়।

রিংএর অনেক উপরে উর্ধ্বলোকের দুই রঙিন আলোর মাঝখানে ট্রাপিজের সুধালক্ষ্মী, আর নীচে মাটির উপর রিংএর মাঝখানে জোকার

দাসগুপ্ত। এই খেলাটি মোটামুটি মজা জমায় ভাল, এবং সেই জন্যই বোধ হয় আজও ভিড় টানছে ভাল, টিকিট বিক্রি মন্দ হয় না। নইলে কবেই তাঁবু গুটিয়ে এই শহর থেকে চলে যেত ডেকান গ্র্যাণ্ড।

দোলানি থামিয়ে ট্রাপিজের রডের উপর শান্তভাবে দাঁড়িয়েছে সুধালক্ষ্মী। আস্তে আস্তে হাঁপাচ্ছে। আস্তে আস্তে ঢিপ ঢিপ করছে নরম মসলিনের উপর চকচকে মেডালের সারি। রুমাল হাতে নিয়ে কপালের ঘাম স্পঞ্জ করছে সুধালক্ষ্মী।

গ্যালারির দর্শকের মত জোকার দাসগুপ্তও যেন মুগ্ধ হয়ে উপরের ঐ সুন্দর কুহকের দিকে তাকিয়ে আছে। জোকারও বোধহয় ভুলেই গিয়েছে যে, এই মুহূর্তে ওকে ওর খেলার পালা মাতিয়ে তুলতে হবে। শুধু আজ নয়, অনেকদিন থেকে এই একটা ভুল করে আসছে জোকার দাসগুপ্ত। মনে থাকে না, নিয়মটা প্রায়ই ভুলে যায়, একটু দেরি করে ফেলে দাসগুপ্ত। কিন্তু মনে করিয়ে দেবার লোক আছে। রিংএর বেড়ার গা ঘেঁষে কাপড়-ঢাকা যে প্রকাণ্ড খাঁচা-গাড়িটা এখন নিঃশব্দে স্থির হয়ে রয়েছে, তারই একপাশে টুলের উপর বসে চুরোট টানেন বাঘের ট্রেনার কালাসাহেব জন রাজারাম। বাঘের মতই গম্ভীর গোঁপাল একটা মুখ।

নিজের খেলা ভুলে গিয়ে হাঁ করে সুধালক্ষ্মীর দিকে তাকিয়ে কী দেখছে জোকার? ভ্রুকুটি করেন কালাসাহেব জন রাজারাম। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাতের ছিপছিপে বিজলি চাবুকটাও সেই আড়াল থেকে শপাং করে শব্দ করে ওঠে। সেই মুহূর্তে এক লাফ দিয়ে সরে যায় আর তিনটে সামারসল্ট খায় দাসগুপ্ত। রিংএর কিনারায় এসে কুতকুতে হাসি হেসে আর মাথার টুপি বুকে ছুঁইয়ে অতি বিনীত একটা ঢং ছাড়ে। "বাবানে মেরা নাম রখ্‌খা থা কার্নেল পোটাটো। আরে বাহ্‌রে মেরা বাপ!"

কর্নেল পোটাটো! কর্নেল পোটাটো! গ্যালারির এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত হাঁকডাকের হুল্লোড় গড়াতে থাকে। ঢিলে-ঢালা আর ন্যাতপেতে একটা নিকার-বোকার, মাথায় লম্বা একটা ধুচুনি টুপি, খড়িমাখা মুখ, চোখের চারদিকে গোল করে আঁকা বড় বড় দুটো লাল রংএর চক্কর, কালো রং দিয়ে আঁকা এক জোড়া ভোঁতা গোঁফ; জোকারের সেই মূর্তি দেখলেই কোমরে যেন কাতুকুতু লাগে।

দাসগুপ্ত বড় স্মার্ট জোকার। গ্যালারির সামনের সারির কতগুলি বড় বড়

পাঞ্জাবী পাগড়ির দিকে তাকিয়ে ভালুকের মত একটা লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে হাঁক ছাড়ে জোকার দাসগুপ্ত, "পিতা-জী মৈনু নাম দিত্তী কার্নাইল পোটাটো।" তার পরেই আর এক লাফ, খেপা গরুর মত। কপালে তিলক আঁকা কালো টুপি মাথায়, আর সাদা চাদর গলায় পণ্ডিতের মত মূর্তি নিয়ে বসে আছে যারা, তাদের সামনে এসে দাঁত বের করে জোকার দাসগুপ্ত হাসতে থাকে, "বাপনে ম-লা নাম দিলী কারনেল পোটাটো।" তার পরেই আবার। থামে না, এক মুহূর্তও চিন্তা করে না। হাসিয়ে সারা গ্যালারির পেটে খিল ধরিয়ে দিয়ে জোকার দাসগুপ্ত তার সেই বিদঘুটে রঙিলা মূর্তি নিয়ে এক একটা ঢং ছুঁড়ে ছুঁড়ে ঘুরতে থাকে, আর তার সেই প্রচণ্ড পরিচয় রটিয়ে দিতে থাকে।

"বাপ-নে ম-নে নাম আপী কারনেল পোটাটো!" শুনেই চোখ বড় করে তাকায়, তারপরেই হেসে ওঠে গ্যালারির স্পেশাল সীটের কয়েকটা চিন্তামাখা মুখ, যাদের গায়ে লম্বা লম্বা ভাটিয়া কোট।

"তগপ্পন্ এনক্কু নাম কারনেল পোটাটো কোড়ুত্তান।" শুনেই শিউরে ওঠে, তারপর খিল খিল করে হেসে ওঠে হীরার নাকছাবি পরা একদল মেয়ের মুখ।

"স্তড়া মশ্, স্তড়া মশ্। অপ্লার মে নামশ্ বুখ্ কারনেল পোটাটো!" শুনেই আঁতকে ওঠে, তার পরেই মিচকে মিচকে হাসতে থাকে, নীল চোখে সুর্মা আঁকা, গোটা পাঁচেক লালচে মুখ, আলখাল্লার উপর চামড়ার পোস্তিন গায়ে চড়িয়ে বসে আছে যারা।

"বাবা হমর নাম কারনেল পোটাটো দেলথিনহি হো।" হাতের তেলো টিপে টিপে মিথ্যে খৈনি খায় জোকার দাসগুপ্ত। সঙ্গে সঙ্গে হি হি করে হেসে ওঠে আর টিকি চুলকোয় পিছনের বেঞ্চির একদল দর্শক। গায়ে ফতুয়া আর কাঁধে গামছা, লোকগুলি আহ্লাদে এর-ওর গায়ে ঢলে পড়ে।

আবার নীরব হয় গ্যালারি। কাটা-কাটা গম্ভীর সুরে ক্লেরিওনেট বাজে। গ্যালারির সব চোখ আবার উপর দিকে তাকিয়ে রঙিন হয়ে গিয়েছে। আবার খেলা শুরু করেছে সুধালক্ষ্মী। রিংএর শক্ত মাটির উপর আবার স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে জোকার দাসগুপ্ত। এদিকের এই ট্রাপিজে দুলছে সুধালক্ষ্মী। সামনের ঐ ট্রাপিজটা শূন্য আসনের মত যেন একটু একলা হয়ে দূরে সরে আছে। হঠাৎ খুব জোর একটা দোল খেয়ে সুধালক্ষ্মী তার ছিপছিপে

শরীরটাকে একেবারে আলগা করে যেন ঝড়ের পাখির মত বাতাসের বুকে ছেড়ে দেয়। ঝুপ করে নীচে লুটিয়ে পড়তে গিয়েই টুপ করে শূন্য ট্রাপিজের রড ধরে ফেলে সুধালক্ষ্মী। গ্যালারিতে হাততালির শব্দ চটপট করে বাজতে থাকে।

ভাল খেলা। বেশ খেলা। তবু দর্শকদের মনে একটা অভিযোগ আছে। এবং সার্কাসের ম্যানেজার, ছেঁড়া নেক-টাই পরা সেই গোবেচারা স্বভাবের চিপলুংকার সেই অভিযোগের জবাব দিতে দিতে রোজই হয়রান হন। ট্রাপিজের খেলায় একা সুধালক্ষ্মী কেন? জুড়ি নেই কেন? এক জোড়া দোলনা ঝুলবে, অথচ ত্বলবে শুধু একজন? এই খেলা একটু ফাঁকির খেলা। গত বছরেও এই শহরে এসে খেলা দেখিয়ে গিয়েছে এই ডেকান গ্র্যাণ্ড। শহরের লোকের আজও মনে আছে, কী সুন্দর ট্রাপিজের খেলা দেখিয়েছিল সেই মিস মঞ্জরী আর চট্টোপাধ্যায়। আজ যদি থাকত চট্টোপাধ্যায়, তবে সুধালক্ষ্মী আজ আর একলা পাখির মত ঝুপ করে ঐ ট্রাপিজের শূন্য দাঁড়ে গিয়ে বসত না। টুপ করে একেবারে চট্টোপাধ্যায়ের কোলের উপর গিয়ে পড়তে হত। তারপর, শেষের দিকের সেই খেলাটা, সেই লাষ্ট গ্রিপ। কী চমৎকার! কোথায় গেল সেই ফুটফুটে চেহারার চট্টোপাধ্যায় আর কাজল-পরা সেই মিস মঞ্জরী? নিশ্চয় ডেকান গ্র্যাণ্ড ওদের ভাল মাইনে দিতে পারেনি বলে ওরা কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছে। বোধহয় ওরা এখন গ্রেট হিপোড্রোমে আছে।

এতদিন ধরে অভিযোগটা তবু একটু শান্ত ছিল, কিন্তু আর শান্ত থাকার কথা নয়। আজই সারা সকাল আর বিকাল জোরে ব্যাণ্ড বাজিয়ে হ্যাণ্ডবিল বিলি করেছে ডেকান গ্র্যাণ্ড, আজকের খেলার প্রোগ্রামে সেই বিচিত্র লাষ্ট গ্রিপ থাকবে। আজ আর সুধালক্ষ্মী একা ট্রাপিজে ত্বলবে না, তার জুড়িও থাকবে। কিন্তু কই? সুধালক্ষ্মীর জুড়ি কই? সত্যিই কি একটা ভাঁওতা দিল ডেকান গ্র্যাণ্ড? কোন সাহসে এমন ভাঁওতা দেয়?

ভাঁওতা নয়। ম্যানেজার চিপলুংকার তখন ছেঁড়া নেক-টাইএ হাত বুলিয়ে হাসছিলেন। টেলিগ্রাম করা হয়েছিল, নতুন খেলোয়াড় এসে গিয়েছে। পৌঁছতে একটু দেরি হয়েছে, এই যা। কিন্তু কী ভাগ্য, ঠিক সময়মত পৌঁছে গিয়েছে। চিতে বাঘের মত আঁটসাট চেহারা, ফিকে হলদে রংএর টাইটের উপর কালো জাঙিয়া, হঠাৎ এক নতুন খেলোয়াড় এসে রিংএর মধ্যে ঢুকেই

দর্শকদের দিকে একটা স্যালুট ছাড়ে, তার পরেই কাঠবিড়ালীর মত তরতর করে দড়ি বেয়ে মুহূর্তের মধ্যে উপরে উঠে গিয়ে শূন্য ট্রাপিজের রডের উপর দাঁড়ায়।

“চিনাপ্পা! চিনাপ্পা! গ্রেট হিপোড্রামের সেই চিনাপ্পা!” চিনতে পেরে গ্যালারির ভিড় আনন্দে হাততালি দেয়।

কিন্তু কী আশ্চর্য, এতক্ষণ ধরে যার চোখে কোন আতঙ্ক ছিল না, শুধু তারই চোখ দুটো হঠাৎ একটা ভয়ের নিষ্ঠুর খোঁচা লেগে শিউরে ওঠে। লাল রংএ আঁকা দুটো গোল গোল চক্করের মধ্যে জোকারের সেই দুটি চোখের ড্যাবডেবে চাউনি যেন শ্রান্ত হয়ে মুদে আসতে থাকে।

ঐ ট্রাপিজে দাঁড়িয়ে আছে সুধালক্ষ্মীর খেলার জুড়ি। কোঁকড়া চুল, কালো রং, টিক-টিক করছে নাকটা, বেশ চেহারা! সুধালক্ষ্মীর দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসছে চিনাপ্পা। এরই মধ্যে চিনাপ্পার চোখের তারায় একটু রং ধরে গিয়েছে বলে মনে হয়। যেন মুগ্ধ হয়ে রয়েছে একটা হঠাৎ পাওয়া আশার উল্লাস। মুগ্ধ হবারই কথা।

আর, ঐ ত; সুধালক্ষ্মীও সামনের ঐ ট্রাপিজের রডে দাঁড়িয়ে আছে। আয়নার মত চকচক করে দুটি টানা টানা চোখ, ঠোঁট দুটি যেন একটু ফুঁপিয়ে রয়েছে। টলটল করে সুডোল থুতনির ছাঁদ; তা ছাড়া কপালের উপর মালাবার চন্দনের ঐ টিপ। সুধালক্ষ্মীর ঐ মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ না না হওয়াই ত আশ্চর্য। তবু ত এখনও জানে না, বোধহয় কল্পনাও করতে পারে না চিনাপ্পা, শক্ত চাবুকের মত বাঁধা সুধালক্ষ্মীর ঐ মোটা বেণীতে মহীশূর অগুরুর কী সুন্দর গন্ধ ফুরফুর করে।

চিনাপ্পা হাসছে, হাসুক। কিন্তু সুধালক্ষ্মী অমন করে হাসে কেন? আজ এক বছর ধরে সুধালক্ষ্মীর ঐ সুন্দর মুখের কত রকমের হাসি দেখেছে দাসগুপ্ত, কিন্তু আজ এ কী-রকম উদ্দাম উল্লাসের হাসি? শিউরে উঠছে সুধালক্ষ্মীর ফোঁপান ঠোঁট, আয়নার মত চকচকে চোখে বিদ্যুতের চমক খেলছে। এ কী হল সুধালক্ষ্মীর? এক মুহূর্তে এক বছরের ইতিহাস ভুলে গেল?

মাত্র এক মাসের জন্য হিসাব লিখবার একটা চাকরি নিয়ে এই ডেকান গ্রাণ্ডের তাঁবুতে যেদিন এসেছিল দাসগুপ্ত, সেদিনের কথাগুলিও কি সুধালক্ষ্মী ভুলে যেতে পারে? হিসাব লেখার কাজ ছেড়ে দিয়ে খেলার কাজ ধরবার জন্য দাসগুপ্তের কানে কানে কে সেদিন অদ্ভুত উৎসাহের মন্ত্র ফুঁকে দিয়েছিল?

"আপনাকে হিসাব লেখার কাজ একটুও মানায় না।" বলতে বলতে একেবারে দাসগুপ্তের টেবিলের কাছে এসে সেদিন দাঁড়িয়েছিল সুধালক্ষ্মী। চমকে মুখ তুলে তাকিয়ে দাসগুপ্তও আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। কে এই মেয়ে, যার ফোঁপান দুটি ঠোঁট অদ্ভুত হাসি হাসছে ?

প্রশ্ন না করতেই নিজের পরিচয় নিজেই বলতে থাকে সুধালক্ষ্মী, "আমি সুধালক্ষ্মী, ট্রাপিজের খেলা দেখাই। মাইনে এক শো দশ টাকা।"

দাসগুপ্ত হাসে, "আমার মাইনে ত্রিশ টাকা "

"ত্রিশ টাকা মাইনের কাজ করতে আপনার লজ্জা পাওয়া উচিত।"

দাসগুপ্ত ভ্রূকুটি করে, "তার মানে ?"

"আপনার এত সুন্দর মজবুত চেহারা; ইচ্ছে করলে, আর একটু চেষ্টা করে খেলা শিখে নিলে, আপনিও এক শো দশ টাকা পেতে পারেন।" চলে গেল সুধালক্ষ্মী, কিন্তু দাসগুপ্তের কানের কাছে যেন একটা গানের রেশ রেখে দিয়ে চলে গেল। আবার হিসেব লিখতে গিয়ে আনমনা হয়ে যায় দাসগুপ্ত। আশ্চর্য, এমন ভাল একটা শান্ত-শিষ্ট কাজের আনন্দকেই যে বিস্বাদ করে দিয়ে চলে গেল ঐ ফোঁপান ঠোঁটের হাসি।

প্যারালাল-বার ভালই রপ্ত করা আছে, হরাইজণ্টালও কিছু কিছু। পরীক্ষায় ফেল করলেও কলেজের জিমনাসিয়ামের সেই উচ্ছল খেলাভরা দিনগুলির আনন্দ এখনও দাসগুপ্তের এই তরুণ শরীরের পেশীতে সঞ্চিত হয়ে আছে। একটু চেষ্টা করলে আরও ভাল খেলা শিখে ফেলতে পারে বৈকি দাসগুপ্ত! কিন্তু সে সুযোগ কই ? আর এক মাস পরেই হিসাব লেখার এই চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। সার্কাসের পুরনো কেরানী ছুটির পর ঠিক সময়েই ফিরে আসবে। তারপর ? তারপর এই তাঁবুতে আর একটি দিনও থাকবার ভরসা কই ? একটু ভরসা পাওয়ার জন্য ছটফট করে মনটা। এই তাঁবু আর এই ত্রিশ টাকার চাকরিটাই যদি কোন যাদুবলে অন্তত এক বছরের মত বেঁচে থাকতে পারে, তবে···দাসগুপ্তের জীবনের এই গোপন ধ্যানের মত চিন্তাগুলি যেন হঠাৎ মহীশূর অগুরুর গন্ধে ভরে ওঠে। কী চমৎকার বেণী বাঁধে সুধালক্ষ্মী!

এক মাস পরে যেদিন শেষদিনের মত চাকরি করে চলে যাবার কথা, সেদিনই সকালবেলা ম্যানেজার চিপলুংকার তাঁর ছেঁড়া নেক-টাইএ হাত বুলতে বুলতে দাসগুপ্তের টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালেন, সঙ্গে সুধালক্ষ্মী।

ম্যানেজার বলেন, "সুধালক্ষ্মী বলছে, আপনি নাকি খেলা শিখতে চান।"

চমকে উঠে বিড়বিড় করে দাসগুপ্ত, "কই, না ত! আমি ত কাউকে ওকথা বলিনি!…হ্যাঁ ইচ্ছা ছিল বৈকি, কিন্তু…।"

ম্যানেজারও মাথা চুলকে আমতা-আমতা করেন, "হ্যাঁ, ঐ কিন্তুই হল আসল কথা। আপনাকে মাইনে দিয়ে রাখবার উপায় কই? এদিকে সুধালক্ষ্মী এমন জোর করছে যে…।" বোধ হয় মুখের হাসি লুকিয়ে ফেলবার জন্য অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয় সুধালক্ষ্মী।

ম্যানেজার বলেন, "একটা উপায় হতে পারে। জোকার ভোলাবাবু আর এক মাস পরে ছুটিতে বাড়ি যাবেন। আপনি যদি এই এক মাসের মধ্যে ভোলাবাবুর সাকরেদি করে জোকারের কাজটা মোটামুটি শিখে নিতে পারেন, তবে…।" ম্যানেজার দেখতে পায়, সুধালক্ষ্মী মাথা দুলিয়ে ইশারায় বলছে, "রাজি হয়ে যান।" বিব্রতভাবে নেক-টাই নাড়েন গোবেচারা ম্যানেজার চিপলুংকার, "তবে আপনি সেকেণ্ড জোকার হয়ে এখানে অন্তত একটা বছর থাকতে পারবেন, মাইনে পাবেন পঞ্চাশ টাকা।"

সুধালক্ষ্মী এইবার সামনে এগিয়ে এসে, একেবারে হিতাকাঙ্ক্ষিণী অভিভাবিকার মত উপদেশের সুরে বলতে থাকে, "আর, অবসর সময়ে প্র্যাকটিস করে ভাল ভাল খেলাগুলি, এমন কি ট্রাপিজের খেলাটাও শিখে ফেলতে পারবেন।"

ম্যানেজার বিস্মিত হয়ে একবার সুধালক্ষ্মীর মুখের দিকে তাকান। তারপরেই দাসগুপ্তের দিকে তাকিয়ে বলেন, "ওঃ, তাহলে ত কথাই নেই দাসগুপ্ত। ইউ উইল বি ভেরি ভেরি হ্যাপি!"

ভ্রূভঙ্গী করে সুধালক্ষ্মী। ফোঁপান ঠোঁটের মিষ্টি হাসিটা যেন রাগ করে আরও মিষ্টি হয়ে ওঠে। "কী বললেন ম্যানেজার? তার মানে?"

গোবেচারা চিপলুংকার এইবার বেশ চালাক হাসি হেসে জবাব দেন, "তার মানে, দাসগুপ্ত অন্তত এক শো দশ টাকা মাইনে পাবে।"

ম্যানেজার চলে যেতেই সুধালক্ষ্মী বলে, "আপনি আমার ওপর রাগ করলেন না ত?"

দাসগুপ্ত হাসে, "একটুও না। কিন্তু আপনি কেন আমার জন্য ম্যানেজারের কাছে গিয়ে এত কাণ্ড করলেন?"

"জানি না।" গম্ভীর হয়, আস্তে আস্তে চলে যায় সুধালক্ষ্মী।

এই ত সেই স্থধালক্ষ্মী। জোকার দাসগুপ্তের দুই চক্ষু যেন একটা জ্বালার ছোঁয়ায় ছটফট করে। কোথায় গেল স্থধালক্ষ্মীর সেই গম্ভীর মুখ? আজও বুঝতে পারেনি কী স্থধালক্ষ্মী, তাকে এই এক বছর ধরে ভালবেসে ধন্য হয়ে আছে যার জীবন, সে আজ নীচের এই রিংএর শক্ত মাটির উপর দাঁড়িয়ে তারই দিকে তাকিয়ে আছে?

শুরু হয়েছে খেলা। কী উদ্দাম খেলা! এই ট্রাপিজ থেকে ঐ ট্রাপিজ, ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে স্থধালক্ষ্মী আর চিনাপ্পা। যেন এক ভয়ানক ধরা-ছোঁয়ার আবেগ শূন্যলোকে লুকোচুরি খেলছে। কেউ কাউকে কাছে পায় না। দুটি সুন্দর উল্কা যেন পরস্পরের পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে আর আসছে।

তাই ত? স্থধালক্ষ্মীকে এখনও বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে। ধরা দিচ্ছে না স্থধালক্ষ্মী। জোকারের ড্যাবডেবে চোখ একটু শান্ত হতে আর খুশী হতে চেষ্টা করে।

এতদিনে ঐ ট্রাপিজে স্থধালক্ষ্মীর জুড়ির আসনে দাসগুপ্তকেই আজ দেখতে পেত এই গ্যালারির ভিড়, যদি বুকের একটা অদ্ভুত ব্যথা এই তিন মাস ধরে দাসগুপ্তের চেষ্টার নেশাটাকেই দমিয়ে না দিত। ডাক্তার বলেছেন, এখন কয়েকটা মাস আর কোন শক্ত খেলা নয়, কোন শক্ত খেলার প্র্যাকটিসও নয়; হয় রেস্ট, নয় হাল্কা খেলা খেলে দিন কাটাতে হবে। দাসগুপ্তের জীবনের স্বপ্নটাই যেন উপরের রঙিন জগতের দিকে অনেক দূর পর্যন্ত উঠে, তারপর গড়িয়ে নীচে পড়ে গিয়েছে। বড় তাড়াতাড়ি করেছিল দাসগুপ্ত, তাই বোধহয় একটা নিষ্ঠুর হোঁচট খেতে হয়েছে। অল্প মাইনে, ডবল খাটুনি, আর দুর্বল খোরাক শরীরের উপর বেশ প্রতিশোধটাও নিয়ে ফেলেছে।

কিন্তু একটা হোঁচট বৈ ত নয়? ডাক্তারের কথা শুনেও দাসগুপ্তের জীবনের স্বপ্ন একটুও দমে যায়নি। মাত্র তিনটা মাস, তার পরেই আবার দাসগুপ্তের এই মজবুত দেহের সব রক্ত স্নায়ু আর পেশী মরিয়া হয়ে ঐ ট্রাপিজের কাছে যাবার জন্য প্র্যাকটিস করবে। কী-ই বা আর বাকি আছে? ভল্টিং আর টামলিং বেশ দুরস্ত করা হয়েছে। বাকী শুধু টাইট-রোপ আর ল্যাডার। তারপর ঐ ট্রাপিজ, রপ্ত করতে দুটি মাসের বেশী লাগবে না। তারপর একশো দশ টাকার মাইনে এবং তার চেয়ে বড় উপহার, ঐ রঙিন আলোর কাছে জরির চাঁদোয়ার নীচে শূন্যলোকের কুহক হয়েও স্থধালক্ষ্মীর সঙ্গে লাস্ট গ্রিপ।

সেদিন হঠাৎ উদ্দাম হবে ক্লেরিওনেটের স্বর। হঠাৎ মরিয়া হয়ে দুলে উঠবে

দুদিকের দুই ট্রাপিজ। রড ছেড়ে দিয়ে দু দিক থেকে দুই মূর্তি বাতাসে শরীর ছুঁড়ে দেবে। খেপা ঢেউএর পাকের মত মত্ত একটি সামারসল্ট। তার পরেই বুকের কাছে বুক, মুখের কাছে মুখ। মালাবার চন্দনের টিপ দাসগুপ্তের একেবারে চোখের কাছে ভাসবে? দুই জোড়া বাহুর বাঁধনে জড়ান একটি মিলনের মূর্তি যেন:স্বর্গ থেকে জয়ী হয়ে নীচের টান-করা তিরপালের ক্যাচের উপর ঝুপ করে নেমে পড়বে। সব পাওয়া, পরম পাওয়া পেয়ে যাবে দাস-গুপ্তের এক বছরের আশার জীবন। খেলার সঙ্গিনীকে চিরজীবনের সঙ্গিনী করে, এক উৎসবের রাতে হাত ধরে নিজের ঘরে নিয়ে যাবে দাসগুপ্ত।

এই এক বছরের মধ্যে দাসগুপ্তেব চোখের কাছে ক'বারই বা এসেছে সুধালক্ষ্মী? সেই দু বার, আর ডাক্তার যেদিন এল সেদিন একবার। কে জানে, কেমন করে আর কার কাছ থেকে খবর পেয়েছিল সুধালক্ষ্মী, বুকে একটা ব্যথা নিয়ে অফিস ঘরের পিছনে ছোট তাঁবুর ভিতরে একা শুয়ে আছে জোকার দাসগুপ্ত।

একেবারে ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে দাসগুপ্তের বিছানার কাছে এসে দাঁড়াল সুধালক্ষ্মী। সুধালক্ষ্মীর মূর্তিটাই কেমন যেন ভীত আর অনুতপ্ত উদভ্রান্তের মত। খোলা বেণী, একরাশ ঘন কালো চুল যেন ঢেউ তুলে ফেঁপে রয়েছে, দু হাতে জড়িয়ে ধরলেও উপচে পড়বে, বেড় পাওয়া যাবে না। বড় বেশী গম্ভীর হয়ে গিয়েছে সেই ফোঁপান ঠোঁট। শাড়িটা এলোমেলো করে যেন কোনমতে গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে। ঘাড়ে আর গলায় সাবানের ফেনা শুকিয়ে রয়েছে। তবে কি স্নান বন্ধ করে হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসেছে সুধালক্ষ্মী?

দাসগুপ্তের বুকের ব্যথা পরীক্ষা করে ডাক্তার চলে যাবার জন্য এগিয়ে যেতেই গলা কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে সুধালক্ষ্মী, "একটা আশা দিয়ে যান ডাক্তারবাবু।"

ডাক্তার ঘাবড়ে গিয়ে সুধালক্ষ্মীর মুখের দিকে তাকান। "হতাশার ত কোন কারণ নেই। এই ব্যথা সেরে যাবে!"

ডাক্তার চলে যাবার পর আরও কিছুক্ষণ চুপ করে দাসগুপ্তের বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল সুধালক্ষ্মী। দাসগুপ্তের মনের ভিতরে আকুল হয়ে ছটফট করেছিল একটা প্রশ্ন। সত্যিই ভালবাসে ত সুধালক্ষ্মী? না শুধু মিথ্যে একটা উপকার করবার জন্য ছুটে আসে? কিন্তু কী আশ্চর্য, এই মেয়ের

মনটা যেন সীলমোহর করা। সেই মনের ভাষা শোনা যায় না। ভুলেও মুখ খুলে সেই মনের সব কথার একটি কথাও বলে না।

দাসগুপ্ত বলে, "আমার অসুখের কথা শুনে তুমি এত ব্যস্ত হয়ে উঠলে কেন সুধা?"

"জানি না।" কথাটা বলেই বেশ একটু ব্যস্তভাবে হন হন করে হেঁটে চলে গেল সুধালক্ষ্মী।

হ্যাঁ, সীলমোহর করা মনই বটে। কে জানে, কী রহস্যের রত্ন লুকিয়ে আছে সেই মনের ভিতর!

থেমেছে খেলা। এই ট্রাপিজে চিনাপ্পা। আস্তে আস্তে হাঁপায়, দম ছাড়ে আর রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মোছে সুধালক্ষ্মী।

আবার ডিউটি ভুলে থমকে দাঁড়িয়ে আছে জোকার। শপাং করে শব্দ ছাড়ে কালাসাহেব জন রাজারামের বিজলী চাবুক।

"ওরে বাবা!" ভাঙা-গলায় কর্কশ ডাক ছেড়ে এক একটা লাফ দিয়ে রিংএর চারিদিকে ছুটতে থাকে জোকার। ভিরমি খেয়ে লুটিয়ে পড়ে। নকল ভয়, নকল আতঙ্ক, আর নকল ক্লান্তির ঢং দেখায়। মিথ্যা হাঁপানি হাঁপায়। হাত দিয়ে পা টিপে আর পা দিয়ে হাত টিপে নিজেই নিজের সেবা করে। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ায়। অ্যাঁও অ্যাঁও অ্যাঁও, মুখ বেঁকিয়ে ছিঁচকাঁদুনি কাঁদে। দু চোখ থেকে ঝরঝর করে জলের ফোয়ারা গড়িয়ে পড়তে থাকে। গ্যালারির ভিড় চেঁচিয়ে হেসে ওঠে। "নকল কান্না, নকলি আঁসু।" ঐ যে কর্নেল পোটাটোর ড্যাবডেবে চোখের কোণে খুব সরু একটা টিউবের মুখ দেখা যায়।

নীরব হয় গ্যালারি। আবার শুরু হয়েছে খেলা। সুধালক্ষ্মী আর চিনাপ্পার মুখের হাসিতে যেন আগুনের রংএর মত রক্তময় আভা। আর, নীচে রিংএর মাঝখানে শক্ত মাটির উপর দাঁড়িয়ে দাসগুপ্ত। জোকারের বুকের পাঁজরে যেন কাঁটা বিঁধছে, চিনচিন করছে ব্যথাটা। আর বুঝতে কিছু বাকী নেই, উপরের রঙিন আলোর কাছে মত্ত হয়ে দুলছে দুই অভি-সন্ধির কুহক। দাসগুপ্তের স্বপ্নের ঘরে ডাকাত পড়েছে, পড়ুক। কিন্তু সুধালক্ষ্মীই যে হেসে হেসে দরজা খুলে দিল, সহ্য করা যায় না শুধু এই জ্বালার দংশন।

হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে ক্লেরিওনেট। গ্যালারির ভিড় হাততালি দিয়ে বাতাস ফাটায়। দুই ট্রাপিজ দুদিকে ছিটকে সরে গিয়েছে, আর জরির চাঁদোয়ার নীচে সেই রঙিন শূন্যলোকের মধ্যে ফুটে উঠেছে এক কঠোর হিংস্র আর নিষ্ঠুর লাষ্ট গ্রিপ। সুধালক্ষ্মী আর চিনাপ্পা, দু জনেই দু হাতে দু জনের গলা জড়িয়ে ধরেছে। একটা ক্লান্ত উদ্দামতার ছবি ধরাতলে লুটিয়ে পড়ার আগে আকাশে ভেসে উঠছে।

"ওরে বাবা রে!" চিৎকার করে একটা লাফ দিয়ে সরে যায় দাসগুপ্ত। জোকার দাসগুপ্তের ন্যাতপেতে নিকার-বোকারে যেন আগুন ধরে গিয়েছে! হাতে ভর দিয়ে প্রচণ্ড একটা ভল্ট খেতে গিয়েই রিংএর শক্ত মাটীর উপর মুখ থুবড়ে আছাড় খেয়ে পড়ে যায় জোকার। গ্যালারিতে হো-হো হাসির হুল্লোড় ফেটে পড়ে।

পড়েই আছে জোকারের অসাড় শরীর। বেশ কিছুক্ষণ। এ আবার কর্নেল পোটাটোর কোন নতুন খেলা? "উঠো কর্নেল পোটাটো," ডাক দেয়, হাঁক ছাড়ে আর চিৎকার করে গ্যালারির ভিড়।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় দাসগুপ্ত। "লাপ্‌টি লিটিল্‌, লাপ্‌টি লিটিল্‌!" বিড় বিড় করে, কুতুকুতে হাসি হাসে, আর তিন-পেয়ে কুকুরের মত ভঙ্গী করে রিংএর চারিদিকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঘুরতে থাকে জোকার দাসগুপ্ত। জোকারের নাক দিয়ে ঝরঝর করে রক্ত গড়ায়। কপালের কাছেও একটা ক্ষত, ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে।

"নকল রক্ত, নকলি খুন।" গ্যালারির ভিড় চালাক হাসি হেসে চেঁচায়। কিন্তু কেয়াবাৎ হায়, বাহবা, কী অদ্ভুত কর্নেল পোটাটোর খেলা, কায়দাটা একেবারেই ধরতে পারা যাচ্ছে না। কেমন করে নাক দিয়ে এমন সুন্দর রক্ত ঝরাচ্ছে কর্নেল পোটাটো?

ঘড় ঘড় শব্দ করে বাঘের খাঁচাগাড়িটা রিংএর মাঝখানে চলে এসেছে। বিজলী চাবুক হাতে নিয়ে খাঁচার দরজা খুলে বাঘের মাথায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে পড়েছেন কালাসাহেব জন রাজারাম।

আরে, এ কী কাণ্ড! চমকে ওঠে গ্যালারির ভিড়। কর্নেল পোটাটোর সাহস ত কম নয়। হঠাৎ যেন মরিয়া হয়ে একটা দৌড় দিয়ে বাঘের খাঁচার ভিতরে গিয়ে ঢুকে পড়েছে জোকার।

"ওরে বাবা!" বাঘের শান্ত গম্ভীর ও উদাস মুখের কাছে মাথা

তুলিয়ে নকল ভয়ের ঢং দেখায় জোকার দাসগুপ্ত। হঠাৎ গর্জন করে লাফিয়ে ওঠে বাঘ। জন রাজারামের বিজলী চাবুকের সপাসপ বাড়ি খেয়েও বাঘের লুটোপুটি শান্ত হতে চায় না।

বিব্রত বিস্মিত ও আতঙ্কিত কালাসাহেব, জোকারের মুখের দিকে তাকিয়ে কী-যেন সন্দেহ করেন। তারপরেই চাবুক তুলে চেঁচিয়ে ওঠেন : "আসলি খুন, এ যে আসলি খুন!"

"সে কী? কী ব্যাপার?" দর্শকদের মনের প্রশ্নও আশ্চর্য হয়ে নীরবে ছটফট করে। গ্যালারির মুখরতা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। সেই ভয়ানক গম্ভীর নীরবতাকে আবার চমকে দিয়ে হুংকার ছাড়েন কালাসাহেব জন রাজারাম। "জানোয়ার বিগড় গিয়া। নাকে-মুখে খাঁটি রক্ত মেখে বাঘের মুখের কাছে আসে হতভাগা। ভাগো, জলদি ভাগো, বেকুব জোকার।"

কিন্তু একেবারে আতঙ্কহীন, কর্নেল পোটাটো তার সেই কুতুকুতে হাসি আর ড্যাবডেবে চাউনি নিয়ে আস্তে আস্তে সরে যায়। "লাপ্‌টি লিটিল্, লাপ্‌টি লিটিল্।" হেলে দুলে ভঙ্গী করে রিংএর চারিদিকে ঘুরতে থাকে। গ্যালারির ভিড় কিন্তু হাসে না। ক্লেরিওনেটও বাজে না। অশান্ত অতৃপ্ত তৃষ্ণাতুর বাঘটাই শুধু গর্জন করে।

রিংএর পাশের পর্দা ঠেলে বের হয়ে ছুটে আসছে কে? চমকে ওঠে গ্যালারির নীরব বিস্ময়।

আর কেউ নয়। মিস সুধালক্ষ্মীই ছুটে এসেছে। বেণী খুলে দিয়েছে, রঙিন একটা শাড়ি পরেছে সুধালক্ষ্মী; তবু ওকে চেনা যায়। বাঃ, বেশ সুন্দর, ট্রাপিজের সুধালক্ষ্মীকে এখন যে ঠিক ঘরের লক্ষ্মীটিরই মত দেখাচ্ছে।

ও কী? আরও আশ্চর্য হয় গ্যালারির হাজার চোখ। জোকারের মুখের দিকে তাকিয়ে যেন রাগে কটমট করছে সুধালক্ষ্মীর চোখ। রঙিন শাড়ির আঁচল মুঠো করে ধরে জোকারের কপালের ক্ষত চেপে ধরেছে সুধালক্ষ্মী। তার পরেই হাত ধরে এক টান দিয়ে রিংএর ভিতর থেকে জোকারকে যেন জোর করে টেনে নিয়ে যেতে থাকে সুধালক্ষ্মী।

ছেঁড়া নেক-টাইএ হাত বুলিয়ে ব্যস্তভাবে ছুটে আসেন গোবেচারা ম্যানেজার চিপলুংকার। "কী হয়েছে? কী ব্যাপার সুধালক্ষ্মী?"

সুধালক্ষ্মীর ফোঁপান ঠোঁট মিষ্টি হাসি হাসে। "খেলা হল খেলা। কিন্তু

তাই দেখে কী ভয়ানক রাগ করে পাগল হয়ে গিয়েছে আপনাদের জোকার।"

"সত্যি নাকি?" বড় বড় চোখ করে দাসগুপ্তের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হন চিপলুংকার।

এইবার সুধালক্ষ্মীর চোখ দুটোই যেন হেসে ওঠে এবং হাসতে গিয়ে ছলছল করে। "আমাকে আজও বোধ হয় চিনতে পারেনি দাসগুপ্ত, নইলে বুঝতে পারত যে আমিই ওর···।"

এক গাল হাসি হেসে চিপলুংকার বলেন, "ও ইয়েস। ও ইয়েস।"

ছায়া ও কায়া

যেন কবির কাব্য থেকে তুলে নিয়ে আসা একটী ছবি—কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে বাঁধি নীড়···।

যদিও ঠিক উচ্চ বৃক্ষচুড়ে নয়, গেরুয়া রঙের কাঁকরের বেশ উঁচু একটা ঢিপির উপর সিমেন্ট কংক্রিটের বেশ সুন্দর গোলগাল ও ছোট্ট একটী বাড়িতে ওরা থাকে সুখে। সুশান্ত আর বন্দিতা। স্বামী আর স্ত্রী। লাক্ষা-রিসার্চের জন্য নূতন একটা লেবরেটরি আর অফিস এখানে দামোদরের কিনারায় রামগড়ের বাঁয়ে শালবনের কাছাকাছি নতুন ডেভেলপমেণ্টের একেবারে মাঝখানে তৈরি হয়ে ওঠার পর ওরা দুজন এসেছে। ওরা দুজনেই এই লাক্ষা-রিসার্চে কাজ করে; লেবরেটরিতে সুশান্ত আর অফিসঘরে বন্দিতা। গেরুয়া রঙের ঢিপির উপর সেই গোলগাল ছোট্ট চেহারার কোয়ার্টার থেকে একই সময়ে একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে ওরা আসে; কাজের ছুটী হলে আবার একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলে যায়।

কীর্তনিয়ার গানের কলি যেন—ঝাঁপই দুঁহু দোঁহা আবেশে ভোর। লোকের চোখের সামনেও ওদের কোন কুণ্ঠা নেই। অফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিস্টার মাথুর, পাকা চুলে মাথা সাদা হয়ে গিয়েছে, এ-হেন এক প্রবীণ মানুষের সঙ্গে পথে মুখোমুখি হলেও বন্দিতা কখনও সুশান্তর গা ঘেঁষে এলিয়ে থাকা সেই ভঙ্গীটাকে একটুও আলগা করে সরিয়ে নেয় না; আর সুশান্তর একটা হাত বন্দিতার কোমরের আধখানা জড়িয়ে তেমনই শান্ত হয়ে পড়ে থাকে। মিস্টার মাথুরই একটু অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে যান।

শুধু মিস্টার মাথুর কেন, লেবরেটরির মুখার্জির স্ত্রীও যে সেদিন ওদের দুজনকে পথে দেখতে পেয়ে হাসিমুখে একটু আলাপ করতে গিয়েই চমকে উঠলেন, মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং ভয় পেয়ে হনহন করে হেঁটে চলে গেলেন, সে-ঘটনাটা যেন ওদের দুজনের চোখেই পড়ল না। দুজনে

দুজনের মুখের দিকে ছাড়া অন্য কারও মুখের দিকে তাকাবার সময়ই পায় না বোধহয়, কিংবা তাকাতেই চায় না।

মিস্টার মাথুরের মেয়ের বিয়ের দিনে, যখন নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক আর মহিলাদের ভিড়ে আসর গিজগিজ করছে, তখনও আসরের আশে-পাশে কোন আড়ালে বা কোণে নয়, আসরের মাঝখানে পাশাপাশি দুটি চেয়ারকে একেবারে সাঁটাসাঁটি করে ওরা দুজনে গায়ে-গায়ে প্রায় লুটোপুটি করে বসে রইল। কাছে এগিয়ে এসে কী-যেন হেসে হেসে বলতে চেষ্টা করেছিল মুখার্জি, "আপনারা দুজন কি ভুলেও কখনও...অর্থাৎ...আপনি একটু এদিকে আর আপনি একটু ওদিকে...?"

খিল খিল করে হেসে ওঠে বন্দিতা। সুশান্ত মাথা দুলিয়ে হাসে, "নেভার; কখনও না।"

মুখার্জি চোখ বড বড় করে তাকায়। "আশ্চর্য করলেন আপনারা, সত্যিই আশ্চর্য আপনাদের ইউনিটি।"

সুশান্ত বলে, "আশ্চর্য হবার কিছু নেই।"

মুখার্জি আরও আশ্চর্য হয়ে বলে, "বলেন কী।"

ইংরেজী কবিতার লাইন ভেঙে কয়েকটা খাসা খাসা কথা শুনিয়ে দেয় সুশান্ত, "ইন দি এরিথমেটিক অব লাইফ, এ পেয়ার ইজ দি ইউনিট!"

অপ্রস্তুত হয়ে হাসতে থাকে মুখার্জি, "তাই বটে, ঠিকই বলেছেন আপনি।"

লোকে আশ্চর্য হয় হক, সুশান্ত আর বন্দিতা সে-আশ্চর্যের ধারই ধারে না। যাকে ভাল লাগে, তার সঙ্গে প্রতিক্ষণ যে একেবারে মিশে গিয়ে এক হয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। জীবনের অঙ্কে দুটি আধখানা একসঙ্গে মিলে এক হয়ে ওঠে না। দুটি আস্ত রূপ ভালবাসার টানে যুগল হয়ে উঠে, এক হয়ে যায়। সুশান্ত আর বন্দিতাকে দেখলে তাই মনে হয়। ওরা দুজন যখন একসঙ্গে বেড়াতে যায়, তখন মনে হয়, একটি প্রাণ তর-তর করে হেঁটে চলে যাচ্ছে।

মুখার্জি এক-একদিন সুযোগ বুঝে সুশান্তর ওই এরিথমেটিকের অহংকারটাকে যেন হঠাৎ প্রশ্ন করে চেপে ধরে, "কী মশাই, আজ বেশ ত অনেকক্ষণ ধরে ইউনিটি সাসপেণ্ড করে রেখেছেন!"

রবিবার দিন দুপুর থেকে লেবরেটরিতে এসে কাজ করছে সুশান্ত।

আজ অফিস বন্ধ। বন্দিতা একা পড়ে আছে সেই নীড়ে—গেরুয়া রঙের কাঁকরের ঢিপির উপর সেই গোলগাল ছোট্ট কংক্রীটের নীড়ে।

সুশান্ত হাসে, "কী বলতে চাইছেন, ঠিক বুঝতে পারছি না মুখার্জি।"

"বেশ ত দুজনে ছাড়াছাড়ি হয়ে, এতক্ষণ ধরে···।"

মুখার্জির কথা না ফুরোতেই বেয়ারা এসে সুশান্তকে বলে, "মেম সাহেব বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন স্যার।" উঠে দাঁড়ায় সুশান্ত। মুখার্জির মুখের দিকে নীরবে যেন তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল একটি সগর্ব হাসির ঝিলিক হেনে দিয়ে চলে যায়। মুখার্জি আশ্চর্য হয়ে বলে, "তাই ত!"

পরের দিন দেখা হতেই মুখার্জি একটু ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করে, "মিসেস যে কাল এত হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন, আর আপনিও ব্যস্ত হয়ে চলে গেলেন···কোন কারণ ছিল নিশ্চয়?"

"ছিল নিশ্চয়।"

"কী হয়েছিল?"

সুশান্ত হাসে, "কিছুই না। উনি ঘরে বসে একা-একা রোমিও জুলিয়েট পড়ছিলেন; হঠাৎ বই বন্ধ করে চলে এলেন।"

মুখার্জির মুখটা লজ্জা পেয়ে আরও কাঁচুমাচু হয়ে যায়, "সত্যিই, আমি এতটা কল্পনা করতে পারিনি।"

হ্যাঁ, লেবরেটরিতে আর অফিসের ওই কাজের সময়টুকু ছাড়া আর কোন মুহূর্তেও ওরা ছাড়াছাড়ি হয়ে থাকতে চায় না। কাজের মধ্যেও অন্তত বার তিন-চার ওরা আনমনা হয়, উঠে যায় এবং বাইরে গিয়ে লনের উপর কিংবা শালকুঞ্জের আড়ালে একটু মুখোমুখি হয়ে আর দেখাদেখি করে আবার কাজের মধ্যে ফিরে আসে।

বাড়ির বাইরে যখন শালবনের হাওয়া গায়ে লাগিয়ে ওরা ছটফট করে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে থাকে, তখন মনে হয়, ওদের প্রাণ ছটফট করে কী-যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। একটা কালো পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে। লাল মেঘের একটা টুকরো ভাসতে ভাসতে একটা সাদা মেঘের টুকরোর উপর লুটিয়ে পড়ল, মিলে গেল, মিশে গেল, এক হয়ে গেল। কেঁপে ওঠে বন্দিতার মাথাটা; সুশান্ত একটু শক্ত করে চেপে ধরে বন্দিতার হাতটা। বন্দিতা বলে, "চল বাড়ী যাই।"

দুজনের বুকের ভিতর থেকে ব্যাকুল হয়ে ফুটে ওঠা দুটি উষ্ণ নিঃশ্বাসের

নিবিড় শিহর যেন ওদের জীবনটাকে সেই মুহূর্তে বাড়ির দিকে, সেই গোলগাল কংক্রিটের নীড়ের দিকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে চলে যায়।

আমলকীর গায়ে পাশের ওই বুনো লতাটা একবার লুটিয়ে পড়লেই হল; দামোদরের বালিয়াড়িতে জলের ছোট ছোট দেহের উপরে দুটি রঙিন হাঁসের ছায়া পাথরের আড়ালে একটু সরে গেলেই হল। সেই মুহূর্তে ওরা দুজনেই আনমনা হয়ে যায়। আর এগিয়ে যেতে ইচ্ছা করে না। তখনই বাড়ি ফিরে যায় সুশান্ত আর বন্দিতা।

কংক্রিটের নীড়ে, এক ফালি বারান্দার উপরে একই সোফায় দুজনে বসে গ্রামোফোন রেকর্ডের গান শোনে। গানের ভাষা আর সুর দুইই হঠাৎ আবেশে বিভোর হয়ে যায়। গানের মধ্যে দুটি অনুরাগের আবেগ কাছা-কাছি হয়ে হৃদয়ে হৃদয় রাখতে চাইছে। সুশান্ত আর বন্দিতা, দুজনের চোখের তারায় সেই আবেশের ছোঁয়া এসে যেন লুটিয়ে পড়ে। সুশান্ত বলে, "চল, ভেতরে যাই।"

ভিতর বলতে ওই একটি ঘর। বড় সুন্দর করে সাজান, যেন চিরক্ষণের বাসকশয়নবিধুর একটি ঘর। ওই ঘরের ভিতর গিয়ে তৃপ্ত ও শান্ত হয়ে যায় সুশান্ত ও বন্দিতার জীবনের আবেশ। যেন একেবারে নীরব হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে কপোত-কপোতীর প্রাণ। জগতের সব আলো ছায়া, সব শব্দ ছন্দ ও রঙের রূপকে এইভাবেই কাজে লাগিয়ে ওরা ওদের এই আবেগময় জীবনের যেন মধুর একটি উত্তাপের মায়া টেনে আনে। সুখী হয় ওরা।

কিন্তু এতদিন পরে আজ হঠাৎ এ কী হল? এমন করে আতঙ্কিতের মত শালবনের দিক থেকে হন্তদন্ত হয়ে নীড়ে ফিরে এল কেন সুশান্ত আর বন্দিতা? আকাশের বুকে মেঘে মেঘে ঢলাঢলি ছিল, ছায়ায় ছায়ায় অনেক জড়াজড়িও ছিল, তবু কেন এমন করে ছাড়াছাড়ি হয়ে আর যেন দুটি আধখানা হয়ে ওরা ফিরে আসে? দুজনের হাত-ধরাধরি ছিল না, গায়ে গায়ে লুটোপুটিও ছিল না। বরং যেন বেশ একটু আগু-পিছু আর এদিক-ওদিক হয়ে দুজনেই কংক্রিটের নীড়ে ফিরে এসে বারান্দার সোফার উপর নীরব হয়ে বসে রইল।

এবং সেদিনই সন্ধ্যায় ক্লাব-ঘরে টেবিল-টেনিস খেলতে খেলতে ল্যাবরেটরির মুখার্জি অফিসের ললিতবাবুর দিকে তাকিয়ে বলে, "সুশান্তবাবুদের ইউনিটি

কেমন যেন চমকে উঠেছে মনে হল। ও-রকম করে এলোমেলো হয়ে বাড়ি ফিরতে ত কোনদিন ওদের দেখিনি।"

ললিতবাবু হাসেন, "বলতে পারি না। কিন্তু শালবনের দিকে আর এক রকমের একটি ইউনিটিকে আজ ঘুরে বেড়াতে দেখেছি।"

"কে? কারা? নতুন লোক বোধ হয়?"

"হ্যাঁ, এক মাসের জন্য সেটেলমেণ্টের যে অফিস আর ক্যাম্প এসেছে, তারই সার্ভেয়র প্রভাতবাবু ও তাঁর স্ত্রী।"

"এঁদের ইউনিটি কি ওই রকমের শুধু জড়াজড়ি আর…"।

ললিতবাবু হাসেন, "না না, সে রকম কিছু নয়। দুজনেই দেখতে বেশ সুন্দর, দুজনেই বেশ হেসে হেসে গল্প করে আর ঘুরে বেড়ায়, দেখতে বেশ ভালই ত লাগে মশাই।"

"তা হলে মনে হচ্ছে, সুশান্তবাবুদের ইউনিটি, এই নতুন ইউনিটিকে দেখে বেশ একটু রাগ করে ফেলেছে।"

ললিতবাবু আরও জোরে হাসেন, "তা জানি না মশাই।"

এবং সেই সন্ধ্যাতেই কংক্রিটের নীড়ে একই সোফায় পাশাপাশি একটু আলগা হয়ে বসে গল্প করে সুশান্ত আর বন্দিতা।

সুশান্ত বলে, "তুমি ওই ভদ্রলোককে চেন নাকি বন্দিতা?"

বন্দিতা বলে, "কী আশ্চর্য, বলেইছি ত, কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হল। তুমিও ত বললে…।"

"ওই মহিলাকে আমারও চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।"

"থাকগে ওদের কথা, তুমি আজ আর একবার তোমার সেই চেনা মেয়েটার কথা বল ত, কিছুই লুকোতে পারবে না কিন্তু।"

সুশান্ত হাসে, "আর নতুন করে বলবার কী আছে? সবই ত তোমাকে বলেছি।"

"দেখতে কেমন ছিল মেয়েটা?"

"ভালই। কিন্তু আমি কোনদিন ওকে বলতে যাইনি যে, তুমি দেখতে বড় ভাল। সে-মেয়ে ছ বছর ধরে এই আশা করে দিন কাটিয়ে দিয়েছে যে, আমি ওকে বিয়ে করব।"

সত্যি কথাই বলেছে সুশান্ত। অতীতের ছ বছর ধরে গড়ে ওঠা একটা ইতিহাসের সার কথাটুকু বন্দিতার কাছে বলেছে সুশান্ত। গিরিডির এক

হরেনবাবু ও তাঁর মেয়ে নলিনীর কথা। সে-ইতিহাসের সবটুকু বন্দিতার কাছে না বললেও চলে; বলবার দরকারও হয় না। তা না হলে আজ সুশান্তকে আরও অনেক কথাই বলতে হত।

কোন এক অভ্র-কারখানার অফিসে অল্প মাইনের একটা চাকরি করতেন হরেনবাবু। আর ম্যাট্রিক পাশ করে সেই কারখানার অফিসেই আরও অল্প মাইনের একটা চাকরি নিয়ে যেদিন কাজ করতে গেল সুশান্ত, সেদিন হরেনবাবুই বললেন, "তুমি কলেজে পড় সুশান্ত। তোমার মামা যদি পড়ার খরচ না দিতে পারেন, তবে আমিই দেব।"

কলেজে পড়বার জন্য পাটনা রওনা হবার আগের দিন হরেনবাবুর বাড়িতে সুশান্তর নিমন্ত্রণ ছিল। সেদিনই বুঝেছিল সুশান্ত, কেন, কিসের জন্য হরেনবাবু সুশান্তর পড়ার খরচ দিতে চান। যেটুকু বুঝতে বাকি ছিল, সেটুকুও বুঝিয়ে দিল হরেনবাবুর মেয়ে নলিনী। "ছুটির সময় আসবেন ত, না পাটনাতেই থাকবেন?" কথাটা বলেই সুশান্তর মুখের দিকে যে-ভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিল নলিনী, তাতে বুঝতে আর কিছু বাকি থাকেনি যে, এরই মধ্যে সুশান্তকে চিরকালের আপন ভেবে বসে আছে নলিনী। ছ বছর ধরে কলেজের সব ছুটিতেই পাটনা থেকে ফিরেছে সুশান্ত; নলিনীর চোখের আশা প্রতি বছরে আরও হাসি-হাসি হয়ে ফুটে উঠেছে। চৈত্র মাসের ভোরে বেড়াতে বেড়াতে উশ্রীর ঝরনা পর্যন্ত চলে গিয়েছে সুশান্ত আর নলিনী। তা ছাড়া অনেক দেনাও করলেন হরেন-বাবু; সুশান্তর এম, এস-সি পরীক্ষার ফী দেবার সময় মধুপুরের সেই এক টুকরো জমিটাকেও বেচে দিয়ে টাকা জোগাড় করলেন।

তার পর বোটানিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট সুশান্ত যেদিন সাড়ে চার শো টাকার মাইনেতে ফরেস্ট-রিসার্চের সার্ভিস নিয়ে আলমোড়ার দেওদারের ছায়ায় দাঁড়িয়ে গিরিডির কথা ভাবল, সেদিনই প্রথম বুঝতে পারল সুশান্ত, বড় অন্যায় আশার দাবি দুই চোখে আর মনে মনে পুষে রেখেছে নলিনী, আর নলিনীর বাবা হরেনবাবু। পাটনার বন্দিতাকেই বার বার মনে পড়ে। বন্দিতার আশা মিথ্যে করে দিতে পারবে না সুশান্ত। তা ছাড়া আরও একটা সত্য কথা। নলিনীর মত মেয়ে বুকের কাছে দাঁড়িয়ে আছে কল্পনা করলেও যে মনের কোণে কোন পিপাসা আকুল হয়ে ওঠে না।

সোফার উপর বন্দিতার মূর্তিটা জোরে একটা নিশ্বাস ছাড়ে। সুশান্ত বলে, "একটা রেকর্ড বাজাই, কেমন?"

বন্দিতা বলে, "থাক।"

সুশান্ত হাসে, "তুমি কিন্তু সেই গল্পটার অনেক কিছুই বোধ হয়...।"

"কিছুই লুকোইনি সবই বলে দিয়েছি। আমি কী করতে পারি বল, যদি একটা লোক আমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে?"

বন্দিতাও সত্যি কথা বলে দিয়েছে। প্রায় সাত বছর ধরে একটা লোকের জীবনের আশা বন্দিতার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে এসেছে। বন্দিতা কিন্তু কোনদিন তাকে বলতে যায়নি যে, আমিও তোমার কাছে যাবার জন্য আশা করে রয়েছি।

সে-ইতিহাসের আর সব কাহিনী সুশান্তর কাছে বলে বলে বৃথা মুখ ব্যথা করবার দরকার হয় না। বলেও না বন্দিতা। নইলে বন্দিতাও বলতে পারত যে, সে-লোকটা শুধু একটা উপকারের জোরে বন্দিতার জীবনটাকে কিনে নিতে চেয়েছিল।

গয়ার মুন্সেফী আদালতের উকিল চঞ্চলবাবু যেদিন হার্টের অসুখে কাবু হয়ে বিছানায় আশ্রয় নিলেন, সেদিন সবার আগে এই কথাটাই ভেবে চোখ মুছেছিলেন, কী হবে তাঁর ওই একটি মাত্র মেয়ে বন্দিতার উপায়? সেদিন কোথা থেকে এসে একটি ছেলে যেন গায়ে পড়ে চঞ্চলবাবুর উদ্বেগ শান্ত করতে চেষ্টা করেছিল। সেটলমেণ্টে আমিনের কাজ করে, ষাট টাকা মাইনে পায়, সেই ছেলেটির নাম প্রভাত। পাটনার কনভেণ্টে চলে গেল বন্দিতা, স্কুল থেকে কলেজ পর্যন্ত অনেক পড়া পড়ল বন্দিতা, এবং সব খরচ প্রভাত নামে সেই আমিন মানুষটাই প্রতি মাসে চঞ্চলবাবুর হাতে তুলে দিয়ে গেল। এরই মধ্যে একবার বড়দিনের ছুটিতে গয়াতে এসে বন্দিতার আর কিছু বুঝতে বাকি থাকেনি, কিসের আশায় এত উপকার করে চলেছে প্রভাত।

বন্দিতার মুখের দিকে অনেকক্ষণ মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থেকে প্রভাত বলে, "তুমি ত আবার পাটনায় চলে যাবে, আর ফিরে আসবে সেই মে মাসে... তোমার একটা ফোটো আমায় দিয়ে যাও বন্দিতা, নইলে দিনগুলো যে সহ্যই করতে পারব না।"

আপত্তি করেনি বন্দিতা, প্রভাতের হাতে ফোটোটা তুলে দিতে গিয়ে

লজ্জাও পেয়েছিল; কিন্তু আর বেশী কিছু নয়। এবং পাটনাতে বি. এ. পরীক্ষার পাশের খবর বের হবার দিন সুশান্তর সঙ্গে সিনেমার ছবি দেখতে গিয়ে, সুশান্তর পাশে বসেই হঠাৎ আনমনা হয়ে বুঝতে পেরেছিল বন্দিতা, উপকারের বিনিময়ে এ কী অদ্ভুত ডাকাতি করতে চায় প্রভাত? তা হয় না। প্রভাতের মত একটা মানুষ চোখের কাছে চোখ রেখে হাসছে, ভাবতে যে একটুও ভাল লাগে না, কোন ইচ্ছাই বুকের বাতাস নিবিড় করে তোলে না।

গয়ার প্রভাত আর গিরিডির নলিনী জানতেও পারেনি, কবে এক শুভ সন্ধ্যায় আলমোড়াতে পরিপাটী করে সাজান একটি ঘরে, এবং সুন্দর করে সেজে আসা এক সোসাইটির চোখের সামনে সুশান্ত আর বন্দিতার বিয়ে হয়ে গেল।

তার পর? সোফার উপর পাশাপাশি বসে গল্প করতে করতে সুশান্ত বলে, "গিরিডির কোন খবর আমি জানি না, রাখিও না।"

বন্দিতা বলে, "আমিও, গয়ার খবর আমি শুধু এইটুকুই জানি যে, বাবা ভাল আছেন, আবার প্র্যাকটিস শুরু করেছেন। তা ছাড়া আর কোন খবর রাখি না।"

সুশান্ত আর বন্দিতা কতক্ষণ এই ভাবে একই সোফার উপর এতটা তফাত হয়ে আর আলগা হয়ে পাশাপাশি বসে আছে, তার হিসেবও রাখতে পারে না বোধহয়। দুজনের মাঝখানে যেন মস্ত বড় ভয়ানক তীক্ষ্ণমুখ একটা কাঁটার বেড়া হঠাৎ কোথা থেকে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। নড়লেই গায়ে বিঁধবে। তাই একটুও নড়ে না। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে সুশান্ত আর বন্দিতা।

সারা শালবনের মাথা আর দামোদরের বুক আলোতে ডুবিয়ে দিয়ে ওই যে অত বড় জ্বলজ্বলে চাঁদ জেগে উঠেছে, তাও বোধহয় ওদের চোখে পড়ছে না। অনেকক্ষণ পরে কথা বলে বন্দিতা, "আচ্ছা, ওরা দুজন বেহায়ার মত ওদিকে ওই মহুয়ার ভিড়ের দিকে কেন চলে গেল, আন্দাজ করতে পার?"

"হ্যাঁ, আমারও সন্দেহ হয়েছিল, ওরা যেন কেমন একটা বিশ্রী রকমের মতলব নিয়ে...।" বলতে বলতে চমকে উঠে দাঁড়ায় আর চেঁচিয়ে ওঠে সুশান্ত, 'বন্দিতা!'

বন্দিতা উঠে দাঁড়ায়। "কী?"

"ওই দেখ, ওরাই যে যাচ্ছে মনে হচ্ছে।"

ছটফট করে আর্তনাদের মত স্বরে বন্দিতা বলে, "কোথায় যাচ্ছে বলতে পার ?'

সুশান্তর মুখটা যেন একটা দুঃস্বপ্নময় ঘুমের ঘোরে বিড়বিড় করে ওঠে, "হয় বাঁধের দিকে, নয় নতুন ক্যানেলের দিকে, বোধহয় রাঁচি রোডের দিকে...।"

"তবে শুধু এখানে দাঁড়িয়ে দেখে লাভ কী ? চলই না একবার।"

"আমিও ত তাই বলছি।"

কংক্রিটের নীড়ের ভিতর থেকে যেন দুই মাতাল শিকারীর মত উতলা মূর্তি নিয়ে ছুটে বের হয়ে আসে সুশান্ত ও বন্দিতা। বন্দিতার গলার স্বরটা যেন দাঁতে দাঁত পেষা শব্দের মত কটকট করে ওঠে, "যদি একবার হাতে হাতে ধরে ফেলতে পারি..."।

সুশান্তর গলার স্বর চাপা আক্ষেপের মত হাঁসফাঁস করে ওঠে, "আমার কিন্তু এখনও বিশ্বাস আছে যে ...।"

'কিসের বিশ্বাস ?"

"ওই মহিলার পক্ষে কোন রকমের অসভ্যতা সম্ভব নয়।"

"আমার কিন্তু বিশ্বাস, ওই ভদ্রলোকের পক্ষে কোন রকম বাজে বিশ্রী ব্যবহার একেবারেই সম্ভব নয়।"

কিন্তু কোথায় কত দূরে, কোন দিকে চলেছে ওরা ?

আলেয়ার মত চটুল, দূরের সেই দুটি ধাবমান মূর্তির দিকে চোখ রেখে এগিয়ে যেতে যেতে হাঁপাতে থাকে সুশান্ত। বন্দিতার গায়ের আঁচল বার বার খসে পড়ে আর লাল কাঁকরের ধুলোর উপর লুটিয়ে পড়ে। এই জ্যোৎস্নায় পাগল হয়ে গিয়ে ওই ছায়া-ছায়া দুটি রহস্য বোধহয় পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে চলে যাবার জন্য তরতর করে শুধু এগিয়ে চলেছে। কোথায় গিয়ে থামবে কে জানে ?

থেমেছে। ঠিক জায়গাটিতে এসে থেমেছে। রাঁচি রোডের উপর যে জায়গাটিতে ইউকালিপটাসের ছায়া থমথম করে আর পথ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে থাকা থেঁতলান ফুলের গন্ধরসে ঢুলুঢুলু হয়ে বাতাস উড়ে যায়, ঠিক সেইখানে ছোট কালভার্টের লোহার রেলিংয়ের গায়ে হেলান দিয়ে ওরা দাঁড়িয়েছে। সুশান্ত আর বন্দিতাও আড়ালের শিকারীর মত আস্তে আস্তে ছায়া লুকিয়ে

আর পা টিপে টিপে ইউকালিপটাসের পাশে এসে দাঁড়ায়। এই ত এখানে দাঁড়িয়েই কালভার্টের উপর দাঁড়িয়ে থাকা ওই ছায়ার নাক-চোখগুলিকেও যে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ফিস ফিস করে সুশান্ত বলে, "আর এগিয়ে যাবার দরকার নেই বন্দিতা।"

দু চোখ অপলক করে দেখতে থাকে বন্দিতা, ওই ত হেসে উঠেছে তারই চোখের সাত বছর ধরে দেখা একটা চেনা মুখ। সুশান্তর কানের কাছে মুমূর্ষু মাছির গুঞ্জনের মত গুনগুন করে বন্দিতা, "ইস, ছি ছি, কি রকম অদ্ভুত হাসি হাসছে লোকটা!"

কিসের আক্ষেপ? সাত বছর ধরে দেখা সেই সামান্য মানুষটার মুখের হাসিকে দেখতে ভাল লাগবে না, বন্দিতার সেই বিশ্বাস চমকে উঠেছে, ঠকে গিয়েছে, তাই কি? সুশান্তও কি মনে করেছিল যে, ছ বছর ধরে দেখা সেই সামান্য মেয়েটার মুখের হাসি দেখতে এত ভাল লাগতে পারে না?

বাঃ, বেশ ত! খুব ওস্তাদ! কী ভয়ানক! বন্দিতার বুকের ভিতরে যেন আছাড় খেয়ে পড়তে থাকে এক-একটা পরম চমকের নীরব আর্তনাদ। লোকটাকে বাঘ-বাঘ মনে হয়, যেন দুটি থাবা দিয়ে মেয়েটার মস্ত বড় ওই খোঁপাটাকে আঁকড়ে ধরেছে। মেয়েটাকে খুন করবে নাকি ওই ভয়ানক লোভী পিপাসী লোকটা?,

মহিলার দুটি ছটফটে হাতের চুড়ি থেকে ঝিঝিঝিক করে ঠিকরে পড়েছে জ্যোৎস্নার আগুন। চমকে উঠে চোখের উপর রুমাল চেপে ধরেই আবার রুমাল নামিয়ে নেয় সুশান্ত। ছি ছি, ইউকালিপটাসের থেতলান ফুলের গন্ধরসে বিভোর হয়ে মাতাল হয়ে গিয়েছে ওই মেয়ে, নইলে হাত দুটোকে লোকটার কাঁধের উপর অলসভাবে ফেলে দিয়ে এমন করে ঢলে পড়বে কেন?

মিশে গিয়েছে, মিলে গিয়েছে, কী ভয়ানক এক হয়ে গিয়েছে ওই দুই মুখের হাসি। দেখতে পাওয়া যায় না ওদের মুখ। চাঁদ না ডুবে যাওয়া পর্যন্ত ওরা বোধহয় মুখ আর তুলবে না। এইভাবেই এই রাতের একটা জ্যোৎস্নামাখা রহস্যের শক্ত পাথর হয়ে এইখানে দাঁড়িয়ে থাকবে।

একটা ভিন জগতের রূপ যেন বন্দিতার দু চোখে আবেশ ধরিয়ে দিয়েছে। বন্দিতার অপলক চোখ দুটো টলমল করে। আনমনার মত বলে, "তুমি কি কিছু বললে?"

সুশান্তর শান্ত নিঃশ্বাসের বাতাসও যেন উষ্ণ হয়ে কোন এক নতুন রূপের

জগতে গিয়ে কাকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। বন্দিতার প্রশ্ন শুনেই চমকে উঠে বলে, "না, কিছু বলিনি। কিন্তু এবার বাড়ি ফিরলেই ত হয়।"

বন্দিতা বলে, "চল।"

সুশান্ত আর বন্দিতা। আর দুজনের একসঙ্গে বেড়াতে যাবার দরকার হয় না। সুশান্ত বলে, "থাক, ওই শালের জঙ্গলের মধ্যে আর দেখবার কী আছে?" বন্দিতাও স্বীকার করে। "দামোদরের ওই এক একঘেঁয়ে স্রোতের মধ্যে নতুন করে দেখবার আর কী এমন বস্তু আছে যে, রোজই একবার যেতে হবে।"

কংক্রিটের নীড় থেকে দুজনকে একসঙ্গে বের হতে হবে, আর ল্যাবরেটরি ও অফিস থেকে আবার দুজনের একসঙ্গে ফিরে যেতে হবে, এটাও যে একটা একঘেঁয়ে নিয়ম। কোন দরকার হয় না। সুশান্ত একটু আগেই কোয়ার্টার থেকে বের হয়, একটু পরে বন্দিতা। অফিস থেকে যাবার সময় বন্দিতাই একটু আগে চলে যায়, একটু পরে সুশান্ত।

সন্ধ্যা হলে কংক্রিটের নীড়ের বারান্দায় একই সোফার দু দিকে চুপ করে বসে থাকে সুশান্ত ও বন্দিতা। গ্রামোফোনের রেকর্ড বাজে। কত অনুরাগের ভাষা আর আবেগ গেয়ে গেয়ে ক্লান্ত হয় রেকর্ড। দুজনে শুধু কান পেতে শোনে।

কোলের উপর মরক্কো-বাঁধান শেক্সপীয়ার রেখে রোমিও-জুলিয়েট পড়ে বন্দিতা; কিন্তু পড়ে পড়ে ক্লান্ত হয় শুধু। পাশেই বসে আছে সুশান্ত নামে মানুষটি, বন্দিতার প্রেমের জীবনের পরম পাওয়া, তার দিকে একবার চোখ তুলে তাকাতেও ভুলে যায়।

কারা যেন হঠাৎ এসে এই পৃথিবীর সব আলো ছায়া শব্দ আর রঙের রূপ থেকে সেই মধুর উষ্ণতার শিহরটুকু লুট করে নিয়ে চলে গিয়েছে। তাই ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে সুশান্ত আর বন্দিতার শ্বাসবায়ু। চোখের সামনে মেঘে মেঘে যতই ঢলাঢলি করুক আর ছায়ায় ছায়ায় যতই জড়াজড়ি করুক, এই বারান্দার কোন মেঘলা সন্ধ্যায় অথবা কোন রাতের নীরব প্রহরে দম্পতির মনের আবেশ উতলা হয়ে ওঠে না।—ভিতরে চল। এই ছোট কথাটি আর শুনতে পায় না কংক্রিটের-নীড়ের এই ছোট বারান্দাটা। চিরক্ষণের বাসকশয়নবিধুর সেই ঘরটাও যে উদাস হয়ে আর শূন্য হয়ে পড়ে আছে।

ও-ঘরের ভিতরে যাবার জন্য স্বামী স্ত্রীর নিঃশ্বাসে কোন স্বপ্নময় আবেগ উতলা হয়ে ওঠে না ; চোখে-মুখে কোন আবেশ ধরে না।

"ভেরি স্ট্রেঞ্জ।" প্রবীন মাথুর সাহেবও দেখে চমকে ওঠেন আর মনে মনে বলে ফেলেন, এবং আশ্চর্য হয়ে যান। মার্কেট থেকে ফিরছে সুশান্ত আর বন্দিতা, কিন্তু কেউ যেন কারও কেউ নয়। সুশান্ত আগে আগে, আর বন্দিতা পিছু পিছু। সন্দেহ করেন মাথুর সাহেব, দুজনের মধ্যে কোন অভিমানের ঝগড়া ঘটেছে বোধহয়।

ললিতবাবুর বোনের বিয়ের দিনে এক ঘর লোকের আসরের মধ্যে আরও অদ্ভুত একটি কাণ্ড ঘটে গেল। সুশান্ত আর বন্দিতা যেন দুটি ভিন জীবনের মানুষ, কারও সঙ্গে কারও মুখের চেনাও নেই ; সুশান্তর পিছনের চেয়ারে চুপ করে বসে ছিল বন্দিতা। এবং ল্যাবরেটরির মুখার্জি এসে সেই ঘর-ভরা লোকের চোখের সম্মুখে চেঁচিয়ে উঠল, "এ কী ব্যাপার ? আপনাদের এরিথমেটিক অব লাইফ হঠাৎ এ রকম হয়ে গেল কেন ? প্লাস-মাইনাসে কাটাকুটি হয়ে গেল নাকি ?"

সুশান্তর মুখটা হাসতে গিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যায়, আর বন্দিতা হাসতেই পারে না। শুকনো চোখ দুটোকে যেন ভয়ানক বিদ্রূপ কামড় দিয়ে ধরেছে।

মুখার্জিই বলে, "কিন্তু ওঁরা দুজন ত ওঁদের এরিথমেটিক বেশ ঠিক রেখে চলে গেলেন।"

"কে ?"

বন্দিতা চমকে ওঠে, "কারা ?"

মুখার্জি বলে, "সেটেলমেণ্টের ওই প্রভাত বাবু ও তাঁর স্ত্রী।"

সুশান্ত চমকে উঠে প্রশ্ন করে, "চলে গেছে নাকি ?"

"এই ত কিছুক্ষণ আগে ওঁরা চলে গেলেন। ডালটনগঞ্জে চলে গিয়েছে, সেটেলমেণ্টের ক্যাম্প আর অফিস।"

গেরুয়া রঙের কাঁকরের ঢিপির উপর কংক্রিটের নীড়। বারান্দার উপর সেই একটি সোফা। ললিতবাবুর বোনের বিয়ে দেখে বাড়ি ফিরতেই রাত দশটা বেজে গিয়েছে। এখন ত অনেক রাত। সোফার এদিকে আর ওদিকে তবু চুপ করে বসে থাকে সুশান্ত আর বন্দিতা।

হঠাৎ যেন দপ করে জ্বলে ওঠে সুশান্তর গলার স্বর, "আমি সবই বুঝতে পারছি বন্দিতা, তোমার এখন কিছুই আর ভাল লাগছে না।"

"তার মানে ?"

চেঁচিয়ে ওঠে সুশান্ত, "তার মানে, আমাকে ভাল লাগছে না।"

কঠোর একটি ভ্রূকুটি করে শাণিত স্বরে বন্দিতা বলে, "আমিও যে বুঝতে পারছি, আমাকে তোমার একটুও ভাল লাগছে না।"

"ঠিকই বুঝেছ।"

"তুমিও ঠিক বুঝেছ।"

"এই অবস্থায় কী করতে হয়, কী করা উচিত জান ?"

"জানি, আমার চলে যাওয়া।"

"এবং আর কখনও ফিরে না আসা।"

"বেশ, তাই হবে।"

একই সোফার দু দিকে দুজনের জীবনের দুটি ঘৃণা হয়ে পড়ে থাকে দুটি মূর্তি, সুশান্ত আর বন্দিতা।

দামোদরের মিষ্টি হাওয়া আর শালবনের গন্ধ কতক্ষণ ধরে এই কংক্রিটের নীড়ের বুকের ভিতর ঢুকে হুটোপুটি করছে, তার হিসাব ওরা কেউ রাখে না। দু চোখে আধঘুমের আবেশ নিয়ে অলস হয়ে একই সোফার দুদিকে পড়ে থাকে সুশান্ত আর বন্দিতা নামে দুটি দেহ।

রাত কখন ভোর হবে কে জানে ? এখনও সারা আকাশ ভরে তারা ঝিকমিক করছে। জোর করে চোখ মেলে তাকায় সুশান্ত, যেন জোর করে জেগে উঠতে চাইছে প্রাণটা, কিন্তু জোর পাচ্ছে না। বুকের ভিতর ছটফট করছে প্রশ্নটা, বন্দিতা নামে এই নারীকে কি জীবনে আর ভাল লাগিয়ে নিতে পারাই যাবে না ?

হঠাৎ ছটফট করে ডেকে ওঠে সুশান্ত, "তুমি কি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়লে ?"

বন্দিতা বলে, "না।"

"তা হলে কী ভাবছিলে এতক্ষণ ধরে ?"

আস্তে আস্তে মুখ তুলে সুশান্তর মুখের দিকে তাকাতে চেষ্টা করে বন্দিতা ; কিন্তু বলতে পারে না যে, সব শান্তিকে মিথ্যে করে দেবার জন্য, সুশান্ত নামে ওই মানুষটিকে তার নিঃশ্বাসের পিপাসার কাছে ভাল লাগিয়ে নেবার জন্য, এতক্ষণ ধরে মনের ভিতর উপায় খুঁজতে

গিয়ে বৃথা আরও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বন্দিতা। সত্যিই কি কোন উপায় নেই ?

সুশান্তর গলার স্বর হঠাৎ নিবিড় হয়ে যায়, "আমি বলতে পারি বন্দিতা, আমি এতক্ষণ যা ভাবছিলাম তুমিও তাই ভাবছিলে।"

চমকে উঠে সুশান্তর দিকে একটু সরে এসে বন্দিতা বলে, "কী ভাবছিলে ?"

"রাঁচি রোডে কালভার্টের উপর জ্যোৎস্নারাতে দাঁড়িয়ে থাকা সেই ওদের দুজনের কথা।"

"হ্যাঁ।"

সুশান্তর মূর্তিটা যেন মনের ভুলে সরে এসে বন্দিতার গা ছুঁয়ে ফেলে। ছাড়াছাড়ি দুটি প্রাণ যেন কিসের টানে আবার কাছাকাছি হয়ে আসছে।

সুশান্ত বলে, "ভদ্রলোকের কাণ্ডটা মনে পড়ছে ?"

"খুব মনে পড়ছে।"

"কেমন ? দেখতে খারাপ লেগেছিল ?"

সুশান্তর একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে ফেলে বন্দিতা, "একটুও না। এবার তুমি বল।"

"কী ?"

"সেই মহিলার কাণ্ড ?"

দু হাতে বন্দিতাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সুশান্ত বলে, "সুন্দর।"

দামোদরের মিষ্টি বাতাস আর একবার ছুটোপুটি করে, এবং তারই সঙ্গে যেন লুটোপুটি করে উষ্ণ নিঃশ্বাসের শিহর।

সুশান্ত বলে, "চল, ভেতরে যাই।"

পুষ্পকীট

পথের উপর মস্তবড় একটা ভিড় এবং সেই ভিড়ের পাশ কাটিয়ে যাবার মত একটু জায়গাও নেই! এক কুঁজো ঠানদির হাত ধরে এক তরুণী অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে, এগিয়ে যাবার জন্য পথ খুঁজছে কিন্তু পথ পাচ্ছে না।

কে পথ পেল বা না পেল, তার জন্য সেই ভিড়ের মনে কোন চিন্তা নেই, একটু ভ্রূক্ষেপও নেই। ভিড়ের মাঝখানে এক ভেলকিওয়ালা তখন একটা ছোট ছেলের জিভ কেটে ফেলেছে; ছটফট করে কাতরাচ্ছে ছেলেটা, তার দু'কষ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

মাথার বাবরী চুলের গোছা ঝাঁকিয়ে, গলাফাটা স্বরে চেঁচিয়ে আর হাতে একটা বড় ভোজালি নিয়ে ভেলকিওয়ালা সেই ভিড়ের যত থরথর দৃষ্টি, কোঁচকান ভুরু, সিঁটকান নাক আর ফ্যালফ্যালে চোখের দিকে তাকিয়ে তখন এক ভয়ংকর আবেদন জানাতে আরম্ভ করেছে, "অর্ডার মি স্যার, সাহেবলোগ অর্ডার কর, বাবুলোগ হুকুম দাও, আর মশাইলোগ আজ্ঞা শুনাও। কাবুলী হো আর বাঙ্গালী হো, জাপানসে এসে থাক আর জার্মানিসে এসে থাক, জহুরী হো আউর বকরিওয়ালা হো, শেঠ ভিস্তি আমির ফকির মহাত্মা সব কোই দাঁড়িয়ে দেখ, হামি এই ভোজালিসে হামার এই ছেলেকে এখনি দুই টুকরা করিয়ে দেবে। তারপর......দেখনা জী জাদুকা খেল, ঐ কাটা ছেলে বাঁচিয়ে উঠবে আউর হাসিয়ে হাসিয়ে আপনাকে সেলাম দিবে।"

ভিড়ের শত শত মুখ থেকে একসঙ্গে হুকুমের হল্লা জেগে ওঠে, "হ্যাঁ, কাট কাট কাট, দেখি তোমার কেরামতি!"

ভেলকিওয়ালা তার হাতের ভোজালিতে টোকা মেরে আকাশের দিকে তাকিয়ে গর্জন করে জাদুর বুলি আউড়াতে থাকে, "ইরি মিরি চিরি, চিরি মিরি বাউ। কাম অন মাংকি স্কাল, কাম অন নাউ।"

হঠাৎ এক খেপা মহিষের গর্জন, ভিড়ের বাঁ দিক থেকে তেড়ে আসছে গর্জনটা, প্রায় এসে পড়েছে। ভাগ্ ভাগ্ পালা পালা, আতঙ্কিত ভিড়ের

গলা ভেদ করে একটা ভয়ার্ত হল্লার রব জেগে ওঠে। এত জমাট আর নিরেট ভিড়টা সেই মুহূর্তে যেন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে চারদিকে ছিটকে পড়ে। ভেলকিওয়ালার জিভ-কাটা ছেলে তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে ভেলকিওয়ালার হাত ধরে চেঁচায়, "ভাগিয়ে বাবাজান।"

ভেলকিওয়ালাও ভীতভাবে চেঁচায়, "ভঁইস, পাগলা ভঁইস।" তার পরেই ছেলের হাত ধরে এক লাফ দিয়ে মিঠাইওয়ালার ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে।

ফাঁকা পথ। শুধু দেখা যায়, পথের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে নিশ্চিন্ত মনে হেঁটে চলে যাচ্ছে এক তরুণী, সঙ্গে এক কুঁজো বুড়ি। তরুণীর সুন্দর মুখটা মিট মিট করে হাসছে। কয়েক পা এগিয়ে গিয়েই তরুণী একবার মুখ ফিরিয়ে তাকায়, আর সঙ্গে সঙ্গে ফিক করে হেসে ওঠে।

পিছু পিছু আস্তে আস্তে হেঁটে আর সিগারেট টানতে টানতে আসছে যে, তারই দিকে তাকাচ্ছে তরুণী, আব যেন মনের খুশি চাপতে না পেরে ফিক করে হেসে ফেলছে। আশ্চর্য, খেপা মহিষের গর্জন শুনে এতবড় একটা ভিড় ভয়ে ছুটে পালিয়ে গেল. শুধু পালিয়ে গেল না ঐ একটা কুঁজো বুড়ি আর একটি সুন্দর মেয়ে, যারা আগে আগে চলেছে। আর তাদের পিছনে ঐ একটা ছোকরা, মনের সুখে সিগারেট টানতে টানতে চলে যাচ্ছে। হাফ-হাতা একটা কামিজ গায়ে, ধুতির কোঁচা কামিজের পকেটে গোঁজা, পায়ে ধুলোমাখা নাগরা, আর হাতে একটা ঝোলা। কে জানে, কী আছে ছোকরার ঐ ঝোলার মধ্যে।

আতঙ্কিত ভিড়ের যারা পথের দু'পাশের দোকানে এসে ঠাঁই নিয়েছে, তারাই আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে, "কই, খেপা মহিষ গেল কোন দিকে? ইস্, কি বিশ্রী গর্জন রে বাবা।"

দোকানদারেরা হেসে ওঠে, "মহিষ-টহিষ নয় মশাই, ওটা একটা হরবোলা।"

"হরবোলা? কি আশ্চর্য। না, কখনই হতে পারে না।"

দোকানদারেরা হাত তুলে পথের সেই ছোকরাকে দেখিয়ে দিয়ে বলে, "হ্যাঁ, মশাই হ্যাঁ। ঐ দেখুন, ঐ ছোকরাটাই খেপা মোষের ডাক ডেকে আপনাদের ধোঁকা দিয়েছে"

তবু ভুল ভাঙ্গতে চায় না। অনেকেই বেশ একটু রাগ করে আবার

পথের উপর নেমে আসে। দোকানদারেরা চেঁচিয়ে আর হেসে ডাক দেয়, "ও নৃপেন, ও নৃপেন, তোমার কেরামতিটা আর একবার দেখাও, নইলে এরা বিশ্বাস করছে না।"

গাঁ গাঁ গাঁ—কী ভয়ানক গর্জন! মুখের সিগারেট ফেলে দিয়ে সেই ছোকরা সত্যিই শিঙেল জন্তুর মত মাথা দুলিয়ে, একেবারে খাঁটি খেপা মহিষের ডাক ডেকে দোকানের দিকে ছুটে আসে। হো হো হাসির সাড়া জেগে ওঠে চারদিকে। ছোকরাও আবার ব্যস্তভাবে হন হন করে চলে যায় পথের ঐ সেদিকে, যেদিকে এগিয়ে চলেছে সেই তরুণী আর কুঁজো ঠানদি।

ওর নাম নৃপেন। দোকানদারেরা ওকে চেনে। রোজ সকালে এই রাস্তা দিয়েই নৃপেন ঐ বেগুনী রঙের ঝোলা হাতে নিয়ে ব্যস্তভাবে চলে যায়। ঝোলার ভিতর আছে একগাদা সুগন্ধ ধূপকাঠি। সারাদিন ফেরি করে ধূপকাঠি বেচে যখন রাতের দিকে ঘরে ফেরে নৃপেন, তখনও এই পথ দিয়েই যায়। প্রায় রোজই বাড়ি ফেরার সময় এই পথের দুদিকের যত ব্যস্ততা আর গম্ভীরতা, যত হিসাব আর দুশ্চিন্তা, যত আক্ষেপ আর মতলবগুলিকে কিছুক্ষণের জন্য হাসিয়ে দিয়ে চলে যায় নৃপেন।

দোকানের আলোগুলি যখন মিটমিট করে, পথের উপর রাতের ধোঁয়া আর ধুলো যখন কিছুটা থিতিয়ে আসে, আর নিভু-নিভু হয়ে জ্বলতে থাকে পথের দুপাশে মরচে-পড়া লোহার পোস্টের মাথায় মিউনিসিপালিটির বাতি, তখন পথের সেই আলো-আঁধারী রহস্যের মধ্যে আর এক রহস্য চমকে ওঠে। যেন শোকের কান্না কাঁদতে কাঁদতে কোন মেমসাহেব চলে যাচ্ছে, কী করুণ সেই বিলাতী সুরের কান্না! যে শোনে সেই ব্যথিতভাবে আশ্চয হয়, এই তল্লাটে মেমসাহেবের কান্না এল কোথা থেকে ?

কিন্তু পরমুহূর্তে ভুল ভাঙে। আর বুঝতে কিছু বাকী থাকে না। হরবোলা নৃপেনই ঐ কান্না কাঁদতে কাঁদতে চলে যাচ্ছে। পথের লোকের মুখে, আর দোকানের ভিড়ের চোখে-মুখে হাসির দমক লাগে।

এই ভাবেই এক একদিন কুকুরের ডাক ডেকে পথের দুপাশের যত কুকুরকে রাগিয়ে দিয়ে চলে যায় নৃপেন। কুকুরগুলোর রাগ দেখে পথের মানুষ আকুল হয়। তারপর হঠাৎ এক আষাঢ় মাসের সেঁতসেতে রাতে পথের বাতাসে যেন আঁতুড় ঘরের বাচ্চা ছেলে কেঁদে ওঠে। অফুরান কান্না, কোন সান্ত্বনা মানছে না, কান্নার স্বর যেন বাচ্চাটার দম বন্ধ করে দিচ্ছে।

প্রথম শুনে চমকে উঠলেও রাস্তার লোক বুঝতে পারে এবং একটু পরেই দেখতে পায় যে, হ্যাঁ ঠিকই সন্দেহ করা হয়েছে, নৃপেন-হরবোলাই আঁতুড়ে কান্না কেঁদে কেঁদে চলে যাচ্ছে। হেসে ফেলে সবাই, এবং কেউ কেউ একটু বেশী খুশী হয়ে প্রশংসাও করে ফেলে—কায়দাগুলো বড় সুন্দর রপ্ত করেছে শালা।

হরবোলা নৃপেনের কেরামতি দেখে এত লোক খুশী হয়, কিন্তু নৃপেন নিজে বোধহয় জীবনে এই প্রথম খুশী হল। মেয়েটি, সেই সুন্দর মেয়েটি কুঁজো ঠানদির হাত ধরে পথের উপর অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু এগিয়ে যাবার পথ পাচ্ছিল না। ভিড়ের কোন বেটা একটু ভ্রূক্ষেপও করছিল না। সবাই বিভোর হয়ে ভেলকিওয়ালার একটা বাজে খেলা দেখছে। পথের দুপাশ জুড়ে এঁটে দাঁড়িয়ে আছে যেন ভিড়টা। মেয়েটির পক্ষে, আর ঐ কুঁজো বুড়ির পক্ষে এগিয়ে যাবার উপায় নেই, সাধ্যিও নেই। দূরে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে নৃপেন দেখেছে। শুনেছে নৃপেন, মেয়েটি কতবার চেঁচিয়ে অনুরোধ করেছে—আমাকে একটু পথ ছেড়ে দিন। কিন্তু কোন ফল হয়নি। ভিড়ের মধ্যে যারা তাকিয়ে মেয়েটিকে দেখল আর সেই অনুরোধও শুনল, তারাও নড়ল না। সবাই একেবারে নিরেট হয়ে ভেলকিওয়ালার খেলা দেখতে থাকে।

এগিয়ে আসে নৃপেন। মেয়েটিকে প্রশ্ন করে, "কেউ সরছে না বুঝি?"

মেয়েটি বলে, "হ্যাঁ দেখুন না, পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে, এত বলছি তবু কেউ সরে যাবার নাম করে না।"

নৃপেন বলে, "এখুনি সরিয়ে দিচ্ছি।"

তারপরেই সেই গাঁ গাঁ গাঁ, খেপা মহিষের প্রচণ্ড-গম্ভীর গর্জন। সেই মুহূর্তে ভিড় ফাঁকা হয়ে গেল। ফিক করে হেসে ফেলল মেয়েটি।

কেরামতিটা যে এমন সুন্দর একটি তরুণীর উপকারের কাজে লাগবে বা লাগতে পারে, এমন ধারণা নৃপেনের কল্পনাতেও কোনদিন দেখা দেয়নি। বোধহয় তাই নৃপেনের মনটা এই প্রথম এত খুশীতে ভরে উঠেছে। নৃপেনের কেরামতি দেখে কত শত মানুষই ত রোজ হাসছে, কিন্তু ওরকম মিষ্টি হাসি ত কেউ হাসেনি।

হাতে বেগুনী রঙের ঝোলা, এক গাদা ধূপকাঠি এখনও ঝোলাটাকে ভারী করে রেখেছে। আজ ভাল বিক্রি হয়নি। শরীরটাও বড় ক্লান্ত।

তবু মনটা যেন হঠাৎ বড় বেশী ভাল হয়ে গিয়েছে। মনে হয়, অগুরু ধূপের গন্ধমাখা একটা বাতাস যেন বুকের ভিতরে গিয়ে ঢুকেছে।

কুঁজো ঠানদির হাত ধরে সেই মেয়েটির পিছু পিছু অনেক দূর একই পথে হেঁটে এসেছে নৃপেন। গাঙ্গুলীপাড়ার কাছে এসে একবার শুধু থমকে দাঁড়িয়েছে আর দেখতে পেয়েছে নৃপেন, ওরা বাঁ দিকের কাঁচা রাস্তাটা ধরে চলে গেল। কোথায় গেল কে জানে! কোথায় থাকে ওরা? অমন ছিমছাম ফিটফাট আর সুন্দর মুখের মেয়ের পক্ষে ত ওদিকের কোন বাড়িতে থাকবার কথা নয়। ওদিকে যে শুধু কতগুলি ডোবা আর কেয়ার ঝোপ আর ইটখোলা। হ্যাঁ, গোটাকয়েক মেটে বাড়ি ওদিকে আছে, তার একটিতে থাকেন লক্ষী কেবিনের শিবুদা। বেচারা শিবুদা, মাসে দশ টাকা বাড়ি ভাড়া দিতেই হিমসিম খেয়ে একবেলা উপোস করেন। ইটখোলার কুলি সরদারেরাও ছাগল-ভেড়া নিয়ে কেয়াতলার ঐসব মেটে বাড়িতে থাকে। ঐ মেয়ে, ফোটা ফুলের মত অমন সুন্দর মুখ, সে কেন কেয়াতলার মত বাজে জায়গায় মেটে বাড়িতে থাকবে? কিন্তু যদি থাকে? যদি ওরা নৃপেনের মত খুব গরিব হয়? নৃপেনের বুকের ভিতর অদ্ভুত একটা আশা যেন দুরু-দুরু করে!

গাঙ্গুলীপাড়ার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ডানদিকের বস্তিটার দিকে তাকায় নৃপেন। ঐ বস্তির মধ্যেই একটি ঘরের ঘুলঘুলিতে এখনও আলো ফুটে ওঠেনি। ওটাই হল নৃপেনের ঘর। এখন ঘরে গিয়ে এই ঝোলা নামাতে হবে, কেরোসিনের কুপি জ্বালতে হবে, উনুন ধরাতে হবে, তারপর রাঁধতে হবে।

নাঃ, আর ভাল লাগে না। আজ শুধু কয়েক মুঠো চাল ফুটিয়ে শুধু আচারের লংকা দিয়ে খেয়ে নিলেই চলবে। মাঝরাত পর্যন্ত ছ্যাকছোঁক করে রান্না করা আর ভাল লাগে না। মিছে সময় নষ্ট। তার চেয়ে বরং ঐ মেয়েটির সুন্দর মুখটাকে ঘণ্টাখানেক ভাবলে কাজ হবে।

যেন পেটের ক্ষুধাটারও চাড় নেই। আস্তে আস্তে বস্তির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে নৃপেন।

কেয়াতলার এক ডোবার ধারে ছোট একটা মেটে বাড়ি। কুঁজো ঠানদি সকালের রোদে দাওয়ার উপর পা টান করে বসে এদিক-ওদিক

তাকান। তারপর গলার স্বর চড়িয়ে যেন এই সকালবেলার শোভাটাকেই গাল পাড়েন, "শুধু সাজ আর সাজ, শুধু বাহার দিয়ে শাড়ি পরা আর খোঁপা বাঁধা। বলি তোর কোন নাগর এসে তোর রূপ দেখে ভিরমি খাবে যে দিনরাত এত সাজছিস ?"

ঘরের ভিতরে জানালার উপর আরশি রেখে মনে মনে হেসে ওঠে সুমতি। কুঁজো ঠানদির ঠাটা আর গালাগালি দুই-ই সমান! রোজই ওরকম দুটো চড়া কথা শুনতে হয়. শুনে শুনে গা-সহা হয়ে গিয়েছে। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে রোজই গুনগুন করে গান করে, খোঁপা বাঁধে, কপালে টিপ আঁকে আর চোখে কাজল দেয় সুমতি।

কুঁজো ঠানদি তারপর সুমতিকে ছেড়ে দিয়ে তাঁর নিজের ছেলেকেই গালমন্দ করতে থাকেন, "ওরে ও ন্টু, বলি তোর আদুরে বোনঝিকে কি পরী বানিয়ে সাহেবপাড়ায় বেচতে নিয়ে যাবি ? ছুঁড়িকে এত লাই দিস কেন ? শুধু সাজবে সাজবে আর সাজবে, একটা ঘুঁটে ভেঙে দিয়েও সংসারের কম্মি করবে না। ছুঁড়ি ভেবেছে কী ?"

ন্টবিহারী দাঁতের মাজন আর ঘটি নিয়ে দাওয়ার উপর এসে বসেন, "সকালে উঠেই বাপ-মা মরা মেয়েটাকে গালমন্দ করছ কেন মা ? সাজলে সুন্দর দেখায়, সাজতে ভাল লাগে, এই ত সাজবার বয়স, এতে দোষ কী আছে ?"

কুঁজো ঠানদি ফেটে পড়েন, "না, ওর কোন দোষ নেই। যত দোষ আমার। বেশ ত, আদুরে বোনঝিকে পরী সাজিয়ে সাহেব পাড়ায় দিয়ে আয়. আর আমি মরি, তারপর আমার পেটে খড় পুরে জাদুঘরে রেখে দিয়ে আসিস।"

সুমতির ন্টু মামা কিন্তু একটুও বিচলিত হন না, রাগও করেন না। হাত মুখ ধুয়ে শান্তভাবেই ঘরের ভিতরে চলে যান। তারপর নিজের হাতেই কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার আয়োজন করেন। সকাল ন'টার মধ্যে বের হয়ে যেতে হবে। গাঙ্গুলীপাড়া থেকেও অনেক দূরে, চিড়িয়া মোড় পার হয়ে বি টি রোডের উপর এক কারখানার আপিসে ফাইল দপ্তরীর কাজ করেন সুমতির ন্টু মামা।

ততক্ষণে সুমতির সাজ সারা হয়ে গিয়েছে। তবুও আর একবার জানালার কাছে দাঁড়ায়, আরশিতে মুখ দেখে, ঘাড়ের দুপাশে পাউডার

ছড়ায়। তারপর? তারপর ডোবার ওপারে সুপুরি বাগানের মাথার দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

কুহু কুহু কুহু! কোকিলের মিষ্টি ডাক। অগ্রাণ মাসের সকালবেলায় কোকিল এল কোথা থেকে?

সুমতির চঞ্চল চোখ দুটো যেন উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে যত সুপুরি নারকেল আম নিম আর শিমুলের ডালপালাগুলির দিকে তাকিয়ে কোকিল খুঁজতে থাকে। কিন্তু বোঝা যায় না, কোকিলের স্বর কোন দিক থেকে আসছে।

হঠাৎ চমকে ওঠে সুমতি। ও কে? শিবুবাবুর বাড়ির দাওয়ার উপর বসে রয়েছে কে? হাফ-হাতা কামিজ গায়ে, কোঁচাটা পকেটে গোঁজা, হাতের কাছে বেগুনী রঙের ঝোলা। কী আশ্চর্য, সুমতির মনের বিস্ময়টাই যেন খিল খিল করে হেসে ওঠে।

চোখ তুলে বেশ ভাল করে দেখতে থাকে সুমতি। কাল রাতে পথের ভিড়ের পাশে মানুষটাকে দেখে ঠিক বুঝতে পারা যায়নি যে, ওর মুখটা এত কচি। বেশ দেখতে। যতই বয়স হক, পঁচিশের বেশি হবে না।

কুঁজো ঠানদি চিৎকার করেন, "বলি ও তেইশ বছরের ধিঙ্গি, রোগা মামাটা হাত পুড়িয়ে ভাত রাঁধছে, আর তুই চোখে কাজল ফলিয়ে কার চোখের মাথা খাচ্ছিস, অ্যাঁ?"

কুহু কুহু কুহু! আবার কোকিল ডেকে ওঠে, কিন্তু আর আশ্চর্য হয় না সুমতি। আর বুঝতে কিছু বাকি নেই। কোকিলের ডাক ডাকছে যে, সে-ই ত শিবুবাবুর বাড়ির দাওয়ার উপর বসে সোজা এই দিকে তাকিয়ে আছে। সুমতির সারা মুখটাই মিষ্টি হয়ে ওঠে, দুঠোঁটের ফাঁকে মিটমিট করে সুন্দর একটি হাসি।

সেই হাফ-হাতা কামিজ, পকেটের ভিতর কোঁচাটা গোঁজা, হাতে বেগুনী রঙের ঝোলা, পায়ে ধুলো মাখা নাগরা, কিন্তু নৃপেনের প্রতিদিনের জীবনের পথটাই যেন একটা বাঁক ঘুরতে গিয়ে একটু বড় হয়ে গিয়েছে। বস্তি থেকে বের হয়ে কেয়াতলার এই পথ দিয়ে একটু ঘুরে গিয়ে তারপর গাঙ্গুলী-পাড়ার পথ ধরে নৃপেন। একটা মেটে বাড়ির জানালায় ফোটা ফুলের মত সুন্দর একটা মুখের হাসি রোজই দুচোখে একবার দেখে নিয়ে তবে কাজের পথে এগিয়ে যেতে পারে। শিবুদা বলেছেন, "ও মেয়ের বিয়ে

হবে না। বিয়ে দেবার ক্ষমতা নেই সুমতির মামা স্তুটুবাবুর। ফাইল দপ্তরীর কাজ করেন স্তুটুবাবু, ছাপ্পান্ন টাকা মাইনে পান, বিয়ের খরচ জোগাবেন কেমন করে?"

নৃপেন বলে, "কেন, কেউ যদি যেচে ঐ মেয়েকে বিয়ে করতে চায়, তবে?"

শিবুদা হাসেন, "কে ঐ মেয়েকে যেচে বিয়ে করতে যাবে? তুই?"

কোন উত্তর দেয়না নৃপেন। শুধু চুপ করে বেহায়ার মত হাসে। লক্ষ্মী কেবিনের শিবুদা চোখ পাকিয়ে ঠাট্টা করেন, "বেটা কচুবনের বেড়াল, তুই যেচে মরলেও তোকে কোন মেয়ে বিয়ে করতে রাজি হবে রে?"

—ফ্যাঁস ফ্যাঁস ফ্যাঁস! রাগী বেড়ালের ডাক ডেকে দু'থাবা তুলে শিবুদার ভুঁড়িটাকে আঁচড়ে আর খিমচে দিয়ে হাসতে হাসতে সরে পড়ে নৃপেন।

শিবুদা বিশ্বাস করেন না, এই পৃথিবীর বোধ হয় কেউ বিশ্বাস করবে না, কিন্তু নৃপেন বিশ্বাস করে, কেয়াতলার স্তুটুবাবুর বাড়ির ঐ মেয়ে সুমতি যার নাম, সে-মেয়ে রোজ সকালে জানালার ধারে নৃপেনেরই আসার প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কেয়াতলার পথের উপর নৃপেন এসে দাঁড়াতেই সুমতির সারামুখে অদ্ভুত এক হাসি চমকে ওঠে। মুখ ফিরিয়ে নেয় না, একটুও লজ্জা পায় না সুমতি। যতক্ষণ দেখা যায়, যতক্ষণ না নৃপেন গাঙ্গুলীপাড়ার রাস্তায় অদৃশ্য হয়ে যায়, ততক্ষণ নৃপেনের দিকে তাকিয়ে থাকে সুমতি।

কেয়াতলার মেটে বাড়ির ঐ জানালা, প্রতিদিন যেন নৃপেনকে একটি আশার আশ্বাস দেয়। ফোটা ফুলের মত হেসে সুন্দর হয়ে রয়েছে সুমতির মুখ। কোনদিনও কোন মুহূর্তে একটুও গম্ভীর হয়ে যায় না। বিরক্ত হয় না, কোন অভিমানও কেঁপে ওঠে না ঐ মেয়ের কাজলপরা চোখের ভুরুতে। নৃপেনের প্রতিদিনের জীবনের পথে যেন হাসিভরা নৈবেদ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুমতি।

আর ভয় করবার কিছু নেই। শিবুদার কথাগুলি নিছক একটা মিথ্যার হুমকি। আকাশে চাঁদ থাকলে এই কেয়াতলারই জ্যোৎস্না ছড়ান পথের উপর দিয়ে একবার না ঘুরে গিয়ে পারে না নৃপেন। বেশ সুন্দর মিষ্টি-মিষ্টি নাকিস্বরে কেঁপে কেঁপে যেন একটা বেহালার সুর নৃপেনের মুখে সুরেলা হয়ে বাজে। খোলা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে সুমতি। সুমতির

মুখের হাসিটা যদিও দেখা যায় না, কিন্তু মনে হয় নৃপেনের, এই মিথ্যা বেহালার সুর শুনে সুমতির প্রাণটাও খুশী হয়ে হাসছে।

তারপর একদিন, সে-রাতে নৃপেনের মনের সাহসটাই যেন হঠাৎ হেসে উঠল। মুটবিহারীবাবুর সেই মেটে বাড়ির ছোট জানালাটার একেবারে কাছে এসে দাঁড়ায় নৃপেন। সুমতি হাসে, "কাকে খুঁজছেন?"

নৃপেন বলে, "বড় ক্লান্ত হয়েছি, এক গেলাস জল খাওয়াও সুমতি।"

চমকে ওঠে সুমতি, "অ্যাঁ? আপনি আমার নামও জানেন দেখছি।"

"তা আর জানব না। না জেনে উপায় কী?"

"কী বললেন?"

"আমার নামটাও তোমার জানা উচিত।"

সুমতি হাসে, "বলুন।"

"আমার নাম নৃপেন। তোমাদের মত আমিও কায়স্থ।"

"আপনি কী করেন?"

"এতদিন বলতে গেলে কিছুই করছিলাম না। কিন্তু এখন করছি।"

"কী?"

"সিঁথির ঢালাই-কারখানায় কাজ শিখছি। এক বছর কাজ শেখার পর ষাট টাকা মাইনের চাকরি হবে।"

"তারপর?"

"তারপর তুমিই বল না?"

"আমি কেন বলব? আপনি মামাবাবুকে বলুন।"

"সময় হলেই বলব সুমতি।"

বাড়ির ভিতরের দাওয়া থেকে কুঁজো ঠানদির চিৎকার হঠাৎ বেজে ওঠে। "ফিসির ফিসির কিসের শব্দ হচ্ছে, কে কথা বলছে, ও সুমতি?"

—চিক চিক চিক! কিচ কিচ কিচ! তালুতে জিভ ঠেকিয়ে অদ্ভুত শব্দ করে কুঁজো ঠানদির ঐ সন্দেহটাকেই যেন ঠাট্টা করে নৃপেন। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসির শব্দ চেপে রাখে সুমতি। কুঁজো ঠানদি আরও জোরে আতঙ্কিত স্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন, "ছুঁচো ছুঁচো, ঘরে ছুঁচো এল কোত্থেকে সুমতি, শিগ্গিরি বাতি নিয়ে দেখ।"

আর দেরি করে না নৃপেন। সুমতিও বাতি হাতে তুলে নেয়। বাতির আলোর আভায় রঙিন হয়ে উঠেছে সুমতির মুখ। নৃপেনের মনে হয়, শুধু

বাতির আভায় নয়, জীবনের সবচেয়ে আনন্দের একটা আশ্বাস পেয়ে রঙিন হয়ে উঠেছে সুমতির মুখ।

পথে এসে নৃপেন একবার ভাবে শিবুদার কাছে এত তাড়াতাড়ি সব কথা না বলে ফেলাই ভাল। বড় বেশী আশ্চর্য হয়ে যাবেন অবিশ্বাসী শিবুদা।

মিথ্যে কোকিল ডেকেছিল অঘ্রাণ মাসের এক সকালে, আর সত্যি কোকিল ডেকে উঠল ফাল্গুন মাসের এক সন্ধ্যায়। কেয়াতলায় শিবুদার বাড়ির দাওয়ার উপর বসে কুটবিহারীবাবুর বাড়ির আলোমাখা মূর্তির দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে নৃপেন। সিঁথির ঢালাই-কারখানায় হাড়-ভাঙা অ্যাপ্রেন্টিসের কাজ সারতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। এখানে এসে পৌঁছতে সন্ধ্যা পার হয়ে গিয়েছে।

কেয়াতলায় কাঁচা সড়কে ধুলোর উপর একটা মোটর গাড়ি। কুটবিহারীবাবুর বাড়ির দাওয়ায় আর উঠোনে গ্যাসবাতি জ্বলে। শাঁখের শব্দ আর বার বার উলু-উলু রব। আম বাগানের অন্ধকারের মধ্যে সত্যিই কোকিল ডাকে বার বার।

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিল নৃপেন। তারপর শিবুদার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, "সুমতির বিয়ে হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।"

"তোর কি এখনও বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে?"

"না, কিন্তু হঠাৎ এরকম একটা বিয়ে জমে উঠল কেমন করে?"

"মেয়ের রূপ দেখে কুটবিহারীবাবুর অফিসের স্টোরবাবু মেয়েকে পছন্দ করে ফেলেছে। মেয়েকে এক সেট জড়োয়া দিয়ে আশীর্বাদ করেছে। বিয়ের খরচ পর্যন্ত স্টোরবাবুই দিয়েছে। বেশ ভদ্রলোক, টাকা পয়সাও বেশ আছে, যদিও ঠিক সুমতির মত মেয়ের বর হবার মত ইয়ং নয়, আর চেহারাটাও কালো, তার উপর মাথায় চকচকে একটা টাক আছে।"

"বাঃ, বেশ মানিয়েছে।" হেসে চেঁচিয়ে ওঠে নৃপেন। নৃপেনের দু'-চোখের যেন দুরন্ত একটা ঠাট্টার আগুন দপ করে জ্বলে ওঠে।

শিবুদা জিজ্ঞাসা করেন, "চা খাবি?"

"না, আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে শিবুদা।"

"কী?"

"কাল যখন বর-বউ রওনা হবে তখন...।"

"কাল নয় রে, আজই, আর একটু পরে বর-বউ বের হবে। বেলঘরিয়াতে বরের বাড়িতেই বাসর হবে।"

একটা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় নৃপেন, "তাহলে এখুনি উঠুন শিবুদা, বিয়েবাড়ির সামনে পথের কাছে দাঁড়াই।"

"কেন রে ?"

"গাধার ডাক ডাকব।"

হেসে ফেলেন শিবুদা। কিন্তু আপত্তিও করেন, "পরের বাড়ির ব্যাপারে যেচে এ-সব রগড় করার দরকার কী নৃপেন ? আমার বিয়ে যখন হবে তখন যত খুশি গাধার ডাক আর ঘোড়ার ডাক ডাকিস।"

উলুর শব্দ আরও জোরে শোনা যাচ্ছে। বরযাত্রীর দল উঠে এসে দাঁড়িয়েছে। মোটর গাড়ির ড্রাইভার মুখের বিড়ি ফেলে দিয়ে ষ্টিয়ারিংএ হাত দেয়। বর-বউ বের হয়ে এসেছে। গাড়ির ভিতর উঠছে।

"শিগগির চলুন শিবুদা " ছুটে এসে পথের উপর দাঁড়ায় নৃপেন।

সুমতির মুখটা স্পষ্ট দেখা যায়। কী আশ্চর্য, ঠিক সেই ফোটা ফুলের মত হাসি-হাসি মুখ। এক ফোঁটা ব্যথা নেই সেই মুখের উপর। কাজল আঁকা চোখের কোণে এক কণাও জল নেই।

গাড়ির এঞ্জিন গোঁ-গোঁ করছে। এইবার স্টার্ট নেবে গাড়ি। শিবুদার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে নৃপেন, সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা থাবা দিয়ে নিজের মুখটাকে আঁকড়ে ধরে গাধার ডাক ডাকবার জন্য তৈরী হয়।

গীয়ার টেনেছে ড্রাইভার। আর, গাড়ির চাকা সবেমাত্র গড়িয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র এক আর্তনাদের সঙ্গে চমকে উঠে ব্রেক কষে গাড়ি থামায় ড্রাইভার। মর্মভেদী করুণ ও তীক্ষ্ণ একটা আর্তস্বর। কেঁউ কেঁউ কেঁউ, কাঁই কাঁই কাঁই। গাড়ির চাকায় চাপা পড়েছে একটা কুকুর।

বাধা পড়েছে, শুভযাত্রায় বড় বিশ্রী একটা বাধা। বরযাত্রীর দল চঞ্চল হয়ে গাড়ির চাকার দিকে তাকায়। ড্রাইভার এক লাফ দিয়ে বের হয়ে এসে পথের উপর উবু হয়ে বসে ও মাথা ঝুঁকিয়ে গাড়ির তলার দিকে তাকায়। কিন্তু কই ? গাড়ির চাকার তলায় কোন আহত কুকুরের দেহ ত পড়ে নেই। কী ব্যাপার ? বরযাত্রীর দল বলাবলি করে, এ কী রকমের ব্যাপার হল ?

শিবুদাও আশ্চর্য হয়ে নৃপেনের কানের কাছে ফিস ফিস করেন, "কী

ব্যাপার রে নৃপেন? রগড় করতে গিয়ে কাঁই কাঁই করে কেঁদে উঠলি কেন?”

ড্রাইভার এদিক ওদিক তাকায়; তার পরেই হো-হো করে হেসে ওঠে। “তাই বলি, হরবোলা নৃপেন দাঁড়িয়ে আছে এখানে!”

গাড়ির ভিতর থেকে চন্দনের ফোঁটা আঁকা মুখ আর কাজলপরা চোখ নিয়ে সুমতি আস্তে আস্তে নৃপেনের দিকে তাকায়। ঠোঁটের ফাঁকে মিটমিট করছে সেই সুন্দর হাসি।

নৃপেনের হাত ধরে টান দেন শিবুদা, “হাঁ করে আর কী দেখছিস নৃপেন? ফোটা ফুলের মত সুন্দর মুখ?”

নৃপেন বলে, “হ্যাঁ শিবুদা, কিন্তু বুঝতে পারছি না, ফুলের মধ্যেও কেন পোকা থাকে।”

“আর বুঝতে হবে না, চা খাবি চল।”

পঙ্কতিলক

ঘরের মাঝখানে বেশ লম্বাচওড়া অথচ বেশ বেঁটে একটা তক্তাপোষ, তার উপর নকশাদার পুরু বনাতের ফরাশ পাতা। ছোট বড় চারটে তাকিয়া। দেয়ালে মস্ত বড় রঙিন ছবি—আদম ও ইভ। ছবির চওড়া ফ্রেম সোনালী গিল্টি করা। মস্ত বড় একটা দেয়াল-ঘড়ি টিক টিক করে। হারমনিয়মটা বাক্সে বন্ধ করা হয়েছে, শুধু এসরাজটা তখন ফরাশের উপর পড়ে আছে, গেলাপ পরানো হয়নি।

ফরাশের এক কিনারায় বসে মেঝের উপর পা নামিয়ে দিয়ে কোলের উপর একটা গল্পের বই রেখে, হেঁট-মাথা হয়ে বেশ মন দিয়ে পড়ছে মানসী, তাই ঘরের বাইরে থেকে ওর মুখটা ঠিক দেখা যায় না। উপরে একটা রঙিন বেলোয়ারী ঝাড় দোলে। সে-কেলে সেই বেলোয়ারী এখন একেবারে ঠাণ্ডা; তার মাঝখানে শুধু গরম হয়ে এ-কেলে বিদ্যুতের একজোড়া আলোর গোলক জ্বলছে। তাই দেখা যায়, মানসীর পাউডার মাখা গলার সঙ্গে সেঁটে সরু একটি সোনার হার চিকচিক করছে, আর খোঁপার মাঝখানে একটা রুপোর প্রজাপতি।

রাস্তার ফুটপাত ঘেঁসে এই ঘর। জানালায় পর্দা আছে। ফুটপাথের লোকের ভিড় সেই পর্দায় সব সময় অস্পষ্ট ছায়া নাচিয়ে যাওয়া-আসা করে। কিন্তু উঁকিঝুঁকির ছায়াগুলিকে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। মানসীও বেশ স্পষ্ট করে বুঝতে পেরেছে, অনেকক্ষণ ধরে একটা উঁকিঝুঁকির ছায়া জানালার পর্দায় ছটফট করছে, মাঝে মাঝে সরে যায়, আবার ফিরে আসে।

হঠাৎ বই বন্ধ করে মুখ তোলে মানসী। সদরের দরজাটা কি বন্ধ আছে? কিংবা ভেজান? না, একেবারে খোলা?

উঠে দাঁড়ায় মানসী। দু পা এগিয়ে যেতে না যেতেই মচ-মচ জুতোর শব্দ শুনে থমকে দাঁড়ায়। সর্বনাশ! বুকের ভিতরটা থর থর করে ওঠে। সদরের দরজা তাহলে খোলা ছিল।

মানসীর বুকের এই থরথর ভয় এক অদ্ভুত ভয়। নিজের প্রাণের জন্য নয়, পরের প্রাণের জন্য। শুধু আজ নয়, এই দশ-বছরের মধ্যে কতবার যে এই ভয় মানসীর বুক কাঁপিয়েছে তার হিসাব মানসীও গুনে বলতে পারবে না। এখনই একটা কাণ্ড হবে। বড় বিশ্রী, বড় হিংস্র এই কাণ্ড। আবার শুনতে হবে সেই সব চিৎকার আর হুঙ্কার। দেখতে হবে সেই দৃশ্য, ঘুষি, লাথি, কিল আর চড়ের মাতামাতি। কিংবা লাঠি, লোহার রড আর সোডার বোতলের দাপাদাপি।

যা ভেবেছিল মানসী, বোধ হয় তা নয়। আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়ে মানসী যেন তার বুকের থরথরানিটাকেই মনে মনে সান্ত্বনা দেয়, না ভয় করবার কিছু নেই। ভদ্রলোক বোধ হয় ভুল করেননি। নিশ্চয় বড়দার চেনা মানুষ।

ভদ্রলোক বেশ শৌখিন, অন্তত সাজপোশাক দেখে তাই মনে হয়। জুতো থেকে শুরু করে হাতের আংটি আর সিল্কের পাঞ্জাবি পর্যন্ত সবই ঝকঝকে। বউদির কাছে গল্প শুনেছে মানসী, তার মামাতো ভাই খুব শৌখিন। মানসী জানে, বউদির মামাতো ভাইএর বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ, এই ভদ্রলোকের বয়সও যে তাই মনে হয়। বউদির মামাতো ভাইএর চেহারাটি বেশ, এই ভদ্রলোকও ত বেশ। এমন ভালো চেহারা খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। চোখের চশমা হাতে নিয়ে চশমার কাঁচ মুছছেন ভদ্রলোক।

চশমা পরে নিয়ে মানসীর দিকে তাকাতেই ভদ্রলোকের সেই ঝকঝকে চেহারা যেন এক নতুন খুশির আলোকে আরও চমক দিয়ে ওঠে। দরজার কপাটে এক হাত রেখে প্রশ্ন করেন ভদ্রলোক, "তুমি এই ঘরে কতদিন?"

বুকের ভিতরে তীক্ষ্ণ একটা খোঁচা দিয়ে মানসীর ভয়টা যেন রক্তমাখা হয়ে চোখের সামনে ভাসতে থাকে। কোন সন্দেহ নেই, ভুল করেছে এই ভদ্রলোক, এই লোকটা; ওর রুমাল থেকে সুগন্ধ, আর নিশ্বাস থেকে কড়া নেশার দুর্গন্ধ ভুরভুর করে উড়ছে; এই বাড়িকে নরকের একটা বাড়ি বলে মনে করে ভিতরে ঢুকে পড়েছে ভদ্রলোকের মত দেখতে ঐ লোকটা।

বড় রাস্তা থেকে বের হয়ে একটা ছোট রাস্তা সোজা বেশ কিছুদূর এসে এখানে সরু হয়ে আর এঁকেবেঁকে এদিক-ওদিক চলে গিয়েছে। ঠিক এখানেই এসে ভদ্রপাড়াটা শেষ হয়েছে, আর শুরু হয়েছে অভদ্র পাড়াটা। মানসীদের বাড়ি, তার পর থেকেই সরু পথের শুরু, মাঝে শুধু ছোট একটা

পানের দোকান। সেই সরু পথের দু ধারে বড় বড় বাড়ির যত ফরাস-পাতা আর তাকিয়া-গড়ানো ঘরে লম্পটের ফুর্তি বাসা বেঁধে জীবন যাপন করে। ঠোঁটে রং মেখে আর বাহারে সাজ সেজে প্রতি ঘরের দরজা ও জানালার কাছে দাঁড়িয়ে যাদের চোখ পথের দিকে তাকিয়ে ওত পেতে থাকে, তাদের ছায়া মানসীদের এই বাড়ির দেয়ালের গা ছুঁয়েই ফেলত যদি মাঝখানে ঐ পানের দোকানটা না থাকত।

মানসীদের বাড়ির ছাদের উপর দাঁড়ালে সরু পথের ঐ পৃথিবীর রহস্য-গুলিকে যেমন চোখে দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি শুনতেও পাওয়া যায়। ফুলের ফেরিওয়ালা চাঁপার তোড়া আর বেল-জুঁইয়ের মালা হেঁকে বেড়ায়। ব্যস্তভাবে রিকশা ছুটে যায়, আরোহীর মুণ্ডু নেশার ঝোঁকে কাত হয়ে দোলে আর কাঁপে। এখানে-ওখানে, রকের কোণে বসে আর ল্যাম্প-পোস্টের পাশে দাঁড়িয়ে দালালেরা বিড়ি টানে। কখনও ঘুঙুরের ঝনন্ ঝনন্ আবার কখনও বা মাতালের চিৎকার এই রাস্তার আলো আঁধার আর ধোঁয়া-ভরা বাতাসের বুকে আচমকা বেজে ওঠে। যেমন নিত্য রাতের আকাশে তারা দেখতে হয়, নিত্য ভোরে পাখির ডাক শুনতে হয়, তেমনি সরু পথের এইসব রূপ আর শব্দকে নিত্য দেখে আসছে আর শুনে আসছে মানসী। চোখ-সহা আর কান-সহা হয়ে গিয়েছে।

হ্যাঁ, পানের দোকানের কাছে শিয়ালের মত চোখ করে ঐ যে দালালের দল বসে আছে, তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেই ভুল করত না এই লোকটা। ওরাই বলে দিত, খুব সাবধান বাবুমশাই, ওটা হল প্রাইভেট বাড়ি, ওখানে ভদ্রলোক থাকে। অনেকেই বাড়িটার মনুষ্যত্ব অনুমান করে নিতে পারে না বলেই ত এই ভুল করে, এবং তারপর সেই সব ভয়ানক কাণ্ড হয়।

কিন্তু মানসীর মুখ দেখেও কি মানসীর মনুষ্যত্বটা ওরা অনুমান করতে পারে না? পারে না নিশ্চয়। ওদের চোখের এই ভুলে মানসীর মনের গায়েও জ্বালা জ্বলেছে অনেক। কিন্তু আর বোধহয় জ্বলে না। গা-সহা হয়ে গিয়েছে। হয় ওদের চোখে ভুল আছে, নয় মানসীর মুখে ভুল আছে।

এই বাড়ি হল সেই ভয়ানক গম্ভীর ভানু মিত্রের বাড়ী; মানসীর বড়দাদা ভানু মিত্র। তিনি আছেন বলেই বোধহয় ঐ অভদ্র সরু-রাস্তার কোন পাপের আহ্লাদ এই ভদ্রপাড়ার পথে এসে উঁকিঝুঁকি দিয়ে ঘুরে বেড়াবার সাহস পায় না। যা-কিছু ভুল আর যা-কিছু গণ্ডগোল, তার সবই এই বাড়ি

পর্যন্ত এসে আর এগুতে পারে না। ভানু মিত্রের ভয়ানক শাসন লোহার রডের মার মেরে সব ভুল শায়েস্তা করে দেয়। ভুলগুলি হাত জোড় করে, ভানু মিত্রের পা জড়িয়ে ধরে, মাপ চেয়ে আর নাক-মুখের রক্ত মুছতে মুছতে ছুটে পালিয়ে যায়।

দেখলে মনে হবে, বাড়িটা যেন এককালের বেশ বড় বনেদিপনার ছোট এক ফালি অবশেষ। পুরনো বনেদিপনার একটা চুনখসা ফ্যাকাশে স্মৃতির মত দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা, ভোঁতা কানিশ আর মোটা একটা থাম। থামটার গায়ে অজস্র সিন্দুর হলুদ আর চন্দনের, এবং গোবরেরও ছোট ছোট ধেবড়ানো ফোঁটার দাগ শুকিয়ে লেগে আছে। সকালবেলা গঙ্গাস্নান সেরে এসে ভেজা কাপড়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকবার আগেই এই থামের গায়ে তিলক-কাটা কপাল ঠেকিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন ভানু মিত্র।

এই থামের গায়ে হাত রেখে বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে পাড়ার প্রতিবেশী ভদ্রলোকদের নানা রকম উপদেশ শুনিয়ে দেন ভানু মিত্র। "আপনারা কী মনে করেন জানি না, কিন্তু আমি মনে করি, মানুষের সব চেয়ে বড় সম্পত্তি হল ক্যারেকটার অর্থাৎ চরিত্তির।"

"তা ত বটেই।" শ্রোতারা সকলেই স্বীকার করেন। শুধু কালাচাঁদবাবু নামে ঐ ভদ্রলোক, যার গায়ের জামাটাতে একটাও বোতাম নেই, তিনিই শুধু হাঁ করে কী-রকম যেন গবেটের মত তাকিয়ে বলেন, "তাই বলুন! আমার ধারণা ছিল, সম্পত্তিই হল মানুষের সব চেয়ে বড় ক্যারেকটার, অর্থাৎ চরিত্তির।"

বয়স হয়েছে ভানু মিত্রের, মাথার চুল যতখানি সাদা, ততখানি কাঁচা। পঞ্চান্ন বছর বয়সে যতখানি গম্ভীর হওয়া উচিত, তার চেয়ে অনেক বেশী গম্ভীর। ঘরে যতক্ষণ থাকেন, ততক্ষণ আদুড় গা। হাটে-বাজারে আর বেড়াতে যাবার সময় চীনে কোট। চাকরি-বাকরি করতে লজ্জা পান, করেন না। তিনপুরুষের সেই বনেদী সম্মানের ধারা ভানু মিত্রও নষ্ট করে দিতে পারেননি। কিছু টাকাপয়সা আছে নিশ্চয়, কিন্তু তেমন কিছু নয় বোধহয়, নইলে এতদিনে একমাত্র বোন মানসীর বিয়েটাও চুকিয়ে দিতে পারতেন। বয়স ত কম নয় মানসীর। পাড়ার মেয়েরা জানে, এবং আত্মীয়-কুটুম্বরাও বলে, মানসীর বয়স ত্রিশ পার হয়ে একত্রিশে পড়েছে, কিংবা আরও একটু বেশী হতে পারে, কম ত নয়ই।

কিন্তু মানসীর বিয়ের জন্য চেষ্টার দিক দিয়ে কোন ফাঁকি রেখেছেন, আর কোন ক্রুটি করেছেন, এই নিন্দা ভানু মিত্রের শত্রু কালাচাঁদবাবুও করেন না। বরং, খুব বেশী চেষ্টা করেন বলেই ত নীচের ঐ ঘরটিকে একটু সাজিয়ে রাখতে হয়, ফরাস পাততে হয়, আর মানসীকেও প্রায়ই এই ঘরের ভিতর এসে এসরাজ বাজাতে হয়। পাত্রপক্ষ পাত্রী দেখতে আসেন। খড়দহ থেকে যারা মানসীকে দেখতে এসেছিল, তারা এই ত কিছুক্ষণ আগে চলে গেল।

মাসের মধ্যে দুটি সপ্তাহ বাদ যায় কিনা সন্দেহ, পাত্রপক্ষের চোখের সামনে এসে মানসীকে দাঁড়াতে না হয়। যতদূর পারা যায়, স্নো আর পাউডারে মুখটাকে ঘষে মেজে ঝকঝকে করে, সবচেয়ে বেশী জমজমাট রংএর জামদানী শাড়ি অনেক কায়দা করে গায়ে জড়িয়ে পাত্রপক্ষের চোখের সামনে বসেও থাকতে হয়। সেই সব চোখের মধ্যে স্বয়ং পাত্রেরও চোখ জ্বল জ্বল করে। মানসীর চেহারাটাকে পছন্দ করে ফেলতে কারও চোখে একটুও দেরী হয় না। শুধু এসরাজ বাজিয়ে রেহাই পায় না মানসী, গানও গাইতে হয়। হাতের কাছে হারমোনিয়ম টেনে নেয়। চা খান আর পান চিবোন পাত্রপক্ষের ভদ্রলোকেরা; সিগারেটের ধোঁয়াও ওড়ে। ঠোঁটে হাসি, চোখে খুশি, মুখে নানা ফরমাইশ—কীর্তনটা থাক, এইবার একটা আধুনিক গাও শুনি।

কখন আধ-ঘণ্টা, এবং কখন বা দেড়-ঘণ্টা ধরে এইরকমই একটা সুন্দর মুখ দেখার আনন্দের কাছে বসে পাত্র আর পাত্রপক্ষ বিদায় নেন। এবং তার ক'দিন পরেই গম্ভীর ভানু মিত্রের মুখে সেই একই কথা ঘড়ঘড় করে বাজে। "না, হল না, দরে পোষাল না। বড় বেশী দাবি।"

আর, মাসের মধ্যে তিনটে সপ্তাহও যায় কিনা সন্দেহ, এই বাড়ির জানালার পর্দায় আর এক রকমের পছন্দের ছায়া উঁকিঝুঁকি দিয়ে উসখুস না করে গিয়েছে। চীনে কোট গায়ে ভানু মিত্রের শক্ত পাথরের মত মূর্তিটা ঐ মোটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে বাঘের মত গর্জে উঠেছে "সাবধান। এটা ভদ্রলোকের বাড়ি রে হতভাগা।"

তা ছাড়া, মাঝে মাঝে এই লোকটারই মত ভুল করে কোন হতভাগা সদর খোলা পেয়ে ভিতরে ঢুকে পড়েছে। দেখেই আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠেছে মানসী, আর ভানু মিত্রও সঙ্গে সঙ্গে উপরতলার ঘরের ভিতর থেকে আস্তে আস্তে নীচে নেমে এসেছেন। হাতে মোটা লোহার রড।

কোন চঞ্চলতা নেই, একেবারে শান্ত কঠোর ও গম্ভীর ভানুমিত্র সদরের দরজায় দাঁড়িয়ে, পাশের বাড়ির জানালার দিকে তাকিয়ে খুব আস্তে চাপা-স্বরে বলেন, "বটকেষ্ট আছ না কি ?"

"হ্যাঁ, জ্যাঠামশাই।"

"শয়তান ঢুকেছে, লোক ডাকতে হয়।"

বাস্, তারপর একটি মিনিটও দেরি হয়নি। মানসীর মুখের দিকে তাকিয়ে শয়তানের মাতাল মুখের হাসি যখন আরও টলমল করে ওঠে, ঠিক তখনই পিছন থেকে শয়তানের ঘাড়ের উপর আছড়ে পড়ে সোডার বোতলের প্রচণ্ড এক বাড়ি। রোগা আর ষণ্ডা চেহারার ছোট একটা ভিড় ছুটে এসে শয়তানকে ঘিরে ধরে। কারও হাতে হকি স্টিক, কারও হাতে চাবুকও থাকে।

ভানু মিত্র শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আস্তে আর একবার হাঁক দেন, "মেরে বেঁহুশ করে দাও, তাহলেই হুঁশ হবে।"

তারপর, চড় ঘুষি লাথি চাবুক আর হকি স্টিকের একটা আক্রোশ যেন উৎসবে মেতে ওঠে। হঠাৎ ভয়ে আধমরা, আর মার খেয়ে আরও ভীত সেই শয়তানের আর্ত মুখটা ভুল বকতে পেরে চেঁচিয়ে ওঠে "মাপ করুন মশাই, ছেড়ে দিন দাদা! ওঃ, দিব্যি করছি স্যার! এই ভুল আর কখনও হবে না।"

"কেন এমন ভুল হয় ? দেখতে পাওনা কেন যে, এই পানের দোকানের পর থেকে শয়তানদের ঐ নরকপাড়া শুরু ?" গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করেন ভানু মিত্র।

ভানু মিত্রের পা জড়িয়ে ধরবার জন্য ঝুঁকে পড়ে আর হাত বাড়ায় শয়তান। ভানু মিত্র শান্তভাবে শেষ নির্দেশ উচ্চারণ করেন, "এইবার বের করে দাও।"

উপরের ঘরে উঠে যাবার আগে ভানু মিত্র যেন নিজের মনে তাঁর জীবনের সবচেয়ে কঠিন একটি বিশ্বাসের মন্ত্র আস্তে আস্তে বলেন "চরিত্তির যার নেই, তার মরে যাওয়া ভাল, তাকে মেরে ফেলাও ভাল।"

আজ দশ বছর ধরে এই একই কথা শুনে আসছে মানসী। খুব সত্যি কথা, ভানু মিত্রের এই বিশ্বাসের মধ্যে কোন ফাঁকি নেই। এই জন্যেই ত মানসীর ভয়। আজ এই মুহূর্তে সোনার ফ্রেমের চশমা-পরা ঐ লোকটির

মুখের দিকে তাকিয়ে এই ভয়েই মানসীর বুক কাঁপছে। এখনি একবার চেঁচিয়ে উঠতে হবে, এবং সেই মুহূর্তে নেমে আসবেন বড়দা, হাতে লোহার রড। তারপর…।

হঠাৎ যেন মানসীর ভয়ের কাঁপুনিটাই একটু মৃদু হয়ে যায়। বড়দা এখন বাড়িতে নেই, হরি সভায় গান শুনতে গিয়েছেন।

লোকটা বলে, "গান-টান ভাল আসে ত, না শুধু লোক টানবার জন্যে মিছিমিছি হাতের কাছে একটা এসরাজ গড়িয়ে রেখেছ?"

"আপনি চলে যান।" চেঁচিয়ে ওঠে মানসী।

"তার মানে? কারও বাঁধা হয়ে আছ নাকি? না, কারও কাছ থেকে বায়না নিয়ে রিজার্ভ হয়ে আছ?"

মানসী বলে, "আপনি খুব ভুল করেছেন, ভুল করে ভয়ানক অন্যায় করেছেন; এটা ভদ্রলোকের বাড়ি।"

"অ্যাঁ? চমকে ওঠে লোকটা। একটা লাফ দিয়ে দু পা পিছনে সরে যায়। রুমাল দিয়ে চোখ মোছে আর বিড় বিড় করে, "তাই ত, ছিঃ, একি কাণ্ড হল? সত্যিই ভুল হয়েছে, ভয়ানক অন্যায় হয়ে গিয়েছে। আপনি মাপ করুন। আমি এখনি চলে যাচ্ছি।"

চলে যেতে থাকে লোকটা। ঘরের দরজা থেকে সরে গিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে সরু বারান্দার উপর দিয়ে সদরের দরজার দিকে চলে যায়। হঠাৎ চেঁচিয়ে কর্কশ স্বরে ডাক দেয় মানসী, "শুনছেন?"

থমকে দাঁড়ায় লোকটা, পিছন ফিরে তাকায়। মানসী বলে, "এই যে আপনার কী-সব যাচ্ছেতাই জিনিষ এখানে পড়ে রয়েছে, তুলে নিয়ে যান।"

সেণ্ট-মাখা রুমালটা, আর একটা চাঁপার তোড়া পড়ে আছে ঘরের দরজার চৌকাঠের কাছে। নেশাড়ে লম্পটের শিথিল হাত থেকে ফসকে পড়ে গিয়েছে কতগুলি আবর্জনা।

লোকটা বলে, "লাথি মেরে সরিয়ে দিন। এমন কিছু দামী জিনিষ নয় যে, তুলে নিয়ে যেতে হবে।"

আরও জোরে চেঁচিয়ে ওঠে মানসী, "না, পারব না। পা দিয়ে ছুঁতেও ঘেন্না করে। এখ্খুনি তুলে নিয়ে যান।"

ফিরে আসে লোকটা। আর সেই দুই নোংরা আবর্জনা, একটা সেণ্ট-মাখা রুমাল আর একটা চাঁপার তোড়া তুলে নিয়ে পকেটে রাখে।

আবার ব্যস্তভাবে চলেই যাচ্ছিল লোকটা, কিন্তু ভানু মিত্রের বোনের মনটাও যেন হঠাৎ কঠোর হয়ে লোহার রডের মত দুলে ওঠে। "খুব বেঁচে গেলেন আপনি।"

"তার মানে?"

"তার মানে, এই ভদ্রপাড়ার ভিড়ের হাতে পড়লে যে হাত-পা ধরে মাপ না চাওয়া পর্যন্ত রেহাই পাবেন না।"

লোকটা গম্ভীর স্বরে বলে, "আমি কারও কাছে মাপ চাই না। জীবনে শুধু এই একবার মাপ চেয়েছি, আপনার কাছে।"

মানসীর রুক্ষ গলার স্বরও হঠাৎ যেন বড় বেশী নরম হয়ে যায়। "আমি না হয় মনে মনে মাপ করে দিলাম, কিন্তু ধরতে পারলে এই ভদ্রপাড়ার ভিড় যে আপনাকে মেরেই ফেলবে।"

"মরে যাবার আগে আমিও যে কয়েকটাকে মেরে রেখে যাব।"

সাংঘাতিক, কী কড়া মেজাজ। জীবনের এই দশার জন্য একটুও লজ্জা নেই; ভয়ানক এক অহংকারের সাপের মত ফোঁস করে ফণা তুলেছে লোকটা। কী আশ্চর্য, লোকটা যেন এই ভদ্র পাড়ার যত ঘেন্না রাগ আর আক্রোশগুলিকে তুচ্ছ করার জন্য শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মানসীর গলার স্বর হঠাৎ ভীরু হয়ে যায়, "আপনাকে অপমান করার জন্য আমি এ-সব কথা বলছি না। আপনার ভালর জন্যই বলছি।"

লোকটা আশ্চর্য হয়ে যায়, "আমার ভাল?"

অজানা অচেনা একটা লোক, ঐ সরু রাস্তার যত ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে যে-লোকটা যতসব পাপের রং-মাখান ঠোঁটের হাসির সঙ্গে ফুর্তির দাম দরাদরি করে, বেহায়া গলার গান আর মাতাল পায়ের ঘুঙুরের শব্দ শোনে, সেই লোকটার জীবনের ভালর জন্য এ কেমন মায়ামাখান কথা হঠাৎ বলে ফেলেছে মানসী।

লোকটাও এইবার যেন মানসীর মুখের একটা কথা শোনবার লোভে লোভী হয়ে আস্তে আস্তে বলে, "আপনি যেন কী একটা কথা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন!"

"হ্যাঁ, বলছিলাম...।" বলতে গিয়েই থামে, তারপর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মানসী বলে, "ঐ বাজে রাস্তায় আর যাবেন না।"

আগেই মুখ ফিরিয়েছিল মানসী, এইবার কথাটা বলে ফেলেই চোখ

বন্ধ করে। নিথর হয়ে শুধু দেওয়াল-ঘড়ির টিক-টিক শব্দ শোনে। সামান্য একটা অনুরোধের কথা লজ্জার মাথা খেয়ে বলে দিতে পেরেছে মানসী। এইবার চলে যাক লোকটা। যেন আর কোন প্রশ্ন না করে; মচমচ জুতোর শব্দ সদরের দরজা পার হয়ে বাইরের পৃথিবীর ঐ হৈ-হৈ রৈ-রৈ শব্দের মধ্যে মিলিয়ে যাক। হাঁপ ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে সদরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে আসবে মানসী।

কিন্তু কোনও শব্দ হয় না। বুঝতে পারে মানসী, এখনও দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। বোধ হয় সেইরকমই বেহায়ার মত আবার দু চোখ অপলক করে মানসীর খোঁপার প্রজাপতি দেখছে। কি বিশ্রী অস্বস্তি! মানসীর সারা শরীরটা শিউরে উঠতে থাকে।

"আপনি ভাল কথাই বলেছেন। দেখি, আপনার কথা যদি রাখতে পারি।"

কেউ যেন অনেক দূরে স্বপ্নের ঘোরে বিড়বিড় করে কথা বলছে। লোকটা চলে যাচ্ছে বোধ হয়। মুখ ফিরিয়ে তাকায় মানসী, দেখতে পায়, লোকটাই মুখ ফিরিয়ে সদরের দরজার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই শক্ত আর অহংকেরে চেহারাটা যেন হঠাৎ দুর্বল হয়ে নেতিয়ে পড়েছে। দেয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে রুমাল দিয়ে চোখ-মুখ মুছছে লোকটা।

বোধ হয় এতক্ষণে লুকিয়ে দেখার একটা সুযোগ হয় বলেই বেশ ভাল করে লোকটাকে দেখতে পায় মানসী। রাশভারী শক্ত চেহারার মানুষ না ছাই। নিতান্তই একটা ছেলে-মানুষের অভিমানী চেহারা যেন ক্লান্ত হয়ে, কে জানে এই পৃথিবীর কার উপর রাগ করে দাঁড়িয়ে আছে।

মুখের কাছে শাড়ির আঁচল টেনে এনে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে মানসী; আনমনার মত অপলক চোখ নিয়ে দেখতে থাকে, বেশ ত সুন্দর আর দিব্যি শান্ত একটা কাঁচা মুখ। মানুষটার নিজের বাড়িতে ত এই রকমই ক্লান্ত হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, লোহার রড নিয়ে কেউ ওকে মেরে ফেলতে ছুটে আসে না।

চাঁপা ফুলের গন্ধ বাতাসে ভুরভুর করে। নাকে কাপড় চেপে সরে যেতে ভুলে গিয়েছে মানসী। ঐ অজানা অচেনা মানুষটার বোধ হয় খুব কষ্ট হচ্ছে, হেঁটে যেতে পারবে কিনা সন্দেহ। মানসী বলে, "আর সময় নষ্ট করবেন না, বাইরে গিয়ে একটা রিকশা করে বাড়ি চলে যান।"

লোকটা মুখ ফিরিয়ে তাকায়। "আপনি আমাকে আশ্চর্য করলেন।"

"কিসের আশ্চর্য?" ইচ্ছা করে নয়, চেষ্টাও করেনি মানসী, প্রশ্নটা যেন মানসীর মুখ থেকে নিজের আবেগে ছুটে বের হয়ে গিয়েছে।

লোকটার চোখ দুটোও বোধ হয় এই কঠিন প্রশ্নের চমক সহ্য করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারে না। এই প্রশ্নের কত রকমই ত উত্তর হতে পারে, কে জানে কোনটা সত্য। মানসীর মুখের দিকে আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছা করে; মানসীকে আরও কয়েকটা কথা বলতে মনটা আকুল হয়ে ওঠে; নিজের জীবনের একটা রাক্ষুসে পরিচয়কে মানসীর চোখের কাছে ধরা পড়িয়ে দিয়েছে, তবু মানসী তারই জীবনের ভালর জন্য ভেবে ফেলেছে; তাই আশ্চর্য হয়েছে মানুষটা। এর মধ্যে কোনটা সত্য, একবার মুখ ফুটে বলে দিলেই ত মানসীর জীবন একটা গব পেয়ে যায়।

কী যেন ভাবছে লোকটা। লোকটার মনের ভাবনাগুলি বোধ হয় আবার ভুল করে একটা ভিন-জগতের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়েছে। ভয় পেয়েছে বোধ হয়; চলে যাবার জন্য উসখুস করছে লোকটার পা দুটো। মনে হয় মানসীর, এইবার সত্যই আতঙ্কিতের মত থরথর করে উঠেছে ভদ্র-লোকের ঐ ক্লান্ত ও উদাস মুখটা।

মানসী বলে, "আপনি মিথ্যে সন্দেহ করছেন, আমি আপনার কোন ক্ষতি করব না।"

"কেন বলুন ত? কেন ক্ষতি করবেন না? আমি ত আপনাকেই অপমান করেছি।" লোকটার কথাগুলো যেন একটা জ্বালার ছোঁয়া লেগে ছটফট করছে।

হেসে ফেলে মানসী, "সে ত ভুল করে, ইচ্ছে করে ত নয়।"

"আপনি সত্যিই সেটা বিশ্বাস করেছেন?"

"করেছি।"

"তাহলে আমার আর কোন দুঃখ নেই।"

বলতে বলতে লোকটাও হেসে ফেলে। যেন এতক্ষণ ধরে বুকের ভিতর কতগুলি কালো ধোঁয়া জমাট হয়েছিল, মানসীর হাসির এক ছোঁয়াতেই সেই জমাট ধোঁয়া ভেঙে গুঁড়ো হয়ে নিঃশ্বাসের বাতাসের সঙ্গে বের হয়ে গিয়েছে। স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে ভদ্রলোকের মুখ, হাসিটাও ঐ মুখে কী সুন্দর মানিয়েছে।

ভদ্রলোকের চোখের দৃষ্টিটাও হঠাৎ যেন চাঁপার গন্ধের মত ফুরফুর করে

উড়তে শুরু করেছে। দেখতে থাকে মানসী, ভদ্রলোক চঞ্চল হয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন; এই বাড়িটার পুরনো ইট-কাঠের রূপ দেখে কী-যেন ভাবছেন। ব্যাধের ফাঁদের মত যে-বাড়িটা এই সরু পথের মুখে দাঁড়িয়ে থাকে আর যত ভুলের জানোয়ারকে বাগে পেলেই ঘায়েল করে, সেই বাড়িটাই ভদ্রলোককে কী সুন্দর নির্ভয়ের উপহার দিয়ে নিশ্চিন্ত করে দিয়েছে। বোধ হয় এই বিস্ময় সহ্য করছেন ভদ্রলোক। যেন কতকাল এই বাড়িতে আসা-যাওয়া আছে, স্বচ্ছন্দে হেঁটে হেঁটে বারান্দার উপর পায়চারি করছেন।

লোকটা হাসতে হাসতে বলে, "কী অদ্ভুত ব্যাপার। ধরুন, এই আমিই যদি সকাল বেলা আপনার বাড়ির কারুর সঙ্গে দেখা করতে আসতাম, তবে এই আপনিই আমাকে অনায়াসে বসতে বলতেন, এমন কি এক গেলাস জলও খেতে দিতেন।"

ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠে মানসী, "জল খাবেন?"

লোকটা বলে, "দিন, জল খেয়ে আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে চলে যাই।"

ঘরের ভিতর থেকে গেলাসে করে জল আনে মানসী, দরজার কাছে দাঁড়ায়। আর দরজার চৌকাঠের ওপারে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে জলের গেলাস হাতে তুলে নেয় লোকটা। মানসীও অনায়াসে একটা অচেনা মানুষের বে-আইনী পিপাসাকে শান্ত করার জন্য তার হাতে জলের গেলাস তুলে দিতে পারে।

জল খেয়েই হাঁপ ছাড়ে লোকটা, "এই ভাল।"

"কী?"

"এই যে আমি আপনার ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে জল খেলাম, আর আপনি দরজার ওপার থেকে জল দিলেন। এই যথেষ্ট।"

গম্ভীর হয় মানসী, "আপনাকে ঘরের ভিতরে এসে জল খেতে বলব, এত সাহস আমার নেই।"

কোন উত্তর দেয় না। চুপ করে দাঁড়িয়ে মানসীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে লোকটা। ওর চোখ দুটো যেন নতুন পিপাসায় আর্ত হয়ে মানসীর মুখের দিকে তাকিয়ে জীবনের শান্তিজল খুঁজছে। মাথা হেঁট করে মুখ নামিয়ে নেয় মানসী। লোকটা বলে, "সে সাহস থাকলেও আপনার কোন ক্ষতি হত না।"

মানসীর গলার স্বর জলে ওঠে, "এ কী বলছেন আপনি? ন্যায় অন্যায়ের মধ্যে কোন তফাত নেই?"

"আছে, তফাত হল একটি চৌকাঠ।"

হেসে ফেলে মানসীর গম্ভীর মুখ। অচেনা মানুষটাও হাসে।

"যাই এবার।" কিন্তু যাই-যাই করে লোকটা যায় না। 'চলে যান এবার', মানসীও এই ছোট একটা কথা মুখ খুলে বলে দিতে পারে না। এই ঘরের অন্তরাত্মাটাই যেন ক্ষণস্বপ্নের ছলনায় ভুলে গিয়েছে যে, হরিসভার গান শুনে সেই ভয়ানক ভানু মিত্রের এখন বাড়ি ফিরে আসার সময় হয়েছে।

"তার চেয়ে বরং বলুন, আমার ও আপনার মধ্যে অনেক তফাত।" হঠাৎ বলে ওঠে লোকটা, আর বলতে গিয়ে চোখের দুকোণে যেন একটা খোঁচা-লাগা আঘাতের ছায়া জলো হয়ে ওঠে।

"কোন তফাত নেই।" উত্তর দিতে গিয়ে মানসীও অদ্ভুতভাবে চেঁচিয়ে ওঠে, যেন এই ঘরের দশ বছরের ইতিহাস ভয়ানক একটা ঘৃণা হয়ে মানসীর বুকের ভিতর শিউরে উঠেছে।

"আমি বাজে লোক, ঐ সরু পথের ঘরে ঘরে গিয়ে গান শুনি।"

"আমি বাজে মেয়ে, আমার ঘরে লোকের পর লোক এসে গান শুনে যায়।"

"কখ্‌খনো না, হতে পারে না। আমাকে এই ভয়ানক মিথ্যা বিশ্বাস করতে বলবেন না।" চেঁচিয়ে ওঠে লোকটা। লোকটার মেজাজ যেন হঠাৎ আবার পাগল হয়ে গিয়েছে।

মানসীর চোখ দুটোও যেন এক অদ্ভুত বিস্ময়ের মায়ায় ছলছল করে ওঠে। "এ কী করছেন আপনি?"

"হ্যাঁ, আমি যা বিশ্বাস করেছি, তাই বিশ্বাস করতে দাও। যদি ভুল বুঝে থাকি, তবে ভুল বুঝেই চলে যেতে দাও। দয়া করে বরং একটা মিথ্যে কথা বল লক্ষ্মীটি, কোন সত্যি কথা বলে আমার ভুল ভেঙে দিও না।"

"কী বিশ্বাস করেছেন আপনি?"

"তুমি আমাকে ঘেন্না করনি, বরং আমাকে...।"

সদর দরজার কাছে খটখট খড়মের শব্দ, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে সেই শব্দ।

"সর্বনাশ!" আঁচল তুলে চোখ ঢাকে মানসী, "আমি ভুল করে আপনার

সর্বনাশ করলাম।" মানসীর বুকের ভিতর থেকে যেন একটা রক্তমাখা ভয়ের শিহর পাঁজর ছিঁড়ে ঠেলে উঠতে থাকে।

"অ্যাঁ? কে? এ কে রে মানসী?" কাছেই এসে থমকে দাঁড়ান, আর অচেনা লোকটার মুখের দিকে তাঁর গম্ভীর মুখের ঘৃণা ও বাঘা চোখের আক্রোশ হানতে থাকেন ভয়ানক ভানু মিত্র।

লোকটা যে সত্যিই কেউ নয়। কী উত্তর দেবে মানসী? উত্তর নেই। উত্তর হয় না, কিন্তু উত্তর দিতে এক মুহূর্তও দেরি করলে চলবে না। দেরি করা সাজে না। তাহলে এই ভদ্রপাড়ার সব মনুষ্যত্বই যে ঘৃণায় শিউরে উঠবে আর পানের দোকানের পাশ থেকে দালালেরা ছুটে এসে হেসে ফেলবে। চিৎকার করে উঠবে পৃথিবীটা, ভানু মিত্রের বোন ঘরে লোক ঢুকিয়েছে। খিল-খিল করে হেসে উঠবে ঐ সরু রাস্তার দুধারে ঠোঁট-রাঙানো যত পয়সার দাসী ফূর্তিবিহারিণীর দল। ঘরে বাবু বসিয়েছে ভানু মিত্রের বোন।

মানসী বলে, "জানি না।"

ছোট্ট একটা কথা, সত্য কথা, কিন্তু কী দুঃসহ সত্য কথা! দম বন্ধ করে কথাটা বলতে গিয়েই মানসীর চোখের কোণে ছলাক করে ওঠে বিচিত্র এক বেদনার জল।

"তাই বল।" দাঁতে দাঁত চাপেন ভানু মিত্র। তারপরেই এগিয়ে গিয়ে সিঁড়ি-কোঠার অন্ধকারের ভিতরে ঢুকে আবার বের হয়ে এলেন। হাতে লোহার রড।

সত্যি কথাই বলেছিল মানসী। লোকটা নির্বিকার। ভানু মিত্রের লোহার রডের দিকে যেন ভ্রূক্ষেপও করতে চায় না। লোকটা কি সত্যিই এই ভদ্র পৃথিবীর যত শাস্তি, গর্জন, মার আর আক্রোশের সঙ্গে মারামারি করে মরে যাবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হয়ে আছে? কিন্তু মরে যাবার আগে, কিংবা রক্তমাখা মাথা আর নাকমুখ নিয়ে চলে যাবার আগে, অথবা পুলিশের হাতে চালান হবার আগে জেনে যেতে পারবে না লোকটা, ভানু মিত্রের বোন তার জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য কথাটাকে মুখ খুলে বলতে গিয়েও বলতে পারল না। জানি না নয়; জেনেছে মানসী; এই লোকটাকেই চাঁপা ফুলের গন্ধে বিভোর একটা সুস্বপ্নের মত মনে-প্রাণে ভাল লেগেছে মানসীর।

লোকটাও যেন এই জগতের সব ভয় ভুলে গিয়ে মানসীর অদ্ভুত ও

অর্থহীন কান্নায় ভেজা চোখের দিকে তাকিয়ে একটা স্বপ্নের নেশায় বিভোর হয়ে রয়েছে। কিংবা সেই প্রশ্নটারই উত্তর খুঁজছে।

লোহার রড তুলেছেন ভানু মিত্র, "এটা যে ভদ্রলোকের বাড়ি, এই কাণ্ডজ্ঞান নেই কেন রে লম্পট?"

"বড়দা!" চেঁচিয়ে ওঠে মানসী।

ভানু মিত্র কটমট করে তাকান, "কি?"

"উনি ভুল বুঝেছেন, মাপ চেয়েছেন।"

"শিক্ষে হবার আগেই মাপ চায় কেন? খুব চালাক বলে মনে হচ্ছে যে"

"ছেড়ে দিন বড়দা।"

"তুই এখানে দাঁড়িয়ে অবলাপনা করিস না মানসী, ভেতরে যা। কিছু শিক্ষে না দিলে ওর আক্কেল হবে না"

লোহার রড ফেলে দিয়ে পায়ের খড়ম হাতে তুলে নেন ভানু মিত্র। মানসী ছুটে এসে হাত চেপে ধরে, "না।"

"কিসের না?"

মানসীকে আস্তে একটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন ভানু মিত্র, "না, বেটার কপালটাকে অন্তত একটু দাগিয়ে দিতে হবে, নইলে···।"

লোকটারই দিকে তীব্রভাবে তাকিয়ে মানসী চেঁচিয়ে ওঠে, "আঃ, দাঁড়িয়ে দেখছেন কী আপনি? চলে যেতে পারেন না? লজ্জা করে না আপনার?"

লোকটা নির্ভয় নির্লজ্জতার একটা পাথর যেন। নড়ে না, একটা কথাও বলে না। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যেন ভানু মিত্রের এই ভয়ানক হিংস্র আস্ফালনকে একটা তামাশা মনে করে শুধু চুপ হয়ে দেখছে। কিংবা ওর সেই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গিয়ে ধন্য হয়ে গিয়েছে।

দাঁত কড়মড় করেন ভানু মিত্র, "চ্যালেঞ্জ করে দাঁড়িয়ে আছে রাস্কেল, একটুও লজ্জা নেই, ভয় নেই।"

"কিসের ভয়?" এতক্ষণে আস্তে একটা কথা বলে লোকটা।

ভানু মিত্রের বাঘা-চোখ ধকধক করে, "প্রাণের ভয় নেই রে হতচ্ছাড়া।"

"না, সে-ভয় করি না।"

"ভেবেছিস আমি একা? এই ভদ্রপাড়ার সব লোক এসে যে তোকে ছিঁড়ে মেরে ফেলবে রে চরিত্তিরহীন কুকুর।"

"মরবার আগে আমিও দু চারটেকে মেরে ফেলব।"

"অ্যাঁ?" চমকে তিন পা পিছিয়ে যান ভয়ঙ্কর ভানু মিত্র, "এটা যে সত্যিই একটা বেপরোয়া খেপা কুকুর।"

"আপনিই বা কি কম খেপা?"

গর্জন করেন ভানু মিত্র, "আমার সঙ্গে তোমার তুলনা? কিসে আর কিসে? তুমি মদ খেয়েছ, আমি মদ খাই না। তোমার আর আমার মধ্যে তফাৎ নেই?"

"আছে।"

"কিসের তফাৎ সে-জ্ঞান আছে কি?"

"আছে। শুধু একটা গেলাসের তফাৎ।"

চলে যেতে থাকে লোকটা। ভানু মিত্র হুঙ্কার ছাড়েন, "রসিকতা। আচ্ছা! এ-পথে আর একবার এস যেন, ধর্ম ও অধর্মের তফাতটা বুঝিয়ে দেব।"

লোকটা বলে, "খুব বুঝেছি। তফাৎ ঐ একটা খড়ম। আপনার হাতে আছে, আমার হাতে নেই।"

বলতে বলতে চলে গেল লোকটা। ভানু মিত্র আবার হুঙ্কার দেবার আগেই ছুটে গিয়ে সদরের দরজা বন্ধ করে দেয় মানসী।

লোকটা তাহলে কথা রেখেছে। মানসীর ছোট একটা অনুরোধের কথা। কত সন্ধ্যা পার হয়ে যায়, কত রাত গভীর হয়, এই পথের উপর দিয়ে কত রিকশায় চড়ে কত উল্লাসের চেহারা ছুটে চলে যায়, সরু রাস্তার দুই পাশে ঐ নেশা ফুর্তি ঘুঙুর আর মেয়েমানুষের শরীর নিয়ে দরাদরির এক রহস্যের দিকে। কিন্তু এই অফুরান লালসার মিছিলের মধ্যে সেই মানুষটাকে আজও দেখা গেল না। মানসীর কথা রেখেছে লোকটা, ভাবতে আশ্চর্য লাগে মানসীর।

পঞ্জিকা দেখে এক একটি সুদিনে আর শুভক্ষণে নূতন নূতন পাত্রপক্ষেরও মিছিল এসে যথারীতি মানসীর ঘরে এই ফরাশ-পাতা তক্তাপোষের উপর বসে। মানসীও যথারীতি সাজে, পাত্রের ও পাত্রপক্ষের চোখের সামনে বসে। তার পর গান গেয়ে চলে যায়।

শুধু যখন সন্ধ্যা পার হয়ে যায়, তখন এই বাইরের ঘরের ভিতরে ঢুকেই মানসীর মনটা একেবারে অভদ্র হয়ে যায়। আলো নিভিয়ে দেয় মানসী। জানালার পর্দা সরিয়ে দেয়। আর পথের ঐ সব অমানুষের মিছিলের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

মনের ভিতরে লুকিয়ে একটা আক্ষেপ যেন মানসীর জীবনটাকেই ঠাট্টা করতে থাকে। যে-মানুষটাকে ঐ পাপের পথ থেকে সরে যাবার জন্য গালভরা ভদ্র অনুরোধ শুনিয়েছিল, আজ সেই মানুষটাকেই ঐ পথের ভিড়ের মধ্যে দেখতে চাও কেন? দেখতে পেলে কি ঘেন্নায় শিউরে উঠবে না মন?

না, একটুও না। তবু ত তাকে দেখতে পাওয়া যাবে। মানসীর চোখের জ্বালাগুলিই যেন কটকট করে ঐ ঠাট্টার উত্তর দেয়। আরও শক্ত হয়ে জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে মানসী।

রাগ হয় লোকটার উপর। বেশ ত নিজে চট করে এই পথের ঘেন্না থেকে সরে গিয়ে ভাল হয়ে গেল, আর মানসীকে এই পথের ঘেন্নার মধ্যে নামিয়ে দিয়ে গেল। কী ভয়ানক, এ যে ঠিক সরু রাস্তার ঐ ওদেরই মত জীবন! একটা ভাল মানুষকে এই কুপথে দেখবার আশায় ধ্যান করছে মানসীর প্রাণ।

এই ঘরের ফরাশ তাকিয়া ছবি আর এসরাজও যে ঐ ওদেরই মত অভিশপ্ত জীবনের আসবাব। কিন্তু দশ বছর ধরে এই ঘর আর এই আসবাব মানসীর চেহারাটাকে পৃথিবীর চোখে পছন্দ করাতে চেষ্টা করেও পছন্দ করাতে পারিনি। পঞ্জিকা-দেখা শুভক্ষণের বাবুরাও ত মুখ দেখে মনুষ্যত্ব বুঝতে পারেন না।

ভানু মিত্রের বোনের জীবন ঘরের বার হয়েই গিয়েছে। তবে আর দেরি করে লাভ কী? কেরোসিন ঢেলে এই ঘরটাকে ভিজিয়ে দিয়ে তারপর হেসে হেসে আগুনের একটি ফুলকি ছেড়ে দিলে কেমন হয়? তারপর চুপ করে দাউ-দাউ আগুনের জ্বালার মধ্যে শুয়ে পড়লে কেমন হয়?

মাথাভরা জ্বালা নিয়ে ঘরের ভিতর থেকে ছুটে বের হয় মানসী। পাগল রোগীর মত মূর্তি নিয়ে সিঁড়ি ধরে উপরতলার দিকে দৌড়ে উঠতে থাকে। নিজেরই হাতের একটা সর্বনেশে প্রতিজ্ঞার কাছে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে মানসী।

বিশ্রী একটা শব্দ করে কেরোসিনের টিনটা মানসীর হাত ফসকে মেঝের উপর পড়ে গিয়ে আরও জোরে বিশ্রী শব্দ করে ওঠে।

চেঁচিয়ে ওঠেন ভানু মিত্র, "ঐ অন্ধকার ঘরের ভেতর কি করছিস মানসী ? শিগগির শুনে যা ! হো হো হো...তোর কপাল, তোর সৌভাগ্য রে মানসী ...হো হো হো...শুভ সংবাদ শুনে যা মানসী।"

বড়দা হাসছেন, বাড়িটা যেন প্রেতের হাসি হাসছে। শুভ সংবাদ এসেছে, কোন ভদ্রলোকের মনে হয় দয়া হয়েছে, পছন্দ হয়েছে, আর হয়ত টাকার দাবিও করেননি। কিন্তু এই দয়াকে যে ঘেন্না করতেই আজ ভাল লাগছে মানসীর। জানেন না বড়দা, পৃথিবীর কোন ভদ্রলোকের ডাক শোনবার জন্য মানসীর মনে আজ এক ফোঁটা আগ্রহও আর নেই।

বউদিও কলকল করে হেসে উঠেছেন, "শিগগির শুনে যাও, মানসী। এসে বরের ফটো দেখে যাও।"

বউদিও উঠে আসেন, আর মানসীকে হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে আলোর সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে একটা ফটো মানসীর হাতে গুঁজে দেন।"

"এ কার ফটো ?" থরথর করে কাঁপে মানসীর হাত।

ভানু মিত্র বললেন, "এ হল ভূপতিদার ছেলে রমেশ। ভূপতিদা হলেন, তোর বউদির শীতলমামার ভায়রা। শীতলমামার মেয়ে নীরজাদিকে তুই ত চিনিস মানসী।"

বউদি বললেন, "খুব চেনে মানসী। মানসীকে কত ভালবাসেন নীরজাদি।"

ভানু মিত্র বলেন, "ঐ নীরজাদি তোর ফটো চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, আমিও পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। পাত্র ফটো দেখেই পছন্দ করে ফেলেছে। কোন দাবি-দাওয়া নেই।"

বউদি হেসে হেসে দুলতে থাকেন, "মানসীর ফটোটিও বোধ হয় এখন বরের হাতে এই রকমই লজ্জায় কাঁপছে।"

ভানু মিত্র বলেন, "পাইকপাড়া গিয়ে স্বচক্ষে দেখে এসেছি। কী চমৎকার একখানা বাড়ি। ভূপতিদা ত এখন আর নেই। এক ছেলে রমেশই এখন সব সম্পত্তির মালিক। রমেশও কি কম চমৎকার ? যেমন সুন্দর চেহারাটি, তেমনই সুন্দর চারিত্তিরটি।"

বউদি কলকল করেন, "ফটো আর একটু ভাল করে দেখ মানসী, এমন চেহারা জীবনে দেখনি।"

"দেখেছি।" বলতে গিয়ে মানসীর গলার রুক্ষ স্বর যেন কটকট করে কাউকে ধিক্কার দিয়ে ওঠে।

চমকে ওঠেন ভান্থ মিত্র, "কী ? কী দেখেছিস ? কবে দেখেছিস ?"

মানসীর চোখ জ্বলে, "সেই বাজে লোকটা ঠিক এইরকম দেখতে।"

হো হো হো ! আরও জোরে হাসতে গিয়ে ভান্থ মিত্রের গলার ভিতরে হাসিটা আটক হয়ে ঘড়ঘড় করে। "হ্যাঁ, অনেকটা প্রায় সেইরকমই, হুবহু সেই বাজে লোকটারই মত চেহারা বটে। কিন্তু কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা করছিস মানসী ? স্বর্গে আর নরকে ?"

চেঁচিয়ে ওঠে মানসী, "কিন্তু তফাতটা কী ?"

চুপসে যায় ভান্থ মিত্রের বাঘা চোখ। "তফাতটা হল···মস্ত একটা তফাত এই যে··· ।"

বউদি বোধ হয় নিজের মনের আহ্লাদে বোকার মত হঠাৎ কলকলিয়ে ওঠেন, "তফাত হল একটি টোপর।"

ভান্থ মিত্রের মুখটা কুঁচকে যায়, টেনে টেনে হাসতে চেষ্টা করেন। আর মানসী চুপ করে দাঁড়িয়ে এক অবিশ্বাস্য বিস্ময়ের শিহরকে যেন দুটি শান্ত কালো চোখের নিবিড়তা দিয়ে বরণ করে নিয়ে মনে মনে ভাবে, এমন অসম্ভবও সম্ভব হয় ? মান্থষটা তাহলে এতদিন ধরে আড়ালে আড়ালে আরও ভয়ানক উঁকিঝুঁকি দিয়েছে। সব জেনেছে। মানসীর জীবনটাকে তুলে নিয়ে পালিয়ে যাবার জন্য সব ব্যবস্থা করে ফেলেছে।

ভান্থ মিত্র বলেন, "বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গিয়েছে। সতরই মাঘ, রাত নটা পঞ্চাশ।"

মানসীর খোঁপায় রুপোর প্রজাপতি যেন পাখা নেড়েছে। মানসীর সারা মুখ জুড়ে চমকে কেঁপে ওঠে অদ্ভুত একটা লালচে লাজুক আভা।

ভান্থ মিত্র বলেন, "বিয়ের সব খরচ পাত্রপক্ষ দিচ্ছে। আমি টাকা নিয়ে এসেছি।"

মানসীর চোখের কোণে ছলাক করে জেগে ওঠে আরও অদ্ভুত এক সজল বিস্ময়। লোকটা যে সত্যিই মানসীকে একেবারে মনে-প্রাণে কিনে নেবার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছে।

ভান্থ মিত্র বলেন, "তুই মিছিমিছি আর কোন সন্দেহ করিস না মানসী। এই মান্থষ সেই মান্থষ নয়, হতেই পারে না।"

"তা হলে এ বিয়ে হতে পারে না।" চেঁচিয়ে এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে মানসী।

"কেন কেন কেন?" বিড় বিড় করেন ভানু মিত্র, "পৃথিবীতে কি ঠিক একরকমের চেহারার দুজন মানুষ হয় না? কত হয়।"

মানসী বলে, "সেই জন্যই ত বলছি, এই বিয়ে হতে পারে না।"

ভানু মিত্রের লোহার রডের মত শক্ত চেহারা যেন হঠাৎ দুমড়ে গিয়ে কুঁজো হয়ে যায়। "এ আবার কেমন কথা হল!"

কোন উত্তর না দিয়ে ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে যায় মানসী। অদ্ভুত এক সন্দেহে পাগলের মত দুড়দাড় করে সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে যেতে থাকে।

"তোমার পাগল ননদের কাণ্ড দেখলে?" বলতে বলতে ব্যস্তভাবে নড়বড় করে উঠে দাঁড়ান ভানু মিত্র, "রাজি হতেই হবে, রাজি না করিয়ে ছাড়ছি না, এ যে আমার মানসম্মানের প্রশ্ন।"

"মানসী...মানসী!" চেঁচিয়ে ডাকতে ডাকতে সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে এসেই চমকে ওঠেন, থমকে দাঁড়ান ভানু মিত্র। বাইরের ফরাস-পাতা ঘরে আলো জ্বলছে। জ্বলুক। কিন্তু কার সঙ্গে কথা বলছে মানসী?

উঁকি দিতে গিয়েই পা টিপে টিপে পিছনে সরে আসেন ভানু মিত্র, এবং আস্তে আস্তে হেঁটে সদর দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে কতগুলি ছায়ার ভিড় দেখে আরও জোরে চমকে ওঠেন, "অ্যাঁ? আরে কী সৌভাগ্য! আসুন আসুন।"

"কী ব্যাপার মিত্তির মশাই? এদিকে ওদিকে কী রকমের একটা কথা শুনছি যে?"

ভানু মিত্র বলেন, "হেঁ হেঁ হেঁ...আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে ঠিকই শুনেছেন।"

"এই মাত্র আপনার ঐ ঘরের ভিতরে গিয়ে বাইরের কেউ যেন বসল মনে হচ্ছে।"

ভানু মিত্র উৎফুল্লস্বরে বলেন "পাত্র, পাত্র। পাইকপাড়ার ভূপতি ঘোষের ছেলে রমেশ। পাত্র নিজেই পাকা-দেখা দেখতে এসেছে।"

ভদ্রলোকদের বিস্মিত ভিড়টা চোখ বড় বড় করে চলে যাবার জন্য তৈরী হতেই ভানু মিত্র বলেন, "আপনারা কে কী মনে করেন জানি না, কিন্তু আমি মনে করি দাশুবাবু, চরিত্তিরই হল মানুষের সব চেয়ে বড় সম্পত্তি। সৎপথে

থাকলে জীবনে একটা অদ্ভুত শক্তি এসে যায় কালীবাবু, কারও কাছে মাথা নিচু করতে হয় না। মাধাইবাবু নিশ্চয় স্বীকার করেন যে, মানসম্মান বজায় রেখে চলাই হল জীবনের আনন্দ। কিন্তু অনেকেই বুঝতে বড় ভুল করে কালাচাঁদবাবু, আপনি বোধহয় আজও বুঝতে পারেন নি যে, পাপ আর পুণ্যের মধ্যে ঠিক তফাতটা কী?"

কালাচাঁদবাবু হাঁ করে তাকান।—"ঐ তো তফাত, মাত্র একটা পানের দোকান।"

আগুন আমার ভাই

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বৈশাখী বিকালের জ্বালাভরা আক্রোশের আঁচ এখন জুড়িয়ে গিয়েছে, যদিও আকাশের পশ্চিমে এখনও একটু রঙিন আভা দেখা যায়। এমনি এক লগ্নে গরানহাটার সেই গলির বাতাসে এক ভয়াল জ্বালার আভা রঙিন হয়ে ফুটে উঠল। সেই সঙ্গে যেন চাপ-চাপ নিরেট ধোঁয়ার কুণ্ডলী প্রকাণ্ড বাড়িটার তিনতলার যত জানালা, যত ঘুলঘুলি আর যত রন্ধ্রপথ ভেদ করে ঠেলে উঠতে থাকে। সরু পথের উপর হাজার মানুষের ভিড় চেঁচায়, হায়-হায় করে, আর হঠাৎ যেন এক একটা দমকা আতঙ্কের ঠেলায় দশ পা পিছিয়ে যায়; আবার হৈ হৈ করে দু পা এগিয়ে আসে।

আগুনের সঙ্গে লড়াই করে যারা, তারাও এসে গিয়েছে। জোর লড়াই চলছে। গলির বাতাস ঝনঝনিয়ে দমকলের ঘণ্টার শব্দও মরিয়া হয়ে দৌড়ে আসতে থাকে; যেন গম্ভীর আতঙ্ক আর শান্ত উল্লাসের বাজনা। এগিয়ে যায় এক একটি ফায়ার-ইঞ্জিন, যার বুকের কাছে সুডোল ট্যাঙ্কের ভিতর চারশ গ্যালন জল টলমল করে।

ছুটছে জলের ফোয়ারা। কিন্তু কী ভয়ানক রাগী আগুন! লকলকে রক্তবরন শত শত শিখার সেই পাগলা নাচন যেন বিভোর হয়ে প্রচণ্ড এক জ্বালার উৎসব মাতিয়ে তুলেছে। তার কাছে পৌছবার আগেই গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে জলের ফোয়ারা, কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলীর সঙ্গে সাদা বাষ্পের কুণ্ডলী জড়াজড়ি করে উপর আকাশের দিকে পালিয়ে যায়।

ফায়ার ব্রিগেডের একদল ক্রু ছুটে ছুটে খাটছে, পাশের বাড়ির তিন-তলায় উঠে দশটি হোস-পাইপের মুখ উঁচিয়ে ধরে পোড়া বাড়ির ধোঁয়া-ভরা জানালাগুলির উপর ওরা জলের ফোয়ারা ছুঁড়ে মারছে। মনে হল, একটা ঘর ভিজেছে, ঠাণ্ডা জলের মার খেয়ে আগুন মরেছে, জানালা দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে সরু সরু জলের ধারা।

কিন্তু তারপরে আবার। কোথা থেকে সেই দুর্মর আগুনের জ্বালাই যেন রঙিন হাসি হেসে জানালার বুকটাকে আভাময় করে তোলে। পাশের ঘরের জানালাতেও আগুনের রঙিন আলো ধক-ধক করে।

আগুন-লাগা বাড়ির দোতলা আর একতলার সব লোক অনেক আগেই নীচে নেমে গিয়েছে। একটা ঘরের ভিতরে তখনও শ্বাস টানছিল এক মর-মর রোগী। তাকেও কারা যেন বিছানা সুদ্ধ তুলে নিয়ে দুলতে দুলতে দোতলা থেকে নেমে এল।

কিন্তু তিনতলাতে যারা থাকে, তারা কোথায় গেল? তারা কি নেমে আসতে পেরেছে? ক্রু-মাস্টার ব্যস্ত হয়ে ভিড়ের লোকের কাছ থেকে জানতে চায়। লোকে বলে তিনতলার সবই যত বে-আইনী কাপড়ের গুদাম। কেউ কেউ বলে, কোন কোন ঘরে বে-আইনী মেয়েমানুষও থাকে।

যাই হক মেয়েমানুষগুলো নেমে আসতে পেরেছে বলে মনে হয়। নইলে এতক্ষণে কোন-না-কোন সাড়া পাওয়া যেত। এই দশমিনিটের মধ্যে ঐ তিনতলার কোন জানালা থেকে কোন আর্তস্বর ছুটে বের হয়নি। কোন জানালায় কোন আতঙ্কিত মুখ উঁকি দিয়ে কেঁদে ওঠেনি। মনে হয় তিনতলার আগুনটা কোন জীবন্তের প্রাণকে ছাই করে দেবার আনন্দে নয়, শুধু বে-আইনী লোভের কতগুলি বস্তুপিণ্ডকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে হাসছে। অগুনটাকে তেমন নিষ্ঠুর বলে মনে হয়না। গরানহাটার এই কুৎসিত গলিটাকেও কোনদিন এত সুন্দর আর এত রঙিন দেখায়নি।

ফায়ার ব্রিগেডের ক্রু কাশীনাথও এই কথাই বোধ হয় চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবছিল, আর তিনতলার রক্তবরন আগুনের উৎসবের দিকে যেন মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েছিল। এখনও অর্ডার হয়নি, কাশীনাথ এখন শুধু স্ট্যাণ্ড-বাই। হয়ত আর এক মুহূর্ত পরেই হুকুম গর্জে উঠবে, তারপর আর এক মুহূর্তও দেরি হবে না। আগুনের ঐ জ্বালাভরা হলকা আর হিংস্নক লাফালাফি ঠাণ্ডা করে দেবার জন্য ছুটে গিয়ে হোস-পাইপ হাতে তুলে নিতে হবে। বোধহয় দু ইঞ্চি মনিটর জেট ছাড়তে হবে; জবর মার না মারলে ঐ আগুনের দেমাক চূর্ণ হবে না। তৈরী হয়ে আছে কাশীনাথ।

আগুন দেখতে বড় সুন্দর। কত আগুন-লাগা বাড়ির জ্বলন্ত বুকের কাছে কতবার এগিয়ে যেতে হয়েছে। দেখেছে কাশীনাথ, সে এক অদ্ভুত

ব্যাপার। দাউ দাউ করে ঘরের জিনিষপত্র পোড়ে; আগুনের শিখাগুলি লকলক করে। দেখে মনে হয়, যেন একদল রূপসী মেয়ে-ডাকাত হেসে হেসে আর নেচে-নেচে ঘরের জিনিষ লুঠ করে নিচ্ছে।

ভাবতে ভাল লাগে, বুকের ভিতরটা যেন নেশার মত চনচনে আনন্দে শিউরে ওঠে। এই রকমই রাগী আগুনকে ঘায়েল করতে গিয়ে এই পাঁচ বছরের চাকরির জীবনে দু-দুবার ভয়ানক সাহসের খেলা দেখিয়েছে যে কাশীনাথ, তার চোখেও যেন বিদ্যুতের আগুন চমকে ওঠে। দুবার রূপোর মেডাল পেয়েছে কাশীনাথ।

আগুন দেখতে বড় সুন্দর, কিন্তু আগুনকে তাই বলে ক্ষমা করতে ইচ্ছা করে না। গোখরো সাপের ফনা-দোলানি নাচের মত এই আগুনের নাচ দেখতে ভাল লাগলেও ভুলতে পারে না কাশীনাথ, এই আগুনের এক সর্বনেশে কামড়ে তার জীবনের সব আনন্দ বিষিয়ে গিয়েছে। আগুনে-পোড়া ঘা-এর দাগে কাশীনাথের মুখের একটা দিকের গড়নই ভেঙে-চুরে গিয়েছে। দেখলে মনে হয়, মুখের উপর যেন এক খাবলা ঘেয়ো মাংস শুকিয়ে রয়েছে। চোখ দুটো বেঁচেছে, কিন্তু সারা মুখটাই কুৎসিত হয়ে গিয়েছে। নইলে, কাশীনাথের গায়ের রং, চোখের ভুরু আর খাড়া নাকের ধার দেখে বুঝতে অসুবিধা হয় না, এই মুখপোড়া কাশীনাথ সত্যিই দেখতে বেশ সুন্দর ছিল।

মুখের উপর আগুনে-পোড়া ঘা-এর সেই জ্বালা কবেই মিটে গিয়েছে। আগুন-লাগা বস্তির এক ঘরের ভিতর ঢুকে একটা কুষ্ঠ রোগীকে টেনে আনতে গিয়ে ঘরের জ্বলন্ত চালার একটা টুকরো কাশীনাথের মুখের উপর ভেঙে পড়েছিল। সেই কুষ্ঠী লোকটার গায়ে একটা ফোস্কাও পড়েনি, এমনই কায়দা করে লোকটাকে সাপটে জড়িয়ে ধরেছিল কাশীনাথ। রূপোর মেডাল পেল; কিন্তু...।

ক্রু মানিকদা বলেন, "এইবার একদিন একটা বড়লোকের বাড়ির কোন সুন্দরীকে আগুনের মরণ থেকে টেনে বাঁচিয়ে তোল কাশীনাথ, তারপর একটা সোনার গ্যালান্ট্রি পেয়ে যা।"

কিন্তু কাশীনাথ জানে যে, তার মুখের এই আগুনে-পোড়া ঘায়ের চিহ্ন তার এই কুশ্রী মুখই তার জীবনের সব সোনা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। তাইত বুকের ভিতর আগুন জ্বলে, দুঃসহ এক আক্রোশের আগুন। একবার সেই

মেয়েকে চোখের কাছে আর হাতের কাছে পেতে চায়, যে তার এই কুরূপ মুখের দিকে তাকিয়ে ঘেন্না সহ্য করতে না পেরে পালিয়ে গিয়েছে।

আজ তিন বছর ধরে, এই শহরের কত ভিড়ের কাছে গিয়ে তন্ন তন্ন করে খোঁজ করেছে কাশীনাথ, কিন্তু তার দেখা পাওয়া যায়নি। মাত্র বার চারেক তার ঠিকানা পাওয়া গিয়েছিল; কিন্তু কাশীনাথ ছুটে গিয়ে তার গলা টিপে ধরবার আগেই, কে জানে কেমন করে ঠাহর করতে পেরে, সেই ঠগিনী মেয়ে সব ঠিকানা মিথ্যে করে দিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছে। আজও রেণুকার নাগাল পায়নি কাশীনাথ।

সাতপাক দিয়ে বিয়ে করা, কত আহ্লাদে ফুলশয্যা আর বৌ-ভাত করা কাশীনাথের বউ সেই রেণুকা! একে ত টলটলে ডাগর ডাগর কালো চোখ, তার উপর বেশ বড় সুর্মার টান, রেণুকার সেই মুখটি শুভ দৃষ্টির সময় কেমন করে হেসে উঠেছিল, আজও মনে পড়ে কাশীনাথের। কই, সে হাসি ত ঠাট্টার হাসি ছিল না? সেই হাসির মধ্যে ঘেন্নাও ছিল না, শুধু একটু আশ্চর্য ছিল। বরং মনে হয়েছিল কাশীনাথের, রেণুকা বোধহয় ভাবছে যে, বরের মুখটাকে যত কুৎসিত বলে পাঁচজনে নানা কথা বলছে, তত কুৎসিত ত নয়। বাসর ঘরেও ও-পাড়ার এক মুখকাটা মেয়ে ফিস ফিস করে বলেই ফেলেছিল, "মুখপোড়া বর।" মনে পড়ে কাশীনাথের, রেণুকাই তখন কানে কানে অদ্ভুত একটা কথা বলেছিল, "পুরুষের আবার রূপ কি? টাকা পয়সা থাকলে সব সুন্দর।"

হঠাৎ বিয়ে নয়, বেশ তিনটি মাসের দেখা শোনার পর রেণুকা হাসি মুখেই রাজি হয়ে কাশীনাথকে বলেছিল, "বেশ ত, যখন তুমি বলছ যে আমাকে সুখে রাখতে পারবে, তখন বৌ করে ঘরে নিয়ে যাও।"

একঘণ্টা পর পর সিকি মটর আফিম খায় আর কড়া চা টানে, জিরজিরে চেহারার এক মামা। আর যতক্ষণ জেগে থাকে ততক্ষণ পা ছড়িয়ে বসে দোক্তা চিবোয়, বেশ ভারী গতরের এক মামী। এহেন এক মামা আর এক মামীর কাছে কালীঘাটের বস্তির মধ্যে এক কুঁড়ে ঘরের অন্ধকারে দিন কাটাত যে রেণুকা, তাকে এক শুভদিনে নিজের ঘরে আনবার জন্য সাতশ টাকা খরচও করেছিল কাশীনাথ।

মামা বলেছিল, "দেখ বাবাজীবন, যা কথা দিয়েছ তাই যেন হয়। মেয়েটা যেন সুখে থাকে।"

মামী বলে, "যখন নিজের মুখে বলছ যে, তুমি ভাল চাকরি করছ, অনেক সোনা রূপো নাকি বকশিশ পাও, তখন এই মামা আর মামীর উপর একটু নজর রাখতে ভুল না।"

সবই মনে পড়ে। কাশীনাথ যে সত্যিই আশা করেছিল রেণুকাকে বেশ সুখেই রাখা যাবে। আর, বেচারা মামা ও মামীকেও মাঝে মাঝে কিছু সাহায্য করা যাবে। সেই আশার মধ্যে কোন ভুল ছিল না। কাশীনাথের মনের ইচ্ছার মধ্যেও কোন ফাঁকি ছিল না।

কী ভয়ঙ্কর রাগী আগুন! আগুনটা যেন আক্রোশে মরিয়া হয়ে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে নীচের দিকেও অনেকখানি গড়িয়েছে। দোতলার ঘরের তিনটে জানালায় ধোঁয়া দেখা যায়। পথের ভিড় আরও জোরে হায়-হায় করে।

আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে আগুনটার রূপ। জানালার খড়খড়ি দিয়ে ফুরফুরে পাপড়ির মত হয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে লাল নীল হলদে আর বেগুনী জ্বালার ফুল। আর একটা জানালার ফাঁক দিয়ে এক সারি সাপের বাচ্চার মত লিকলিকে আগুনের সরু সরু ফণা যেন এলোমেলো হয়ে কুঁকড়ে-কুঁকড়ে দুলছে। একটা খোলা জানালা দিয়ে দেখা যায়, ভিতরটা হাপরের চুলোর মত থেকে থেকে গনগন করছে। ঝটকা হাওয়ায় গরম ছাই লাফিয়ে লাফিয়ে উড়তে থাকে। ভিড়ের মানুষ ভয় পেয়ে একটু দূরে সরে যায়।

আগুনের রকম দেখে আজ বুঝতে পারে কাশীনাথ, সর্বনাশ অনেক দূর গড়াবে। আর, এক একটা শক্ত আপদের সঙ্গে মরিয়া হয়ে লড়তেও হবে। ভালই হল। এই দশটা দিন শুধু নীল উর্দি চড়িয়ে আর লাল ফায়ার ইঞ্জিনের যত চকচকে পিতলের ঠাণ্ডা পালিশের গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে শুধু ঠাণ্ডা ডিউটি দিতে হয়েছে। দশ দিন পরে এই সন্ধ্যায় আগুনের ডাক শোনা গেল। দাঁতে দাঁত ঘসে কাশীনাথ। নিঃশ্বাসে জ্বালা ধরে যায়।

বোধ হয় বুকের ভিতরের একটা ফোস্কা আজও জুড়িয়ে যায়নি, কট কট আজও জ্বলছে, তাই আগুন দেখলে কাশীনাথের প্রাণটাই যেন দাঁতে দাঁত ঘসে একটা প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞাকে শান দিয়ে আরও ধারাল করে তোলে। কোথায় লুকিয়ে থাকবে? কতদিন লুকিয়ে থাকতে পারবে, রূপের দেমাকে স্বামীর কুলে কালি দিয়ে পালিয়ে যাওয়া সেই মেয়ে?

শুধু মানিকদা জানেন, এই পৃথিবীতে আর কেউ জানে না, বিয়ের পর

চারটে মাস যেতে না যেতেই কেন পালিয়ে গেল রেণুকা, কাশীনাথের এত ভালবেসে বিয়ে করা সেই বউ। কাশীনাথের ছোট ঘরের ভিতর ঢুকে প্রথম দিনেই চমকে উঠেছিল রেণুকা। রেণুকার বড় বড় করে সুর্মা আঁকা চোখের এতদিনের স্বপ্নটা যেন ঠকে গিয়েছে। এমন একটা ঘর বোধহয় আশা করেনি রেণুকা।

উনুনের ধারে কাছে যায় না, কাশীনাথেরই হাতে রান্না করা ভাত আর মাছের ঝোল খেয়ে সারাদিন মাদুরের উপর পড়ে থাকে রেণুকা। মাঝে মাঝে মামা-মামী আসে। তিনটে সন্দেহ-ভরা মুখ ঘরের এক কোণে কাছাকাছি হয়ে ফিস ফিস করে।

চারগাছি সোনার চুড়ি এনেছিল কাশীনাথ; একবার দেখেই মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে রইল রেণুকা। তারপরেই ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছিল, "কালীঘাটের ভিখারীকে দান দিচ্ছ নাকি?"

কাশীনাথ আশ্চর্য হয়, "তার মানে?"

রেণুকা বলে, "ওর সঙ্গে গলার একটা চার ভরির জিনিস আর একজোড়া কানপাশা না হলে আমি ঐ সরু সরু চারগাছি ছাই না কচু ছোঁবও না।"

ভয় পেয়েছিল কাশীনাথ। সারারাত জেগে বসেছিল। মনের জ্বালায় ঘুম আসেনি। জ্বালার মধ্যে কিন্তু রেণুকার উপর এক ফোঁটাও রাগের ঝাঁজ ছিল না। নিজের কপালটার উপরেই রাগ করেছিল কাশীনাথ। অন্য কেউ ত নয়, সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে তারই ঘর করতে এসেছে যে, সেই রেণুকাই কত সুখের আশা নিয়ে তারই চোখের সামনে অঘোরে ঘুমিয়ে রয়েছে আর স্বপ্ন দেখছে। রেণুকার আশার মধ্যে একটুও অন্যায় নেই। অন্যায় করেছে কাশীনাথের দরিদ্র কপালটা।

সকালে ঘর থেকে বের হয়েই সোজা মানিকদার কাছে গিয়ে পঞ্চাশ টাকা ধার করে নিয়ে রঙিন একটা বেনারসী কিনে রেণুকার হাতের কাছে রেখে দিল কাশীনাথ। সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরে দেখল, সেই বেনারসী মেঝের উপর পড়ে রয়েছে, আর মামা-মামীর সঙ্গে বসে গল্প করছে রেণুকা।

রেণুকাকে একবার বাড়িতে নিয়ে যেতে চায় মামা ও মামী।

ভাদ্দর মাসটা পার করে দিয়ে আশ্বিনটা পড়তেই ফিরে আসবে রেণুকা। কাশীনাথ হেসে হেসে বলে, "বেশ তো।"

এই 'বেশ তো'ই কাশীনাথের জীবনের শেষ হেসে-বলা কথা। আর এই

তিন বছরের মধ্যে রেণুকার সেই সুন্দর মুখের ছায়াও দেখতে পায়নি কাশীনাথ।

রেণুকাকে আনতে গিয়েছিল কাশীনাথ। বন্ধ দরজার সামনে শক্ত হয়ে বসে মামা-মামী বলে, "আমাদের মেয়ে বড় ভয় পেয়েছে বাবাজীবন। এই চারটে মাস তোমার ঘরে একদণ্ডও ঘুমোতে পারেনি।"

"কেন?"

"তোমার ঐ কুচ্ছিত মুখ কাছে দেখতে পেলে কোন মেয়েই বা ভয় না পাবে বল?"

"রেণুকে একবার ডেকে দিন।"

"আসবে না রেণু, তুমি যাও।"

"খবরদার, বাজে কথা বলবেন না।"

মামা-মামী একসঙ্গে গর্জন করে, "যা রে যা, খবরদারের বেটা। তোর মত অমন মুখপোড়া কত সেয়ানার কত খবর করে ছেড়ে দিলাম, আজ এসেছিস তুই দাঁত ঘষে ভয় দেখাতে?"

ফিরে এল কাশীনাথ। তারপর এক সন্ধ্যায় মানিকদাকে সঙ্গে নিয়ে কালীঘাটের বস্তির সেই ঘরের বন্ধ দরজার কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে হাঁক দিল, "রেণুকা!"

কোন সাড়া নেই। গলা ফাটিয়ে হুংকার দেয় কাশীনাথ, "বের হয়ে এস রেণুকা, নইলে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকব।"

দরজা খুলে গেল, বের হয়ে এল এক বুড়ী, "তারা এখানে নেই। ঘর ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছে।"

"কোথায় গিয়েছে?"

"জানি না।"

যেন আগুনের কামড় লেগেছে একেবারে বুকের ভিতরে। কট কট করে জ্বলতে শুরু করেছে একটা ফোসকা। কাশীনাথের পোড়া-মুখটাকে ঘেন্না করে পালিয়ে গিয়েছে সুন্দর-মুখের মেয়ে।

আর অপেক্ষা করেনি কাশীনাথ, শুধু একটা প্রতিজ্ঞাকে মন-প্রাণ দিয়ে তিন বছর ধরে পুষে এসেছে। প্রতিশোধ নিতে হবে, এমন প্রতিশোধ যে, দেখে ভগবানও ভয় পেয়ে যাবে।

ধারাল ছুরি নয়, মিষ্টি বিষও নয়, শুধু এসিড-ভরা একটা শিশি আজ

তিন বছর ধরে কাশীনাথের জামার পকেটে প্রতিশোধ নেবার প্রতীক্ষায় যেন ওত পেতে আছে। দেখা কি কোনদিন হবে না? যে-মুহূর্তে তার দেখা পাওয়া যাবে, সেই মুহূর্তে তার সুন্দর মুখের উপর এসিড ছুঁড়ে মারবে, তারপর চেঁচিয়ে হো হো করে হেসে উঠবে কাশীনাথ। প্রাণে নয়, রূপে মেরে দিয়ে ঐ মেয়ের জীবনকে কুকুরের চোখেরও ঘেন্না করে ছেড়ে দিতে হবে।

ভুলতে পারা যায় না, সেই মেয়ের সেই সুন্দর মুখ। লম্বা বিনুনি দোলে, কানের কাছে চুলগুলি আংটীর মতন পাকিয়ে রয়েছে। গাল দুটো একটু ফোলা-ফোলা; সুডোল গলায় শাঁখের মত পর পর তিনটে খাঁজ, তার মধ্যে সাদা পাউডারের রেখা ফুটে থাকে। সেই মূর্তিকে এই পৃথিবীর কোন আগুন-লাগা ঘরের মধ্যে কি দেখতে পাওয়া যাবে না? পাওয়া যেতেও ত পারে। যদি পাওয়া যায়, তবে হাসতে হাসতে দু চোখ ভরে দেখে শান্ত হয়ে যাবে কাশীনাথের প্রাণের সব জ্বালা। এসিড ছুঁড়ে মারবার দরকার হবে না। পোড়া সাপের মত ছটফট করে মরে যাবে সেই রূপের অহংকার; রেণুকা নামে একটা ঝলসানো লাশ তুলে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স গাড়ির দরজার কাছে ফেলে দেবে কাশীনাথ।

না, ভাবতে ভুল করছে কাশীনাথ। মরতে দেওয়া চলবে না। মরে গেলে ত ঠিক শাস্তি পাওয়া হল না। বাঁচাতে হবে সেই মেয়েকে। শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর হেসে হেসে দেখতে হবে, সেই দেমাক-ভরা রূপের নাক চোখ আর ফোলা-ফোলা গাল চর্বির বড়ার মত ঝলসে যাচ্ছে। তার পরেই টেনে তুলে বাইরে নিয়ে গিয়ে বাঁচিয়ে ফেলতে হবে। তার পরেই সেই মেয়েকে একটা নতুন আয়না উপহার পাঠিয়ে দেবে কাশীনাথ।

চমকে ওঠে কাশীনাথের চোখ। ক্রু মাস্টারও চমকে উঠেছে। তিন তলার একটি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ছটফট করছে একটি মেয়ের মূর্তি। পাশের ঘরের জানালাটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। ঘরের ভিতরটা লালচে আভায় রঙিন।

"বাবা গো, বাঁচাও গো।"

তীব্র আর্তনাদ। যেন পুড়তে পুড়তে ঠিকরে বের হয়ে আসছে একটা আবেদন। ক্রু মাস্টার হাঁক দিলেন, "রেস্ক্যু!"

তবে কি ভগবান সুযোগ পাইয়ে দিলেন? দাঁতে দাঁত ঘষে কাশীনাথ।

অ্যাসবেসটসের আংরাখা, টাঙি, তারের দড়ি আর অক্সিজেন। এক মুহূর্তের মধ্যে সব সরঞ্জামে পাতলা শরীরটাকে সাজিয়ে নিয়ে চকচকে ইস্পাতের টার্ন-টেবিল মই-এর মাথায় পা দিয়ে দাঁড়ায় কাশীনাথ।

মইটা যেন একটা অপার্থিব জিরাফের লম্বা গলা। তিন তলার জানালার দিকে লক্ষ্য রেখে টান হয়ে বেড়েই চলেছে। উঠছে নামছে আর দুলছে মই। বেল্টের সঙ্গে বাঁধা হোসের মুখ এক হাতে চেপে ধরে আগুনের হলকার দিকে যেন ভেসে ভেসে এগিয়ে যেতে থাকে কাশীনাথ। ভিড়ের গলা থেকে বিস্ময়ের চমক শিউরে ওঠে, "সাবাস! সাবাস!"

জানালার একেবারে কাছে এগিয়ে এসেছে মই-এর মাথা। থর-থর করে কাঁপতে থাকে কাশীনাথেরও চোখের আগুন। দু ইঞ্চি মনিটর জেট ভয়ংকর তোড়ে আছাড় খেয়ে জানালা দিয়ে ঘরের ভিতর পড়ছে। জলের সেই প্রচণ্ড ও পাগলা আঘাতের মার খেয়ে ফিকে হয়ে যাচ্ছে ঘরের লালচে আভা। আগুনের জ্বালার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঘরের ভিতর যেন কুয়াশা নেচে বেড়ায়। তারই মধ্যে দেখতে পেয়ে দপ করে হেসে ওঠে কাশীনাথের চোখ। মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ছে, ছটফট করছে, আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে শুধু সায়া-পরা একটি মেয়ের মূর্তি। লম্বা বিনুনি দোলে, কানের কাছে আংটি করা চুলের গুচ্ছ নাচে, ফোলা-ফোলা গাল, বড় বড় করে সুর্মার টানে আঁকা চোখ। আজ আর তোমার পালিয়ে যাবার উপায় নেই রেণুকারাণী সুন্দরী!

মুখোশ পরে নিয়ে অক্সিজেনের টিউব খোলে কাশীনাথ। "সাবাস! সাবাস!" ভিড়ের মানুষ আশ্চর্য হয়ে চিৎকার করে। উড়ন্ত চিতাবাঘের মত জানালা টপকে ঘরের ভিতর ঢুকে কাঁপতে থাকে কাশীনাথের শরীরটা, সেই সঙ্গে বুকের ভিতর তিন বছর ধরে পোষা প্রতিহিংসাটাও।

"কেমন? পুড়ে মরতে বেশ ভাল লাগছে?" চেঁচিয়ে ওঠে কাশীনাথ।

"না গো না, একটুও না। মরতে চাই না। বাঁচাও, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে বাঁচাও, বুক জ্বলে যাচ্ছে, দাঁড়াতে পারছি না, ওগো ভগবান গো!"

"স্বামীর বুক জ্বালিয়ে দিয়ে পালিয়ে যাবার সময় বুক জ্বলেনি?"

"ওগো, বড্ড ভুল করেছি গো। বড্ড শাস্তি হয়ে গিয়েছে গো। আমাকে ক্ষমা কর গো।"

ঘর-ভরা আসবাব। পালঙ্ক মিরর আর কাঁচের আলমারিতে রকমারি

রুপোর ও তামা-কাঁসার জিনিস। রেণুকার গা-ভরা গয়নার স্বপ্নও সফল হয়েছে। গলায় তিনটে সোনার হার, হাতের চার আঙুলে আংটি। সাচ্চা সোনার জরি দিয়ে জড়ান বেণী। বাঃ!

"কিন্তু আমি তোমাকে বাঁচাব কেন গো? ভগবানকে ডাক গো! সে এসে তোমাকে বাঁচাক গো!"

"তুমিই বাঁচাও। তুমি আমার স্বামী, তুমি আমার ভগবান।"

বিনুনিতে আগুন ধরেছে, সায়ার লেসগুলি জ্বলতে শুরু করেছে দু হাতে মুখ ঢেকে চেঁচিয়ে ওঠে কাশীনাথের জীবনের অভিশাপ, সাপিনীর মত সেই বিষ-ভরা সুন্দরী মেয়ে।

"ক্ষমা কর গো, আর জীবনে পাপ করব না গো। তোমার পায়ে পড়ি, আজকের মত প্রানটা বাঁচিয়ে দাও।"

বাঁচাতে হবে বইকি। এক লাফ দিয়ে এগিয়ে আসে কাশীনাথ। টাঙির এক কোপে জ্বলন্ত বিনুনিকে টুকরো করে কেটে ফেলে দেয়। এক থাবা দিয়ে সায়াটাকেও টেনে ছিঁড়ে দূরে ছুঁড়ে দেয় কাশীনাথ।

আবার চেঁচিয়ে ওঠে কাশীনাথের জীবনের সেই সুন্দর-মুখ দুঃস্বপ্ন, "দয়া কর গো, আমার মুখটাকে বাঁচাও গো! ওরে বাবা রে!"

মুখের রূপ বাঁচাবার জন্য প্রার্থনা করছে রেণুকা। মুখোশের ভিতর হঠাৎ জ্বলজ্বল করে ওঠে এক জোড়া আক্রোশের চোখ। অ্যাসবেসটসের ঢাকার আড়ালে টলমল করে ওঠে একটা বুক। কাশীনাথের জীবনের সেই হিংস্র আর জ্বলন্ত প্রতিজ্ঞাটার বুকের উপর যেন দু ইঞ্চি মনিটর জেট আছাড় খেয়ে পড়ছে, ভিজে যাচ্ছে আগুনের জ্বালা।

"এস!" দু হাতে সাপটে সেই ফোটা ফুলের মত নগ্ন ও নরম আর পাউডারের সুগন্ধ মাখান একটা সুন্দর শরীরকে বুকের উপর তুলে নেয় কাশীনাথ।

পটপট করে অ্যাসবেসটসের আংরাখার বোতাম ছিঁড়ে চেঁচিয়ে ওঠে কাশীনাথ। "আমার বুকের ভিতর মাথা গুঁজে দাও, নইলে হলকার আঁচ থেকে তোমার মুখ বাঁচবে না।"

হ্যাঁ, এতদিনে ফিরে এসেছে রেণুকা; এই আগুনের নিষ্ঠুর উৎসবকে একেবারে মিষ্টি করে দিয়ে রেণুকা আজ স্বামীর বুকে মাথা লুটিয়ে মুখ গুঁজে দিয়েছে।

বুকে জড়ান সেই মূর্তিকে তারের দড়ি দিয়ে চার পাক ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে এক লাফে জানালার কাছে সরে আসে কাশীনাথ। মই-এর মাথায় পা দেয়। ভিড়ের হাজার মানুষ উল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে। জ্বালাভরা রঙিন ধোঁয়া আর ছাই ছড়ান এক চিতার জগৎ থেকে সেই মুহূর্তে যেন একটা গোঁত্তা দিয়ে সরে যায় ইস্পাতের মই। কৃতার্থভাবে ঠুংঠাং করে বাজতে থাকে নীচের ক্রেনের শিকল।

অ্যাম্বুলেন্স! কাশীনাথের ফিরে পাওয়া স্বপ্নের মূর্ছাহত শরীরটাকে নিয়ে হাসপাতালে ছুটে চলে গেল অ্যাম্বুলেন্সের গাড়ি।

সেদিন ডিউটি থেকে ছুটি। মানিকদা এসেছেন, কাশীনাথের ছোট ঘরের ভিতর যেন একটা আনন্দের গন্ধ থমথম করে। একটি বোতল, দুটি গেলাস আর মুড়ি-পেঁয়াজ।

মানিকদা শুনে আশ্চর্য হন, "সে কী রে?"

কাশীনাথ হাসে, "হ্যাঁ মানিকদা। ও-মেয়ে রেণুকা নয়। অনেকটা রেণুকারই মত দেখতে। হাসপাতালে গিয়ে দেখি, এক বাবুমশাই এসে মেয়েটির কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। বাবুর গলায় সোনার হার, সঙ্গে গাড়িও আছে। কিন্তু কী আশ্চর্য, বাবুর মুখটা আমার এই পোড়া-মুখের চেয়েও অনেক কালো আর অনেক কুচ্ছিত।"

মানিকদা অস্বস্তির হাসি হাসেন, "যা চলে! এত বড় আশাটা মিথ্যে হয়ে গেল।"

কাশীনাথ হাসে, "না মানিকদা, একটুও মিথ্যে হয়নি।"

মানিকদা আশ্চর্য হন, "তোর মনে হঠাৎ এত ফুর্তি চমকে উঠল কেন রে?"

"আর ত কোন দুঃখ নেই। ওই এক মিনিটের মধ্যে সবই পেয়ে গিয়েছি। আর খোঁজাখুঁজি করবার দরকার নেই।"

"তার মানে?"

"তার মানে, ওই ত। প্রতিশোধ নেওয়া যায় না রে দাদা। টপ করে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরতে হয়। আমি মুখপোড়া হলেও বুকপোড়া ত নই মানিকদা।"

মানিকদা গম্ভীর হন, "তা ঠিকই বলেছিস।"

হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে কাশীনাথ, "এই শালা মালের বড় তেজ আছে মানিকদা, দু চুমুকেই চোখ ধরে গিয়েছে।"

"বেশী খাসনি।"

আস্তে আস্তে বলে কাশীনাথ, "কী যেন সেই গানটা, তুমি মাঝে মাঝে যেটা গাও মানিকদা।"

মানিকদা হাসেন, "আগুন আমার ভাই, আমি তোমারই জয় গাই।"

"বাঃ, বেড়ে গানটি। সত্যি, মাইরি খুব সত্যি মানিকদা।"

আগ্রা আর লখনউ

অমলিনা বলে, "আমাদের লখনউ ঢের ঢের ভাল, আর অনেক বেশী চারমিং, তোমাদের এই আগ্রার চেয়ে।"

দেবনাথ বলে, "আমাদের আগ্রা ঢের ঢের ভাল, আর অনেক বেশী লাভ্‌লি, তোমাদের ওই লখনউএর চেয়ে।"

অমলিনা বলে, "আমাদের দিলখুশা, কৈসরবাগ, রেসিডেন্সি, রুমি দরওয়াজা আর চমৎকার গোমতী নদী।"

দেবনাথ বলে, "আমাদের তাজ, ইতিমদ্দৌলা, ফোর্ট, ফতেপুর সিক্রি, আর যমুনা।"

আগ্রার তাজ রোডের উপর দেবনাথের এই সুন্দর স্টাইলের আধুনিক বাড়িটার চেহারাতেও যেন মোগল রুচির ছায়া আছে। দরজার উপর সাদা মার্বেলের জালি আর বারান্দার শেষে লাল বেলেপাথরের ঝরোকা।

ড্রইং-রুমে বসে গল্প করে হাসে দেবনাথ আর অমলিনা, স্বামী আর স্ত্রী। কালো বুলডগ শখের পাহারাওয়ালার মত দরজার কাছে বসে কার্পেটে মাথা ঘষে, আর দেবনাথের দুই বোন টুটু আর ফুটু বাগানে দৌড়াদৌড়ি করে সূর্যমুখী কুড়োয়, আর মখমল পোকা খুঁজে বেড়ায়।

আগ্রার ছেলে দেবনাথ এবং লখনউএর মেয়ে অমলিনা। এই ত কতদিনই বা হল, গত মাসের মাঝামাঝি একটি দিনের ক্লান্ত প্রহরের শেষে সন্ধ্যার চাঁদ ঠিক যখন গোমতীর বুকে আলো ছড়িয়েছে, তখন শুরু হল মধুর এক উৎসব। দেবনাথ আর অমলিনার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের রেজিস্ট্রার রতনলালবাবু খাতা বন্ধ করে ওদের দুজনকে হেসে হেসে ব্লেসিং জানালেন ; আবার শাঁখও বাজল, অমলিনাদের লখনউএর বাড়ির ফুলবাগানে ঝুর-ঝুরে মিষ্টি হাওয়া বয়ে গেল।

আগ্রার বাড়ির ড্রইং-রুমে বসে এই যে তর্ক, এটাও যেন একটা মিষ্টি রেষারেষির ঝুরঝুরে হাওয়া। দেবনাথ হাসে, অমলিনা হাসে। তর্কও গড়াতে

থাকে। কিন্তু মীমাংসা হয় না, আগ্রা ঢের ঢের ভাল, না লখনউ ঢের ঢের ভাল ?

এই সুন্দর হাসিভরা তর্কের ঝুরঝুরে হাওয়াটাই হঠাৎ একদিন একটু তপ্ত হয়ে এলোমেলো হয়ে যায়। অমলিনা বলে, "সত্যিই তোমার ঐ অদ্ভুত সাজ আমার একটুও ভাল লাগে না।"

আশ্চর্য হয় দেবনাথ, "অদ্ভুত সাজ কেন বলছ ?"

"সব সময় একটা সাদা টুইলের শার্ট আর খাকি জিনের ট্রাউজার কী অদ্ভুত দেখতে! আলিগড় কাটলারির এজেন্টদের মত।"

অমলিনার কথা শুনেও দেবনাথের চোখে একটা হাসির শিহর ফুটে থাকে ঠিকই, কিন্তু যে-ভাবে হঠাৎ এক-একবার কেঁপে ওঠে, তা দেখে মনে হতে পারে, বাতাসে যেন অকাল লু-এর জ্বালা লেগেছে। তাই চোখের হাসিটা মাঝে মাঝে তেতে উঠছে।

অমলিনা বলে, "আমার একটা সামান্য অনুরোধ যদি তুচ্ছ না কর ত বলি।"

"বল।"

"বেশ সুন্দর তসরের একটি ঢিলে-ঢালা পাঞ্জাবি আর পায়জামা তোমাকে যে কী সুন্দর মানাবে, সেটা বোধহয় তুমি বুঝতেই পারছ না।"

"বুঝতে পারছি না ঠিকই।"

"আমার কথা বিশ্বাস কর, লক্ষ্মীটি। সত্যিই তোমাকে খুব ভাল দেখাবে।"

দেবনাথ হাসে, "অন্তত তোমার চোখে ত ভাল দেখাবে।"

অমলিনার চোখে যেন অভিমানের ছায়া মেদুর হয়ে ওঠে। "তাই না হয় হল। আমার জন্য সামান্য একটু কষ্ট স্বীকার করতে...।"

"না না, কষ্ট কিসের? তুমি যদি খুশী হও তবে আমি কাবুলিওয়ালাও সাজতে পারি।"

তর্ক আর হাসিটা তপ্ত হতে হতে একটা কৌতুকের ছোঁয়ায় সিক্ত হয়ে মিইয়ে যায়। আবার স্বচ্ছন্দে গল্প করতে পারে অমলিনা আর দেবনাথ। এবং দু দিন পরেই বিকালে বেড়াতে যাবার সময়, সত্যিই তসরের পাঞ্জাবি আর পায়জামা পরে অমলিনার কাছে এসে দেবনাথ বলে, "চল, আজ একবার সেকেন্দ্রা ঘুরে আসি।"

আগ্রার বিরুদ্ধে লখনউএর অভিযোগ আর অভিমান যদি এই পর্যন্ত এসে থেমে থাকত, তবে বোধহয় এই রকমই হাসি মুখের উপর টেনে আর খুশী মনে সেকেন্দ্রার দরজার ছায়ার কাছে এসে রোজই দাঁড়াতে পারত দেবনাথ, আর অমলিনার মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে পারত, "সেকেন্দ্রার বিকালের এই আলো, দূরের ঘুঘুর ডাক আর চারদিকের এই উদাস শান্তি কেমন লাগছে অমলিনা ?"

কিন্তু মাত্র ওই একটি দিন, তার পর আর এই প্রশ্ন করবার সুযোগ পায়নি দেবনাথ। অমলিনাও কোন দিন ভুলেও আগ্রার কোন আলো আর ছায়ার দিকে তাকিয়ে তার চোখদুটিকে বিহ্বল করে তুলতে পারল না। দেবনাথের মুখের হাসির সঙ্গে তার জীবনেরও একটা উৎসাহের হাসি যেন হেমন্তের দেওদারের পাতার মত ফিকে হয়ে আসতে থাকে। কিন্তু অমলিনার হাসি দিন-দিন আরও উচ্ছল ও আরও রঙিন হয়ে ওঠে। একের পর এক জয়ী হয়ে চলেছে লখনউএর অভিযান।

বদলে যাচ্ছে দেবনাথ। অমলিনা যেন তার জীবনের প্রিয় সঙ্গীকে মনের মত করে ভাঙছে গড়ছে আর সাজাচ্ছে। দেবনাথও আপত্তি করে না। আপত্তি করার দরকার কী? লাভই বা কী? তসরের পাঞ্জাবি আর পায়জামায় সেজে, বেশ একটু নতুনটি হয়ে প্রথম যখন অমলিনার চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল দেবনাথ, তখন ঝক করে হেসে উঠে বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল অমলিনার চোখ। দেবনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে খুশী হক, মুগ্ধ হক অমলিনা। অমলিনার জীবনের আশাগুলি খুশী করে হাসিয়ে দিতে গিয়ে দেবনাথের হাসি ফুরিয়ে যাচ্ছে, যাকগে।

অমলিনা আপত্তি করে, "তোমার গলা ভাল, কিন্তু ঠুংরি গেয়ে গেয়ে নষ্ট করছ কেন ?"

"ঠুংরি তোমার ভাল লাগে না ?"

"একটুও না।"

"কী ভাল লাগে ?"

"গজল !"

কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকে দেবনাথ! তার পরেই উৎসাহের সঙ্গে নড়েচড়ে বসে। তারপর অমলিনার মুখের দিকে একটা ফিকে হাসি হেসে গীটার বাজিয়ে গজল গায় দেবনাথ। যেন আবেশে বিভোর হয়ে শুনতে থাকে

অমলিনা। শিকার করতে গিয়ে দেখেছে দেবনাথ, চম্বলের নিরালা বালি-য়াড়ির উপর দাঁড়িয়ে দূরের বিউগল শুনে ঠিক অমলিনার মত এইরকম মুগ্ধ আর নিথর ছুটি চক্ষু তুলে দাঁড়িয়েছিল দলছাড়া একটা চিতল হরিণী।

অমলিনা বলে, "তুমি বুঝি শুধু ক্রিকেট ভালবাস?"

"হ্যাঁ।"

"কেন? টেনিস কোন অপরাধ করেছে?"

"কোন অপরাধ করেনি। তুমি যদি বল, তবে ক্রিকেট ছেড়ে দিয়ে টেনিসই ধরি।"

অমলিনা উচ্ছ্বসিত হয়ে হাসতে থাকে, "ভালই ত।"

প্যাটেল পার্কের একটা হাওয়া হু হু করে ছুটে এসে ড্রইং-রুমের জানালার পর্দা ফাঁপিয়ে তোলে। কিন্তু দেবনাথের বুকের ভিতরটা হঠাৎ গুমরে ওঠে, তারপর যেন হু হু করে ফুরিয়ে যেতে থাকে পাকা ক্রিকেটিয়ারের এতদিনের যত আনন্দ আর অহংকারের নিঃশ্বাস।

স্বামীকে, জীবনের প্রিয়তম সঙ্গীকে মনের মত করে সাজিয়ে নিয়ে জীবনের কাছে পেতে চায় অমলিনা। তাই ত এত মত্ত হয়ে উঠেছে অমলিনার দাবিগুলি। পুরনো দেবনাথ যেন অমলিনার এই দাবিগুলির এক ভয়ানক মায়ার টানে পড়ে নিজেকে ক্ষণে ক্ষণে ছিঁড়ে-খুঁড়ে একেবারে নতুন করে দিচ্ছে। অমলিনার ভালবাসার কাছে নিজের শখ রুচি আর ইচ্ছার জেদগুলিকে একটু ছোট করে দিলে দোষ কী?

টেনিসই ধরে দেবনাথ। চা ছেড়ে দিয়ে কফি ধরতে হয়; অমলিনার অনুরোধ। ইংরেজী ফিল্ম নয়, হিন্দী ফিল্ম দেখতে হয়। অমলিনা বলে, "যতই বল, গানে আর নাচে ভরা ঐ হিন্দী ছবিই ভাল।"

মুগ্ধ হয়ে দেবনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অমলিনা। তসরের পাঞ্জাবি আর পায়জামা, টেনিস র‍্যাকেট হাতে, খেলতে যাবার আগে বারান্দার কার্পেটের উপর পায়চারি করে যখন কফির পেয়ালায় চুমুক দেয় দেবনাথ, তখন অমলিনার সারা মুখে যেন স্বপ্নময় একটা তৃপ্তি রঙিন হয়ে ওঠে।—এই ত, কী চমৎকার, দিব্যি সুন্দরটি!

আরও কাছে এগিয়ে এসে দেবনাথের পাঞ্জাবির পকেট থেকে রুমালটা বের করে দেবনাথের গলার পাউডারের মোটা মোটা ছোপ মিহি করে মুছে দেয় অমলিনা।

হেসে হেসে চলে যায় দেবনাথ। দেবনাথের জীবনের একটা গম্ভীর আর উদাস অভিমান অমলিনার হাতের আদরে চমকে উঠে আর লজ্জা পেয়ে হেসে উঠেছে। অমলিনা বলে, "এই সব টক-টক গন্ধ বিশ্রী বিলিতী সেণ্ট আর কখনও মাখবে না বলে দিচ্ছি। এর চেয়ে এক ফোঁটা আতর খস অনেক ভাল।"

অমলিনার কথাগুলি আবার যেন কঠোর আর দুঃসহ খটকার মত দেবনাথের কানের উপর আঘাত দিয়ে খট করে বেজে ওঠে। গম্ভীর হয়ে যায় দেবনাথ।

আগ্রাকে ভাল লাগে না। তবু দেবনাথের একটা অনুরোধ মাঝে মাঝে রক্ষা করে অমলিনা; কখনও সকালে, কখনও বিকালে এবং কখনও বা সন্ধ্যায় দুজনে বেড়াতে বের হয়। একদিন বুলন্দ দরজার কাছে হাঁপিয়ে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে অমলিনা। ব্যস্তভাবে বলে, "আর না, চল এবার বাড়ি ফিরে যাই।"

রাতের আলোতে সদর বাজারের পথে পথে দেবনাথের সঙ্গিনী হয়ে ঘুরতে ঘুরতে অমলিনার সুন্দর মুখে ঘামের ফোঁটা ফুটে ওঠে। অমলিনা বলে, "এখানে মার্কেট করে কোন সুখ নেই। এর চেয়ে আমাদের লখনউ-এর আমিনাবাদের মার্কেট কত জমাট; কত ভিড়; কত রোশনাই; চমৎকার ফুর্তির মেলার মত।"

ফতেপুর সিক্রীর মহল-ই-খাস দেখে যেন ডুকরে ওঠে অমলিনার মন, "এর চেয়ে কত ভাল আমাদের রুমি দরওয়াজা! আমাদের রেসিডেন্সির গোলাপ তোমাদের তাজের গোলাপের চেয়ে কত সুন্দর; আর কী মিষ্টি গন্ধ!"

তবু আজও আগ্রার একটা আশা যেন অমলিনাকে মাঝে মাঝে হাত ধরে আদর করে ডাকছে। বার বার বলে রাজী করিয়ে অমলিনাকে বেড়াতে নিয়ে যায় দেবনাথ। আগ্রার কী আর কতটুকুই বা দেখেছে অমলিনা? লখনউএর দিলখুশাবাগের পিকনিক আর ইউকালিপটাসের ছায়ার আনন্দ গল্প করে বলতে গিয়েও অমলিনার প্রাণটা যেন গান গেয়ে ওঠে। কিন্তু দেবনাথের বিশ্বাস, এখনও বিশ্বাস করে দেবনাথ, আগ্রার ফোর্টের ভিতরে সাদা মার্বেল আর লাল পাথরের জাদুময় রূপের বুকের ভিতরে গিয়ে যদি একবার দাঁড়ায় অমলিনা, যদি শীশমহল দেখে চমকে

ওঠে, আর সম্‌মন বুরুজের নিভৃতে শাজাহানের শেষ নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে আশ্চর্য হয়ে, শেষে জাহাঙ্গীরী মহলে পাথুরে ঝরোকার আড়ালে একটি রঙিন থামের পাশে ঠাণ্ডা ছায়া পেয়ে……।

হ্যাঁ, সেই বিকালে দেবনাথের সঙ্গে ফোর্টে বেড়াতে গিয়েছিল অমলিনা, আর অনেক ঘুরে ফিরে ক্লান্ত হয়ে জাহাঙ্গীরী মহলের ঠাণ্ডা থামের পাশে ছায়াময় একটি নিরালার কোলে এসে দুজনে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল।

কেউ নেই এখানে। বড় নীরব একটি নিরালা। অমলিনার মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে দেবনাথ। আগ্রার স্বপ্ন যেন তৃষ্ণার্ত হয়ে অমলিনার শ্রান্ত ক্লান্ত মুখটার দিকে তাকিয়ে আছে। অমলিনার মুখ দেখে মনে হয়, মুগ্ধ হয়েছে অমলিনা। অমলিনারও আপত্তি নেই। সেই তৃষ্ণাকে সুখী করে দেবার জন্য তৈরী হয়ে দেবনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে অমলিনা।

দু হাত দিয়ে অমলিনার দুটি হাত ধরে বুকের কাছে টেনে আনে দেবনাথ। অমলিনার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে দেবনাথের মুখ।

"আঃ।" যেন একটা অভিযোগ হঠাৎ আক্ষেপ করে উঠেছে। মুখ সরিয়ে নিয়ে অমলিনা বলে, "এ কী করছ! এরকম আমার একটুও ভাল লাগে না।"

চমকে ওঠে দেবনাথ, আর চোখ দুটোও যেন দপদপ করে। "কী রকমটা ভাল লাগে?"

"এমন একটি সুন্দর নিরালায় ভালবাসার মানুষকে কাছে পেলে কী ধরতে হয় তা-ই তুমি জান না।"

"কী ধরতে হয়?"

অমলিনার দু চোখ জুড়ে যেন একটা লাজুক অভিমান ছটফট করতে থাকে। অমলিনা বলে, "হাত নয়, গলা।"

দেবনাথ বলে, "থাক, চল এবার বাড়ি ফিরে যাই।"

ফিকে হতে হতে এতদিনে ফুরিয়ে গিয়েছে দেবনাথের মুখের হাসি। দেবনাথ আর অমলিনার একসঙ্গে বেড়াতে যাবার পালাও ফুরিয়ে গিয়েছে। দেবনাথ আজকাল একাই বেড়াতে যায়।

দেবনাথের গম্ভীর মুখ দেখে মাঝে মাঝে রাগ করে অমলিনা। "তুমি আজকাল যেন কেমনটি হয়ে গিয়েছ।"

তেমন কিছুই নয়, কিছুই বদলায়নি দেবনাথ। পরিবর্তনের মধ্যে শুধু এই যে, আর অমলিনাকে বেড়াতে যাবার জন্য কোন অনুরোধ করে না দেবনাথ। আগ্রার যমুনা মেঘলা দিনের দুপুরে এত নীলঘন রূপ নিয়ে টলমল করে উঠেও অমলিনার চোখে কোন মায়া ঘনিয়ে তুলতে পারল না। লখনউএর মেয়ের চোখে বোধহয় ভরা শ্রাবণের গোমতীর উল্লাস সব ঠাঁই জুড়ে টলমল করছে। অমলিনাকে বেড়াতে যেতে অনুরোধ করে কোন লাভ নেই।

অমলিনার মন দেবনাথকে যেমনটি চায়, তেমনটি হয়েই এই ড্রইং-রুমের সকাল আর সন্ধ্যাগুলি পার করে দেয় দেবনাথ। সেই তসরের পাঞ্জাবি, পায়জামা, আতর খস আর কফির পেয়ালা। অমলিনার জীবন তার মনের মতন রূপের আর রুচির একটি মানুষকে চায় এবং দেবনাথও যেন নিজেকে লুপ্ত করে দিয়ে অমলিনার সেই মনোময় মানুষের একটি জীবন্ত নকল হয়ে অমলিনাকে সুখী করে রাখছে।

অমলিনা বলে, "আমি লখনউ যাব কবে ?"

"যেদিন ইচ্ছা হবে সেদিনই যেও।"

"আমি এই মাসেরই শেষে যেতে চাই।"

"যেও।"

"তোমার একটুও আপত্তি নেই ত ?"

হেসে ওঠে দেবনাথ, "একটুও আপত্তি নেই অমলিনা।"

"তুমি অমন করে হেসে উঠলে যে ? আমি চলে যাব, এটা কি তোমার কাছে একটা সুখের খবর ?"

এই প্রথম, এই ড্রইং-রুমের জীবনে দেবনাথের হাসি ভোরের আকাশের মত রঙিন হয়ে ফুটে উঠেছে, আর অমলিনার মুখের হাসি আচমকা একটা ধাক্কা খেয়ে ব্যথিত হয়ে উঠেছে।

দেবনাথ অপ্রস্তুত হয়ে হাসে, "না না, সুখের খবর কেন হবে ? তুমি লখনউ যাবে, সেই কথা ভাবতে তোমার কত ভাল লাগছে, তাই ভেবে আমি হাসছি।"

অমলিনাও হাসে, কিন্তু সে-হাসির জোর কোথায় যেন আলগা হয়ে ঝুলে পড়েছে। অমলিনা বলে, "আজ সন্ধ্যায় তুমি বেড়াতে আর যেও না।"

"কেন ?" চমকে ওঠে দেবনাথ।

অমলিনা হাসে, "অতুলপ্রসাদের গান শোনাব তোমায়।"

"সে আর নতুন কী জিনিস শোনাবে ? অনেক শুনেছি। মীরার ভজন গাইতে পারবে ?"

অমলিনা আশ্চর্য হয়ে তাকায়, "পারব না কেন ? কিন্তু মীরার ভজন বুঝি খুব নতুন জিনিস ?"

"থাক ওসব কথা। আমাকে কিন্তু আজ সন্ধ্যায় একবার বের হতেই হবে অমলিনা।"

মুখ ভার করে অমলিনা, "আমার সামান্য একটা অনুরোধ, তাও তুমি রাখতে পারবে না ?"

"এই সামান্য অনুরোধটা না করলেই ভাল করতে অমলিনা। তুমি ত জান, আমি বেড়াতে কত ভালবাসি।"

মুখ ভার করলেও বাধা দেয়নি অমলিনা। সন্ধ্যা হতেই যখন কালো বুলডগের সঙ্গে কিছুক্ষণ খেলা করে বাইরে যাবার জন্য ফটকের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে দেবনাথ, তখন ড্রইং-রুমের ভিতর থেকে হঠাৎ ছুটে এসে দেবনাথের পাশে দাঁড়ায় অমলিনা, হাঁটতে হাঁটতে ফটক পর্যন্ত এগিয়ে যায়।

অমলিনার খোঁপার দিকে তাকিয়ে দেবনাথ হাসে, "এ কী করেছ ?"

অমলিনা উৎফুল্ল হয়ে বলে, "এই সীজনের প্রথম সূর্যমুখী। কেমন ? দেখতে তোমারও নিশ্চয়ই খুব ভাল লাগছে ?"

"কিছু মনে কর না, দেখতে ভাল লাগছে না।"

"কেন ?"

"খোঁপাতে সূর্যমুখী কেমন জঙ্গল-জঙ্গল মনে হয়। তার চেয়ে দু-চারটে হাস্নুহানা হলে মানাত ভাল। কালোর ওপর সাদা সবচেয়ে সুন্দর মানায়।"

শিউরে ওঠে অমলিনার উৎফুল্ল চোখের আহত হাসি। আগ্রার মন যেন প্রকাণ্ড একটা অন্ধ শ্বেত-পাথর, অমলিনার খোঁপার রঙিন সূর্যমুখীর উপর আছাড় খেয়ে পড়েছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অমলিনা। হেসে হেসে বিদায় নেয় দেবনাথ, "ফিরতে বেশী দেরী হবে না।"

আশ্চর্য হয়ে আর রাগ করে লাভ কী ? রাগ করবারই বা কী আছে। মানুষটা ত অমলিনাকেই নিজের মনের মত করে কাছে পেতে চাইছে। মীরার ভজন আর হাস্নুহানা ভালবাসে দেবনাথ। বেশ ; তাই হক।

বেড়িয়ে ফিরে যখন ড্রইং-রুমের দরজার কাছে এসে কালো বুলডগের কাঁধে হাত দেয় দেবনাথ, তখন খুশী হয়ে হেসে ওঠে দেবনাথের দুই চোখ। গান গাইছে অমলিনা—মীরার ভজন। বড় মিষ্টি সেই ভজনের সুর। অমলিনার খোঁপায় সাদা হাস্নুনা-হানাও যেন সেই মিষ্টি সুরে মজে গিয়েছে।

"বাঃ! এত মিষ্টি গান, কিন্তু এত গম্ভীর হয়ে গাইছ কেন অমলিনা?"

"গম্ভীর?"

"হ্যাঁ, তবু তোমাকে দেখতে বেশ লাগছে অমলিনা।"

"আমাকে, না খোঁপার হাস্নুনা-হানাকে বেশ লাগছে?"

"একই কথা, একই কথা!" ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায় দেবনাথ।

অমলিনার বুকের ভিতর একটা তীব্র চিৎকার যেন নীরবে বেজে ওঠে, না, একই কথা নয়। কিন্তু সেই নীরব চিৎকারের ভাষাকে নীরবেই সহ্য করে অমলিনা।

অমলিনা বলে, "একটা কথা জিজ্ঞেস করব?"

"কর।"

"এই মসলিনের শাড়িও বোধহয় তোমার দেখতে ভাল লাগছে না?"

"আমার মনে হয় বাংলা দেশের তাঁতের শাড়িতে তোমাকে আরও ভাল মানাত।"

"পায়ে আলতা পরলে বোধহয় আরও ভাল মানাবে।

হো হো করে হেসে ওঠে দেবনাথ, "না না, আলতা-ফালতা নয়। তবে মনে হয়, তোমাকে এই ঠকঠকে হাই-হিল জুতোর চেয়ে হালকা একটি ভেলভেটের শ্লিপার বেশী ভাল মানাবে।"

অমলিনা আস্তে আস্তে বলে, বলতে গিয়ে কথাগুলি ফুঁপিয়ে ওঠে, "তাহলে দিও কিনে বাংলাদেশী তাঁতের শাড়ি আর ভেলভেটের হালকা শ্লিপার। ওসব সম্পদ আমার নেই।"

"বেশ ত, কালই একবার সদর বাজারে গিয়ে পছন্দমত সব কিনে নিয়ে আসব।"

ড্রইং-রুম থেকে বের হয়ে তরতর করে সিঁড়ি ধরে উপরতলার ঘরে চলে গেল দেবনাথ। দেখতে থাকে অমলিনা, দেবনাথের হাতে একটি ক্যামেরা দুলছে। কে জানে ঐ ক্যামেরার কাচে সেকেন্দ্রার কোন বিকালের মায়া

আর তাজের কোন ভোরের ছায়া ধরে নিয়ে আসছে দেবনাথ এবং লুকিয়ে বুকের ভিতর পুষে রাখছে ?

কী অদ্ভুত। এ যেন অমলিনা নামে এক নারীর জীবনটাকে হেসে হেসে তুচ্ছ করে, তার ফুলের রং আর গানের স্বর পাল্টে দিয়ে, তার শাড়ির চেহারা বদলে দিয়ে অন্য কাউকে চোখের কাছে গড়ে তুলছে দেবনাথ। বেশ তা-ই হক, দেবনাথের পছন্দের কাছে এইভাবে প্রতিক্ষণ নিজেকে লুপ্ত করে দিয়ে যদি ফুরিয়ে যেতে হয়, তাও ভাল। তবু সুখী হক মানুষটা।

বাংলাদেশী তাঁতের শাড়ী পরে অমলিনা, ভেলভেটের হাল্কা শ্লিপারও পায়ে দিতে ভুলে যায় না। অমলিনাকে নতুন সাজে সাজতে দেখে খুশী হয় দেবনাথ। কিন্তু কী আশ্চয, অমলিনার প্রাণটা যেন তার সব খুশীর খোরাক হারিয়ে, শূন্য হয়ে শুকিয়ে যেতে চলেছে। ড্রইং-রুমের নিভৃতে বসে যন্ত্রণায় ছটফট করে অমলিনা। সত্যিই কি দেবনাথ তার জীবনের সঙ্গিনী অমলিনার মুখের মধ্যে আর কারও মুখের ছবি দেখতে চায় ? সন্দেহ করতে ইচ্ছা করে না। বিশ্বাস করতেই ইচ্ছা করে, আগ্রার শ্বেত-পাথরের বুকের ভিতরে এত ভয়ানক ভেজাল নেই।

রাত হয়েছিল। বড় চাঁদও উঠেছিল। বাড়ির বাগানের এক কোণে লাল পাথরের চৌকির উপর একা বসেছিল দেবনাথ। অমলিনা হঠাৎ এসে একেবারে দেবনাথের গা ঘেঁষে বসে পড়ে, "আমাকে একটা ডাক দিতেও কি তুমি সময় পাওনি ?"

"আমি জানতাম, তুমি নিজেই আসবে।"

"এতই যদি জান, তবে আমাকে কষ্ট দাও কেন ?"

দেবনাথ আশ্চর্য হয়, "তোমাকে কষ্ট দিয়েছি ?"

অমলিনা বলে, "থাক, এখন আর ওসব তর্কের কথা ভাল লাগে না।"

দেবনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অমলিনা। খোঁপার হাস্নু-হানা কাঁপে, ঢাকাই তাঁতের শাড়ির আঁচল ফিসফাস করে এই নিরালার সব পুলক যেন আপন করে নিতে চাইছে। কী-যেন খুঁজছে অমলিনার স্নেহ-মাখান কপালটা ! আস্তে আস্তে দেবনাথের কাঁধে মাথাটা হেলিয়ে দেয় অমলিনা।

বেশ কিছুক্ষণ। কিন্তু দেবনাথ যেন এই নিরালার সব রঙিন মোহ ভুলে গিয়ে, সত্যিই আগ্রার শ্বেত-পাথরের মত সাদা হয়ে আর পাথর হয়ে বসে থাকে।

মাথা তোলে অমলিনা। দেবনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে দুচোখের দুটি তীক্ষ্ণ সন্দেহের জ্বালা ছুটিয়ে দিয়ে বলে, "কী হল, তোমার?"

দেবনাথ আশ্চর্য হয়, "কী হল?"

"বুঝতে পারলে না?"

বুঝতে পেরেই দেবনাথ হেসে ফেলে, "বুঝিনি, সত্যিই বুঝতে পারিনি অমলিনা। আমার বুকের উপর মাথা না রাখলে আমি বুঝতেই পারি না।"

ব্যস্তভাবে আর সতৃষ্ণ দুটি চক্ষু নিয়ে অমলিনার কপালের দিকে তাকায় দেবনাথ।

"থাক!" গায়ে যেন আগুনের ছোঁয়া লেগেছে। সরে যায় অমলিনা। তার পরেই ঘরের দিকে ছুটে চলে যায়।

ড্রইং-রুম শূন্য। কোন গুঞ্জন নেই। দেবনাথ আর অমলিনা, যে দুটি প্রাণের কলরব সন্ধ্যা-সকাল এই ঘরের ভিতরে অনেক হাসি হয়ে ঝরে পড়েছে, সেই দুটি প্রাণ এক মাসের মধ্যেও আর ভুলেও কাছাকাছি হয়নি, পাশাপাশি বসেনি, মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেও কিনা সন্দেহ।

শুধু একটি কথা বলেছিল অমলিনা, "আমি এবার লখনউ চলে যাই।"

শুধু একটি কথা বলেছিল দেবনাথ, "আচ্ছা।"

সেই দিনটিই দেখা দিল। একটি সন্ধ্যা। এই সন্ধ্যায় এখনি বেড়াতে বের হয়ে যাবে দেবনাথ। আর, এখনি লখনউ রওনা হবে অমলিনা। বারান্দার এদিকে আর ওদিকে, ভিন্ন ভিন্ন দুটি ঘরে যে যার নিজের নিজের স্বপ্ন নিয়ে বসে আছে। যে যার নিজের নিজের পথে চলে যাবার আগে কারও সঙ্গে কারও একটি কথা বিনিময়ের কিংবা একটু মুখ দেখাদেখির প্রয়োজনও যেন আর নেই।

কলকল করে হেসে, চেঁচিয়ে আর লাফিয়ে দারোয়ানের হাত ধরে বাড়ি ফিরল টুটু আর ফুটু।

"কোথায় গিয়েছিলে তোমরা?" প্রশ্ন করে দেবনাথ।

টুটু বলে, "গোয়ালিয়র রোডে কৃষ্ণাদির বাড়িতে।"

"কেন?"

ফুটু বলে, "কৃষ্ণাদির বিয়ে হয়ে গেল।"

চমকে ওঠে দেবনাথ। থরথর করে কেঁপে ওঠে মুখটা। দেবনাথের দু চোখ ছিঁড়ে যেন একটা স্বপ্ন হঠাৎ পালিয়ে গিয়েছে।

টুটু-ফুটু তেমনি সারা বারান্দা ছুটোছুটি করে আর কলকল ভাষার ফোয়ারা ছুটিয়ে বিয়েবাড়ির যত মজার গান, মজার সাজ আর মজার চেহারার গল্প ছড়ায়।

"কৃষ্ণাদির বর লখনউএর মিহিরবাবু।" চেঁচিয়ে ওঠে টুটু।

ঘরের ভিতর থেকে সেই মুহূর্তে ছুটে এসে বারান্দার কাছে দাঁড়ায় অমলিনা। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। যেন নিজের নিঃশ্বাসের শব্দও শুনতে পাচ্ছে না অমলিনা।

টুটু-ফুটু চলে যায়। একেবারে নীরব হয়ে যায় বারান্দাটা। তবু দুই স্তব্ধ মূর্তি নিয়ে, আর যেন স্বপ্নহারা চোখের জ্বালা নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে—এদিকে দেবনাথ, ওদিকে অমলিনা।

অনেকক্ষণ পরে বড় চাঁদের আলো বারান্দার কার্পেটের উপর গড়িয়ে ছড়িয়ে যখন অদ্ভুত হয়ে যায়, তখন অমলিনার মুখের দিকে তাকায় দেবনাথ। অমলিনাও চুপ করে দেবনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

হঠাৎ একেবারে শান্ত হয়ে যায় দেবনাথের চোখের দৃষ্টি। "তুমি কি সত্যিই এখন লখনউ যাবে?"

"না। তুমি কোথায় যাবে?"

"কোথাও না।"

"বেড়াতে যাও।"

"তুমিও সঙ্গে যাবে ত?"

"হ্যাঁ।"

তসরের পাঞ্জাবি আর পায়জামা নয়। দেবনাথ পরেছিল সেই টুইলের শার্ট আর খাকি জিনের ট্রাউজার! তাঁতের শাড়ি নয়, খোঁপাতে হাস্নাহানাও নয়, অমলিনা পরেছিল তার সেই রঙিন মসলিন, আর খোঁপায় ছিল সূর্যমুখী।

দুজনে সেই সন্ধ্যাতেই একসঙ্গে পাশাপাশি হেঁটে আর হেসে হেসে গল্প করতে করতে তাজ রোড ধরে এগিয়ে যেতে থাকে।

অচিরন্তন

বাস্, এই বিটপুর পর্যন্ত। ট্রেন আর এক গজও এগিয়ে যাবে না।

কেন? এই ট্রেনেরই যে সোজা পার্বতীপুর পর্যন্ত যাবার কথা ছিল?

আর পার্বতীপুর! কাটিহার পর্যন্ত যাবারও সাধ্যি নেই। বিশ জায়গায় লাইন উপড়ে ফেলে দিয়েছে। একেবারে যেন লাঙ্গল দিয়ে চষে ধানখেতের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে।

ব্যাপার কী? কারা এ-সব কাণ্ড করছে?

করছে ঐ আগস্টওয়ালারা, যারা করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে শুরু করে দিয়েছে।

তাহলে উপায়? ট্রেন থেকে নেমে বিটপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে এই কথাই ভাবতে থাকে সুলেখা সরকার। ছোড়দা কেন যে এই পথে কলকাতা যেতে পরামর্শ দিলেন কে জানে? তার চেয়ে বরউনিতেই গঙ্গা পার হয়ে, তারপর পাটনা হয়ে কলকাতা চলে গেলেই ভাল ছিল। পাটনার হাঙ্গামার কথা শুনেই ছোড়দা ভয় পেয়ে গেলেন, আর কাটিহার পার্বতীপুর হয়ে কলকাতায় যাবার পরামর্শ দিলেন। ছোড়দা ধারণাই করতে পারেননি যে, সব দিকেই যখন আগুন জ্বলছে তখন এই দিকটাই বা বাদ যাবে কেন?

বিজন বসুও এই ভুল করেছে। এখন উপায়? স্টীমার চলছে না। নইলে, এখান থেকে ভাগলপুরে গিয়ে পড়লেই হত। তারপর সাহেবগঞ্জ রামপুরহাট হয়ে···। কিন্তু ভাগলপুরের খবরও যে সুবিধের নয়। ঐ ত ওরা বলাবলি করছে, খুব গুলি চলেছে ভাগলপুরে। সেণ্ট্রাল জেল পুড়েছে।

বিটপুর স্টেশনটাও আধপোড়া হয়ে পড়ে রয়েছে। স্টাফ পালিয়েছে, শুধু একা একটি টুলের উপর বসে স্টেশন মাস্টার ধুঁকছেন। কিছু দূরে একটা পোড়া ট্রেনের কংকাল পড়ে রয়েছে, ঝলসে কালো হয়ে গিয়েছে ইঞ্জিনটা।

ট্রেন থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মের উপর এই জায়গাটিতে পৌঁছতেই সুলেখা সরকারের চেহারাটা নাজেহাল হয়ে দশ মিনিট ধরে হাঁপিয়েছে। চামড়ার

ছোট একটা বাক্স আর ছোট বেডিং, নিজের হাতেই টেনে আর বয়ে নিয়ে আসতে হয়েছে। কুলি-টুলির চিহ্ন নেই স্টেশনে, ওরাও বোধহয় করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে করতে চলে গিয়েছে। তার উপর, এই ত স্টেশনের অবস্থা, একটা টিনের শেড পর্যন্ত নেই। এক পেয়ালা জলও পাওয়া যাবে না। এ কোন সাংঘাতিক জায়গায় এসে পড়তে হল! থাকাও যাবে না, যাওয়াও যাবে না?

কলকাতাতে একটা টেলিগ্রাম করা যাবে কি? দু চোখ ভরা আতঙ্ক নিয়ে দেখতে থাকে স্থলেখা সরকার, টেলিগ্রাফ লাইনের খুঁটিগুলোকেও উপড়ে তুলে নিয়ে এদিক-ওদিক ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে। তারের চিহ্নও নেই। আরও মনে পড়ে, সে-বেচারা শিয়ালদহ স্টেশনে এসে হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে যাবে আর দুশ্চিন্তায় পড়বে। বরউনি থেকেই টেলিগ্রাম করে নির্মলেন্দুকে জানিয়ে দিয়েছে স্থলেখা, কোন ট্রেনে কোন সময়ে সে শিয়ালদহ পৌঁছে যাবে। বেচারা নির্মলেন্দু এখন কল্পনাও করতে পারছে না যে, তারই স্ত্রী এই ভয়ানক এক পোড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে। বাক্সটা টানতে গিয়ে স্থলেখার কাঁধটা টনটন করে উঠেছে, আর বেডিংটা টেনে আনতে আনতে শাড়ির আঁচলটা ফেঁসে গিয়েছে।

একই উদ্বেগ আর একই প্রশ্নে ছটফট করে বিজন বসুর মন। চিঠি পেয়েছে অণিমা। রবিবার রাত্রি দশটার মধ্যে বিজনের বাড়ি পৌঁছে যাবার কথা। অণিমা বেচারি না খেয়ে অপেক্ষা করবে, তারপর রাগ করে খাবেই না, তারপর দুশ্চিন্তা শুরু করবে, আর সারা রাত জেগে জেগেই ভোর করে দেবে। মানুষের সমস্যা ও অসুবিধা আর ঝঞ্ঝাটের কিছুই বুঝবে না, অথচ রাগ করবে, তাকেই বলে স্ত্রী।

আচমকা একটা চাঞ্চল্য, যেন পোড়া স্টেশনের চেহারাটাই হঠাৎ ছটফট করে উঠেছে। এখানে-ওখানে জটলা বেঁধে যে-সব যাত্রী বসেছিল, তারা প্রায় এক সঙ্গে উঠে পরমুহূর্তে নানা দিকে ছুটে চলে গেল। খেতের আলের উপর দিয়ে, মাঠের উপর দিয়ে, আর কেউ বা আকাটা ভুট্টার শুকনো-মরা ঝোপঝাপের ভিতর দিয়ে।

স্টেশন মাস্টার আস্তে আস্তে উঠে এসে বিজনের মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর দুচোখের চাহনিকে একেবারে উত্তপ্ত করে দিয়ে ধমক দেন, "কী জনাব? এখানে কি মরবার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন?"

একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেও সুলেখা সরকার স্টেশন মাস্টারের এই বিচিত্র ধমক শুনতে পায়। শঙ্কিত ভাবে এগিয়ে আসে সুলেখা। স্টেশন মাস্টার বলেন, "আপনাকেও বলছি, শিগগির এখান থেকে সরে পড়ুন।"

"কেন? কিসের বিপদ?"

'আসছে পিউনিটিভ পুলিস, তাদের পিছনে আসছে টমি আর টমিগান। দানাপুর ক্যান্টনমেন্টের সেই খুনে চেশায়ারকে এই দিকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

বিজন বলে, "কিন্তু আমি ত কোন পোলিটিক্যাল নই।"

সুলেখা ব্যস্তভাবে বলে, "আমিও নই।"

"কে ওসব শুনবে আর বুঝবে বলুন? আপনি গ্রেপ্তার হবেন, আর আপনিও গ্রেপ্তার হবেন। হাঙ্গামার লীডার বলে আপনাদের দুজনকেই ওরা সন্দেহ করবে।"

ভয়ে সুলেখার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়, আর বিজন তার গম্ভীর চোখ ধোঁয়াটে করে ভাবতে থাকে।

চেঁচিয়ে ওঠে সুলেখা, "কিন্তু যাব কোথায়? ট্রেন নেই, ঘর নেই, এক গেলাস জলও নেই···একটা কুলি পর্যন্ত নেই।"

বিজন বলে, "তার চেয়ে গ্রেপ্তার হওয়াই ভাল।"

সুলেখা ভ্রুকুটি করে, "বাঃ, বেশ কথা বললেন! আপনি পুরুষ মানুষ, আপনার পক্ষে যতটা সহজে গ্রেপ্তার সহ্য করা সম্ভব, আমার পক্ষে কি··· ।"

"না, আপনাকে গ্রেপ্তার হতে আমি বলছি না।"

স্টেশন মাস্টার বলেন, "দেখুন, আপনারা যদি রাজী থাকেন, তবে আমিই পুলিসকে একটা মিথ্যা কথা বলে দিতে পারি, যার ফলে আপনারা দুজনেই রেহাই পাবেন, আর এখান থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে ইনস্পেকশন বাংলোতে অন্তত আজকের দিন আর রাতটা থাকবার পারমিট পেয়ে যাবেন।"

সুলেখা বলে, "কাইণ্ডলি তাই করুন মাস্টার মশাই।"

গঙ্গার কিনারায় অনেকক্ষণ আগেই কয়েকটা স্টীম লঞ্চের ধোঁয়া দেখা গিয়েছিল। তারপর দেখা গিয়েছিল, বালিয়াড়ির উপর দিয়ে যেন একটা ধুলোর আঁধি স্টেশনের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। এখন দেখা যায়, বন্দুকধারী দেশী পুলিসের একটা দল, এবং তাদের পিছনে টমিগান আর রাইফেল নিয়ে লালমুখো গোরা পল্টনের তিনটে ঝাঁক মার্চ করে আসছে।

স্টেশন মাস্টার বলেন, "ওরা আজকের সারা দিন আর রাত এখানেই ক্যাম্প করবে। কী যে কাণ্ড হবে ভগবান জানেন!"

"খুব বেশী ভয়ের ব্যাপার হবে বোধ হয়।"

"তা আর বলতে! তবে এই তল্লাটের সব গাঁয়ের মেয়েরা দূর গাঁয়ে পালিয়ে গিয়েছে, এই যা রক্ষা।"

শিউরে ওঠে সুলেখা সরকারের গলার স্বর, "আপনি আমার অবস্থাটা ভেবে দেখুন মাস্টার মশাই।"

"আমি ভেবেছি বলেই ত মনে মনে একটা মিথ্যে কথা ঠিক করে রেখেছি। ঘাবড়াবেন না।"

বিজন বলে, "আর আমার কথাটাও একটু....।'

"ভেবেছি, আপনাদের দুজনের কথাই ভেবেছি। ঘাবড়াবেন না। এই আজকের দিন আর রাতটা কোনমতে যদি ইনস্পেকশন বাংলোতে একটা ঠাঁই পেয়ে যান, তাহলে কালকের জন্য আর চিন্তা নেই।"

"কাল ট্রেন পাওয়া যাবে ত?"

"পাবেন, কাল সকাল দশটাতেই পাবেন। ম্যাজিস্ট্রেট নিজে সামনে দাঁড়িয়ে লাইন মেরামত তদারক করছেন।"

পুলিসের দলটা স্টেশনের কাছে এসে পড়েছে। স্টেশন মাস্টার ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করেন, "আপনারা বোধহয় কেউ কারও আত্মীয় নন?"

সুলেখা আর বিজন একসঙ্গে উত্তর দেয়, "না।"

"আপনাদের মধ্যে কোন চেনাচেনিও বোধহয় আগে ছিল না?"

সুলেখা ও বিজন একসঙ্গে উত্তর দেয়, "না।"

পুলিসের দল প্ল্যাটফর্মের উপর উঠে ঝুপ ঝুপ করে বন্দুক রাখে। শত শত ধুলোমাখা শক্ত বুট মচমচ খটখট করে। প্ল্যাটফর্মটাই থরথর করতে থাকে। গ্যাঁট গ্যাঁট করে একজন পুলিস অফিসার বিজন বসু আর সুলেখা সরকারের কাছে এগিয়ে এসে চ্যালেঞ্জ করেন, "কাঁহাসে আতা, কাঁহা যানা; কৌন হ্যায় আপলোগ?"

স্টেশন মাস্টার বলেন, "স্ট্র্যাণ্ডেড প্যাসেঞ্জার, হাসব্যাণ্ড এণ্ড ওয়াইফ।"

চমকে ওঠে সুলেখা। চমকে ওঠে বিজন। এবং চমকে উঠলেও দুজনেই চুপ করে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে। স্টেশন মাস্টারের ডাহা মিথ্যা কথাটা

যেন আচমকা একটা বিশ্রী বিস্ময়ের আঘাত দিয়ে দুজনকেই ক্ষণিকের মত বোবা করে দিয়েছে।

স্টেশন মাস্টার বলেন, "এদের জন্য একটা পারমিট লিখে দিন মিস্টার অফিসার, যাতে অন্তত চব্বিশ ঘণ্টা এঁরা একবালপুর বাংলোতে থাকতে পারেন।"

পুলিস অফিসার ভ্রূকুটি করেন, "সো নেহি হো সক্তা।" ইনস্পেকশন বাংলোতে এখন জোর সিকিউরিটি চলছে। কাল সকালেই ম্যাজিস্ট্রেট এসে ওখানে থাকবেন। একেবারে অজানা অচেনা লোককে ওখানে···।"

স্টেশন মাস্টার অনায়াসে আবার একটা ডাহা মিথ্যাকে এক গাল হেসে গলিয়ে দিলেন, "এরা আমার জানা লোক, ভেরী ইনোসেণ্ট, পিওর নন-পেট্রিয়ট।"

সামান্য একটু ভেবে নিয়েই বুক-পকেটের বই থেকে পারমিটের ফর্ম বের করেন অফিসার, "নাম বলুন।"

"বিজনকুমার বসু।"

"ফর মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস বসু।" পারমিট সই করলেন অফিসার এবং স্টেশন মাস্টারই সেই পারমিট হাতে লুফে নিয়ে ধন্যবাদ জানালেন, "মেনি মেনি থ্যাংকস সার।"

চেশায়ারের ঝাঁক তখন লাল মুখ আর মদো চোখ নিয়ে তীব্র শিসের উল্লাস ছড়াতে ছড়াতে প্ল্যাটফর্মের কাছে এসে পড়েছে। স্টেশন মাস্টার বিজনের হাতে পারমিটটা গুঁজে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন, "এইবার শিগগির সরে পড়ুন।"

সুলেখা বলে, "আমার এই জিনিষপত্র···।"

স্টেশন মাস্টার উত্তর দেন "সরি ম্যাডাম, কুলি পাওয়া যাবে না।"

বিজন বলে, "আর দরকার নেই কুলির। আপনি শুধু একটা বাক্স হাতে নিন, আর বাকিগুলো···।"

স্টেশন মাস্টার বলেন, "ঐ দেখুন, ঐ যে সোজা একবালপুর যাবার রাস্তা।"

সুলেখার হাতে ছোট একটি বাক্স। বিজনের কাঁধে দুটো বেডিং আর হাতে একটা বাক্স।

প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে পথের উপর এসে পড়তেই হাঁপাতে হাঁপাতে হেসে ফেলে বিজন। হেসে ফেলে সুলেখা।

বিজন বলে, "দেখলেন ত, বিপদে পড়লে মানুষের কী দশা হয়!"

"খুব দেখছি। জীবনে কখনও এমন বিপদে পড়িনি।"

"বাংলোতে একবার পৌঁছতে পারলে বাঁচি।"

"হ্যাঁ, কম নয় ত, পুরো আধ মাইল পথ! তবু, হেঁটে গড়িয়ে কোন মতে পার হতে পারলেই বিপদ কেটে যায়।"

সুলেখা আবার হেসে ফেলে, বিজনও দম টেনে হাসে। যাবার ট্রেন নেই, থাকবার আশ্রয় নেই, গ্রেপ্তারের ভয় আছে, পুলিস আর মিলিটারীর হাতে ভয়ংকর অপমানের ভয় আছে, নানাদিকে হাঙ্গামার আগুন আছে, তেষ্টা পেলে জলও পাওয়া যায় না। এই পৃথিবীটাই যেন হঠাৎ দুটি জীবনের উপর নির্মম হয়ে উঠেছে। একই বিপদের গ্রাস থেকে দূরে সরে গিয়ে বাঁচবার জন্য দুজন পথিক একই সঙ্গে চলেছে। চেনা-জানা নেই, আত্মীয়তাও নেই, এই দুটি মানুষের মনে আর মুখে তবু হাসি ফুটে উঠেছে।

বিপদটাই যেন ভয় হারিয়েছে। পথের পাশে বড় বড় বট, ছায়াও যথেষ্ট আছে। ছায়ার কাছে এসে বোঝা নামিয়ে একটু জিরোবার জন্য যখন দাঁড়ায় দুজনে, তখনও কথায় আলাপে আলাপে অবাধ হাসির রোল ঝরে পড়ে।

সুলেখা বলে, "ট্রেনের কামরা থেকে ওই বাক্সটা নামাতে গিয়ে আমার কোমরের কাছে হাড়টা যেন খট করে বেজে উঠল, আর ঘাড়টাও টনটন করে উঠল।"

বিজন সিগারেট ধরায়, "আপনার শিক্ষা যা হক হয়েই গিয়েছে। আমার শিক্ষাটা এইবার শুরু হয়েছে এবং বেশ বোঝাচ্ছে।"

"কী হয়েছে?"

"বাঁ হাতটা মচকে গিয়ে এখন একেবারে টনটন করছে।"

বিপদের ব্যথাকে দুজনে সমান ভাগ করে নিয়েছে। তাই সমবেদনার কোন প্রশ্ন এখানে নেই। সুলেখার কোমরের হাড় খট করে বেজে উঠলেও দুজনে হাসে। আর, বিজনের বাঁ হাতটা মচকে গিয়ে টনটন আরম্ভ করলেও দুজনে হাসে।

একবালপুরের ইনস্পেকশন বাংলো। ফটকের দুপাশে দুটি রোগা ঝাউ আর মাঝখানে দাঁড়িয়ে বন্দুক কাঁধে এক সান্ত্রী। কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে বাংলোর চারটে দিক এঁটে দেওয়া হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটের দুই কেরানি টাইপরাইটার আর ফাইল নিয়ে বারান্দার উপর অফিস বসিয়েছে। দুজন

গোয়েন্দা অফিসার ছুটি কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। পারমিট দেখে মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস বসুকে তাঁরা ভিতরের দিকে ঐ দক্ষিণের ছোট ঘরটিতে জায়গা নেবার অনুমতি দিয়ে দিলেন। ঘরে ঢুকেই সুলেখা সরকার এক গেলাস জল খেয়ে হাঁপ ছাড়ে, আর চায়ের সন্ধানে বিজন বসু কিচেনে গিয়ে খানসামার সঙ্গে কথা বলে ঘরে ফিরে আসে।

দুঃসহ এক অস্বস্তির জ্বালায় চিড়বিড় করে ওঠে সুলেখা সরকারের গলার স্বর আর কথাগুলিও, "আপনি বাইরে যান।"

"কেন ?"

"কেন আবার কী ? কাণ্ডজ্ঞান নেই আপনার ?"

বিজন বসুও ভ্রুকুটি করে তিক্ত স্বরে বলে, "আমার যথেষ্ট কাণ্ডজ্ঞান আছে, আপনার এক বিন্দুও নেই।"

"আপনাকে ভদ্রলোক বলে মনে করেছিলাম, এখন সন্দেহ হচ্ছে··· ।"

"আমারও ভুল ভেঙে গিয়েছে, আমার মনে হয় আপনি একজন···সেইরকম ভয়ানক কিছু হবেন।"

"আপনি বাইরে যাবেন কিনা বলুন, না এইরকম অসভ্যের মত উপদ্রব করবেন ?"

"আপনি বাইরে যাবেন কিনা বলুন, না বেহায়ার মত আমাকে ট্রাব্‌ল্‌ দেবেন ?"

"আমি ত এই ঘরেই থাকব।"

"আমিও ত থাকব।"

"তাহলে পুলিস ডাকতে হয়।"

"আমিই ডেকে আনছি।"

খানসামা এসে একটা বড় খাতা হাতে নিয়ে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সেলাম জানায়, "নাম ও ঠিকানা লিখে দিন সাহেব।"

খাতাটা হাতের কাছে টেনে এনে বিজন বসু কলম তুলতেই খানসামা বলে, "পারমিটের নম্বরটাও নামের পাশে লিখে দেবেন সাহেব।"

পারমিট ? হ্যাঁ, একটা ফর্মে পুলিস অফিসারের সই-করা পারমিট নামে একটা কাগজের টুকরো বিজন বসুর পকেটের মধ্যে এখনও রয়েছে। পারমিটটা যেন গোপন আড়ালে বসে এতক্ষণ ধরে সুলেখা আর বিজনের এই তিক্ত তপ্ত ও রূঢ় ঝগড়া, এবং ঘৃণা ও সন্দেহের তেজ আর মেজাজগুলিকে

চুপ করে দেখছিল, এবং ঠিক বিটপুরের সেই স্টেশন মাস্টারের মত মুখ করে মাঝে মাঝে এক গাল হাসি হাসছিল। ওই পারমিট এই সংসারের একটা ডাহা মিথ্যার হুকুমনামা। তবু বিজন বসু আর সুলেখা সরকার নামে দুটি বিপন্ন জীবনকে বাঁচিয়ে দিয়েছে আর আশ্রয় জুটিয়ে দিয়েছে ওই পারমিট।

ঢালাও অর্ডার দিয়েছেন ম্যাজিস্ট্রেট—স্টেশনে, ধর্মশালায়, রেল লাইনের পাশে, হোটেলে এবং সরাই-এ, যাকে দেখবে তাকে গ্রেপ্তার করা চাই। কোন ওজর গ্রাহ্য করা হবে না। রেহাই পেতে পারে শুধু তারা, যাদের সঙ্গে মেয়েছেলে থাকবে। তা-ও আবার যে-কোন ছেলেমেয়ে হলে চলবে না। শুধু আপন মা আর আপন স্ত্রী। তা-ও আবার পুলিশের জানা কোন বিশেষ ব্যক্তির কনফারমেশন থাকা চাই যে, সত্যিই আপন মা আর আপন স্ত্রী। নইলে পুরুষ আর স্ত্রীলোক, দুজনকেই গ্রেপ্তার করতে হবে।

নীরবে ম্যাজিকের কলের মানুষের মত কলম চালিয়ে বাংলোর রেজিস্টারে পরিচয় লিখে সই করে বিজন বসু। বিজন বসু আর মিসেস বিজন বসু। এক বিচিত্র জালিয়াতির দলিল হয়ে গেল এই রেজিস্টার খাতাটা। কিন্তু উপায় নেই, এই মিথ্যা পরিচয়ের পাশে পারমিটের নম্বরটিও বসিয়ে দিতে হয়।

সুলেখা সরকারও বিবর্ণ মুখে খড়ের পুতুলের মত স্তব্ধ হয়ে বসে দেখতে থাকে।

আর, খানসামা চলে যেতেই দুজনেরই মূর্তি দুটো যেন ভয়ে ও লজ্জায় হাঁসফাঁস করতে থাকে। বুঝতে পারে সুলেখা, অন্তত আজকের মত এই ঘর থেকে লোকটাকে তাড়িয়ে দেবার অধিকার নেই। বিপদ কেটে যায়নি। শুরু হল বিপদ; আর এই ত সব চেয়ে কঠোর আর ভয়ানক বিপদ। একটা গোখরো সাপ ঘরে থাকলে এর চেয়ে কম ভয় নিয়ে থাকা যায়। হাত তুলে কপাল টিপে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকে সুলেখা। সুলেখার বুকের ভিতরটা নীরবে আর্তনাদ করে ওঠে, রক্ষা কর।

বিজন বসুর দু চোখের দৃষ্টিটাও শঙ্কিত হয়ে থরথর করে। এই ঘরেই আজ থাকতে হবে। কিন্তু থাকা যে কোন মতেই উচিত নয়। ওই রকম একটা হিংস্র স্বভাবের মেয়েমানুষের এত কাছে চব্বিশটা ঘণ্টা বসে থাকাই যে একটা বিশ্রী বিপদ। যে-কোন মিথ্যা কথা চেঁচিয়ে দিয়ে যে-কোন মুহূর্তে বিজনের জীবনটাকে ভয়ানক অপমানের মামলায় জড়িয়ে দিতে পারে এই রকমেরই মেয়েমানুষ, যে আজ একটা সামান্য স্বার্থের লোভে অনায়াসে

নিজেকে মিসেস বিজন বসু করে দিয়ে এখন কে জানে কোন নতুন মতলবের স্বপ্ন দেখছে। এই বিপদের চেয়ে গ্রেপ্তারের বিপদ আর মিলিটারির হাতে মার খাওয়ার বিপদ যে ভাল ছিল।

সুলেখা বলে, "আপনি একটু বাইরে যান।"

"কেন ?"

"আমি একবার বাক্স খুলব।"

ব্যস্তভাবে এবং একটা সন্দেহে চমকে উঠে নিজেরই গায়ের পাঞ্জাবির পকেটে হাত দেয় বিজন। নিশ্চিন্ত হয়; না, চাবিটা ঠিকই আছে, চুরি হয়নি।

দুটি চামড়ার বাক্স আর দুটি বেডিং তখন মেজের উপর জড়াজড়ি করে পড়ে ছিল। বিজন উঠে গিয়ে নিজের বাক্সটাকে টেনে একপাশে সরিয়ে দেয়, বাক্সের তালা বন্ধ আছে কিনা দেখে নিয়ে তারপর ঘরের বাইরে চলে যায়।

সুলেখা উঠে এসে দরজা বন্ধ করে, এবং পনর মিনিট পরে ঘরের দরজা খোলা দেখতে পেয়ে ব্যস্তভাবে উদ্বিগ্ন চোখ নিয়ে ঘরের ভিতরে এসে ঢোকে বিজন এবং নিজের বাক্সটার দিকে তাকিয়ে বলে, "আপনি একটু বাইরে যান"

সুলেখার চেহারাটা বদলে গিয়েছে। এবং ঘরের ভিতরের চেহারাটাও। ক্যাম্পখাটের উপর একটা নিংড়ানো ভিজে শাড়ি স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। পাশের স্নানের ঘরের ভিতর থেকে সাবানের গন্ধ এসে এই ঘরের ভিতরেও ছড়িয়েছে। যে নতুন একটা নীল রংএর তাঁতের শাড়ি পরেছে সুলেখা, তারও একটা গন্ধ আর খসখস শব্দ ঘরের মধ্যে ফিসফিস করছে। সুলেখার হাতে মাঝারি সাইজের একট ভেলভেটের বাক্স। দেখেই মনে পড়ে বিজনের, অণিমারও ঐ রকমের একটা ভেলভেটের বাক্স আছে, যে-বাক্সে অণিমার তোলা গয়নাগুলি থাকে।

ভেলভেটের বাক্সটাকে হাতে নিয়ে আঁচলের আড়াল করে ঘরের বাইরে বারান্দার উপর গিয়ে দাঁড়ায় সুলেখা। ঘরের ভিতরে দাঁড়িয়ে সাজ বদল করে বিজন। বাক্সের ভিতর থেকে করকরে নোটের তাড়া বের করে গুনতে থাকে। সাত শ নব্বই টাকা, ঠিকই আছে। চাবি দিয়ে বাক্স বন্ধ করেই ঘরের দরজা খুলে দেয় বিজন।

সুলেখা এসে ঘরে ঢুকেই নিজের বাক্সের দিকে তাকায়, তার পরে বিজনের

দিকে একবার তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নেয়। স্থলেখার চোখের দৃষ্টিটা যেন একটা বিরক্তি সহ্য করছে। আঃ, যেন বরযাত্রী যাচ্ছে, লোকটা সিল্কের পাঞ্জাবি আর ফরাসডাঙ্গা ধুতি পরেছে!

চব্বিশ ঘণ্টার জন্য পারমিট, তার মধ্যে ছটি ঘণ্টা এরই মধ্যে পার হয়ে গিয়েছে। রাতটা ভোর হতে আরও বার ঘণ্টা। তা হলে দাঁড়াল গিয়ে আঠার ঘণ্টা। তারপর আর ছ ঘণ্টার বেশী নয়; পারমিটের মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে এবং এই কুৎসিত বিপদের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে দুজনেরই প্রাণ। স্টেশন মাস্টার বলেছেন, সকাল দশটাতেই নতুন ট্রেন চলতে শুরু করবে।

খানসামা মাঝে মাঝে দরজার কাছে আসে, ভিতরে ঢুকে খাবার দিয়ে চলে যায়। দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শুধু এই চাঞ্চল্য ছাড়া ঘরের মধ্যে আর কোন চাঞ্চল্য একটি শব্দও করেনি। মুখ ঘুরিয়ে যে যার চা আর লাঞ্চ ঘরের দুই দিকে দুই ভিন্ন টেবিলের কাছে বসে খেয়েছে। ভয় ঘৃণা সন্দেহ আর অস্বস্তির দুটি মূর্তি একেবারে বোবা হয়ে এই ছ ঘণ্টার নির্বাসন সহ্য করেছে!

আরও ভয়ানক তীব্র ভয় ঘৃণা সন্দেহ আর অস্বস্তি নিয়ে ঘনিয়ে উঠল রাতটা। পারমিটের ডাহা মিথ্যার শাসনে দুজনের কেউ ঘর থেকে বাইরে ছুটে যেতে পারে না। দরজাটা ভেজিয়ে রাখতেও হয়। ঘরের ভিতর একটি মাত্র ক্যাম্পখাট, কী কদর্য একটা ঠাট্টা!

ঘরে সারারাত আলো জ্বলে; চেয়ারের উপর বসে সারারাত ধরে লেস বোনে স্থলেখা। আর, নিজের বাক্সের উপর বসে সারারাত বই পড়ে বিজন।

কাক ডাকে। ভোর হয়। বাংলোর চারদিকে নানারকম গম্ভীর আর তীব্র শব্দের ব্যস্ততা হৈ-হৈ করে ওঠে। ম্যাজিস্ট্রেট এসেছেন। ঘরের দরজার বাইরে বারান্দার উপর এসে হাঁপ ছাড়ে বিজন আর স্থলেখা। সারা রাতের নিস্তব্ধতা যেন শ্মশানের ইঁদুরের মত ওদের দুজনের প্রাণের হাড়মাস-গুলিকে কুরে কুরে খেয়েছে।

রোগা ঝাউ-এর মাথায় ভোরের আলো পড়েছে। হেসে ওঠে স্থলেখার ভয়ার্ত মুখটা। বিজনের মুখটাও হঠাৎ হাসি-হাসি হয় সিগারেট ধরায় বিজন।

কথা বলতে গিয়ে হেসে ফেলে স্থলেখা, "আর চার ঘণ্টা পরেই নতুন ট্রেন চলবে।"

বিজন হাসে, "হ্যাঁ, চা খেয়েই আমাদের তৈরি হয়ে যাওয়া উচিত; কী বলেন?"

"নিশ্চয়।"

গোয়েন্দা অফিসার এসে সামনে দাঁড়ান। "আপনারা কী আজকের প্রথম ট্রেনে যাবার জন্য আশা করে আছেন?"

বিজন বলে, "হ্যাঁ।"

গোয়েন্দা অফিসার বলেন, "সে আশা ছেড়ে দিন।"

"কেন?"

"প্রথম ট্রেনে শুধু করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গেরা যাবে।"

"তার মানে?"

"ডোণ্ট ইউ নো, কাল সারা দিন আর রাত ধরে চারটে গ্রামকে কর্ডন দিয়ে দেড় হাজার লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে? ওদেরই আজ প্রথম ট্রেনে চালান করতে হবে।"

"আমাদের কী উপায় হবে?"

"পরের ট্রেনের অপেক্ষায় থাকুন।"

"সে ট্রেন কখন ছাড়বে?"

"আবার কাল সকাল দশটায়।"

সুলেখা আতঙ্কিতের মত বলে, "কিন্তু আমাদের পারমিটে যে আর ছ ঘণ্টার বেশী থাকবার অর্ডার নেই।"

গোয়েন্দা অফিসার কিছুক্ষণ কী যেন ভাবেন। তার পর আশ্বাস দিয়ে বলেন, "আরও চব্বিশ ঘণ্টার জন্য পারমিট আমি দিতে পারি; কিন্তু তার আগে আপনাদের জিনিসপত্র একবার সার্চ করব।"

"করুন।" কথাটা বলেই মনে মনে শিউরে ওঠে বিজন। বাক্সের ভিতরে যে অণিমার লেখা এক গাদা চিঠি আছে। সুলেখার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। বাক্সের ভিতরে শুধু নির্মলেন্দুর চিঠিগুলি নয়, বিয়ের দিনের ফটোটাও আছে—নির্মলেন্দু সরকার আর সুলেখা সরকার। সার্চ করলে যে এই মুহূর্তে ধরা পড়ে যাবে পারমিটের ডাহা মিথ্যা, আর বাংলোর রেজিস্টারে বিজন বসু নামে এই ভদ্রলোকের নিজের হাতে লেখা একটা ভয়ংকর পরিচয়ের জালিয়াতি।

গোয়েন্দা অফিসার পারমিট সই করতে করতে হাসেন, "বুঝতে পেরেছি,

থাক আর বাক্স খুলতে হবে না। আপনাদের জিনিসপত্র সার্চ করে আমার কোন লাভ হবে না। গলার একটি আওয়াজ শুনেই আমরা বুঝতে পারি, কারও বাক্সের ভিতরে সিডিশন রেবেলিয়ন আর কনস্পিরেসির মাল আছে কি না আছে ''

ডাহা মিথ্যেটাই বেঁচে গেল। হাঁপ ছেড়ে আবার হেসে ওঠে সুলেখা। নির্বাসনের আরও চব্বিশ ঘণ্টা মেয়াদ বেড়ে গেল, তবু বিজনের গম্ভীর মুখে নতুন করে হাসি ফুটে ওঠে।

সুলেখা বলে, "ভয় হচ্ছে একটা অসুখে না পড়ে যাই। যা খাওয়া-দাওয়ার ছিরি। আমি ঐ সব আধ সেদ্ধ হাবি-জাবি সহ্য করতে পারি না।"

"ও, তাহলে ত আপনার খুব একটা কষ্ট গেছে।"

"আর আপনার বুঝি খুব একটা আরাম গেছে?"

"মোটেই না, ঘুমোতে না পারলে আমার যে কী দশা হয় জানেন না। আমারও ভয়, ঘুমোতে না পেরেই অসুখে পড়ে যাব।"

"আপনি ঘুমিয়ে নিলেই ত পারতেন।"

"যাক গে, বিপদে পড়লে ত এমনিতেই চোখের ঘুম ছুটে যায়, তার ওপর যদি আবার……।"

বারান্দার উপরে এক টেবিলের দু দিকে দুই চেয়ারে বসে চা খায় বিজন বসু আর সুলেখা সরকার।

বিজন বলে, "যাই এবার; মাঠে মাঠে একটু বেড়িয়ে আসি।"

"বাঃ" চেঁচিয়ে ওঠে সুলেখা, "আমি বুঝি একা এই ঘরে পড়ে থাকব?"

"থাকুন না, এই কিছুক্ষণ। আধঘণ্টারও বেশী হবে না, তার মধ্যেই আমি ফিরে আসছি।"

"আমিও যাব।''

"আপনার না যাওয়াই ভাল। বুঝছেন ত, কী বিশ্রী হাঙ্গামা চলছে; তার ওপর পুলিশ ও মিলিটারি হন্যে হয়ে ছুটোছুটি করছে।"

চলে গেল বিজন। গম্ভীর হয়ে একা ঘরে কিছুক্ষণ বসে থেকেই সুলেখার হাত-পাগুলিও যেন রাগ করে ওঠে। কী বিশ্রী হয়ে রয়েছে ঘরের চেহারাটা! সাবান, চিরুনি, তেল, তোয়ালে, ছাড়া-কাপড়-জামা, লেস আর বই— এলোমেলো হয়ে আবর্জনার মত পড়ে আছে। ঘরের মেঝেতে ধুলো।

ফুলদানিতে ফুল নেই। টুকটাক করে হাত চালিয়ে ঘরটাকে সুশ্রী করে তুলতে থাকে সুলেখা।

এ কী? ভদ্রলোকের সত্যিই কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। বাক্সটার তালা খোলা হয়ে পড়ে আছে। সার্চ করবার কথা শুনে সেই যে বাক্সটা খুলেছিলেন ভদ্রলোক, তার পর বন্ধ করতে ভুলেই গেছেন।

আঃ, কত দেরি করছেন ভদ্রলোক! এক ঘণ্টাও যে পার হয়ে গিয়েছে। পুলিস আর মিলিটারি হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু ভদ্রলোক বোধহয় মনে করেছেন, ওঁকে বুঝি মুখ দেখেই ওরা ছেড়ে দেবে।

পুরো দুটি ঘণ্টা কোথায় কোন মাঠের কোন বটের ছায়ায় ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে যখন বাংলোর ঘরের কাছে এসে দাঁড়ায় বিজন, তখন সুলেখার রাগ চরমে উঠে বসে আছে। "আপনার সত্যিই কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই।"

"কী হল?"

"আমি ত ভেবে কোন কূল কিনারা পাচ্ছিলাম না। মানুষটা গ্রেপ্তার হল, না অন্য কোন বিপদে পড়ল।"

"যাক, আপনি খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়েছেন ত?"

"তার মানে?"

"এটা আপনি কিন্তু খুবই অন্যায় করলেন; আমার অপেক্ষায় না থেকে খেয়ে নিলে ভাল করতেন।"

খানসামা খাবার নিয়ে আসে। কিন্তু খাবার খেতে বোধহয় আরও দেরি করতে চায় সুলেখা। সুলেখা বলে, "আপনি আগে খেয়ে নিন।"

খেতে খেতে বিজন বলে, "আপনি এত কাশছেন কেন? খুব ঠাণ্ডা লাগিয়েছেন বোধহয়।"

"হ্যাঁ, ঠাণ্ডা একটু লেগেছে।"

"আপনার সঙ্গে গরম আলোয়ান নেই?"

"না।"

"আমার সঙ্গে আছে।"

খাবার পালা শেষ হবার পর আবার লেস ধরে সুলেখা, আর বইএর পাতা খোলে বিজন; কিন্তু সুলেখার লেস-বোনা একটা ঘরও এগোয় না, আর বিজনের বই-পড়া একটা পাতাও এগোয় না। বাংলোর এই ছোট ঘরটা যেন ছোট নদীর বুকের মত কলস্বরে বাজতে থাকে। গল্প করে

সুলেখা আর বিজন, সেই সঙ্গে গল্পের কথাগুলিও নানা বিস্ময়ের ছোঁয়ায় মাঝে মাঝে হেসে ওঠে আর হাসিয়ে দেয়।

সুলেখা বলে, "ডাক্তার আমাকে ঘুমের ওষুধ খেতে বলেছে, কিন্তু আমি গ্রাহ্যই করি না। এই রকমই দিন-রাত বকবক করে বাড়ির মানুষকে জ্বালাই।"

বিজন বলে, "আমি ঘুম ছুটিয়ে দেবার ওষুধ খুঁজছি। কিন্তু ওষুধ পাই না। এদিকে অফিসের কাগজ-পত্রের ফাইল টেবিলের উপর জমে পাহাড় হয়ে উঠেছে। কাজ শেষ করবার সময়ই পাই না।"

সন্ধ্যার আঁধার দেখা দিতে থাকে। আর পাঁচ ঘণ্টা এবং তার পাঁচ ঘণ্টার পর চারিদিকের নিরেট অন্ধকারের ভারে স্তব্ধ হয়ে গেল রাতটা।

কিন্তু সুলেখার চোখে কোন আতঙ্ক আর ভয় নেই। বিজনের চোখেও কোন সন্দেহ আর ঘৃণা নেই। সেই দুঃসহ অস্বস্তিও যেন সব জ্বালা হারিয়ে এবং একটু লজ্জা পেয়ে কোমল হয়ে গিয়েছে। ঐ ভদ্রলোককে ভয় করবার কিছু নেই। ঐ মহিলাকেও ভয় করবার কিছু নেই। আজ ওরা কেউ কারও বিপদ নয়। রাতটা এত স্তব্ধ হয়ে গেলেও একেবারে বিপদহীন হয়ে গিয়েছে।

বিজন বলে, "আমার একটা অনুরোধ শুনুন। আপনি বড্ড কাশছেন। আমার এই আলোয়ানটা কাছে রাখুন।"

সুলেখা চেঁচিয়ে ওঠে, "আপনি কি আজও সারা রাত বই পড়ে কাটাবেন? অসুখের ভয়টা কি ভুলেই গেলেন?"

"না, আমি মেঝের উপরেই বেডিং খুলে গড়িয়ে পড়ব। আমার জন্য ভাববেন না। কিন্তু......আপনি......ওকি, আপনি কী খাটের উপর শুধু বসে থেকে আর লেস বুনেই রাত কাটাবেন?"

সুলেখা হাসে, "বলেছি ত, আমার ঘুম সহজে আসে না। আপনি ভাববেন না। না ঘুমোলে আমার একটুও কষ্ট হয় না।......ওকি, আপনার হাতে কী হয়েছে?"

বিজন হাসে, "এই ত, সেই বাঁ হাতটা, স্টেশন থেকে তিনটে বোঝা টেনে আনতে গিয়ে মচকে গিয়েছিল, মনে নেই?"

"খুব ব্যথা করছে?"

"খুব নয়; তবে নাড়তে পারছি না।"

ক্যাম্প খাটের উপর সুলেখার বাঁধা বেডিংটা এক দিকে পড়ে রয়েছে, তার উপর ওই ভদ্রলোকেরই গরম আলোয়ানটা পড়ে আছে। চুপ করে একমনে লেস বোনে সুলেখা, আর মাঝে মাঝে ঘরের আলোর দিকে এক জোড়া নিশ্চিন্ত চোখের আলো ছড়িয়ে দিয়ে ভাবে, এইরকম অদ্ভুত দশাতেও মানুষ পড়ে!

ঘরের খোলা জানালা দিয়ে হু হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছে। আলোয়ানটার দিকে না তাকিয়ে শাড়ির আঁচল দিয়ে গলা জড়ায় সুলেখা।

কে জানে কত রাত হল? ভোর হতে আর কতক্ষণ? মেঝের উপর টান হয়ে শুয়ে রয়েছেন ভদ্রলোক। মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা হাওয়ায় শিউরে কুঁকড়ে যাচ্ছে ভদ্রলোকের ঘুমন্ত শরীরটা।

কী বিশ্রী অস্বস্তি। সুলেখার বুকের ভিতর থেকে যেন সব নিশ্চিন্ত নিঃশ্বাসের বাতাস ঠেলে উপরে উঠতে চাইছে একটা বিপদ। থর থর করে কেঁপে ওঠে সুলেখার হাতটা। ঘুমিয়ে আছেন ভদ্রলোক। কিছুই বুঝতে পারবেন না। আলোয়ানটা তুলে নিয়ে ভদ্রলোকের গায়ে ঢাকা দিয়ে দিলে কেমন হয়?

আলোয়ানটা হাতে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় সুলেখা। কিন্তু এক পা এগিয়ে গিয়েই থমকে দাঁড়ায়।

পর মুহূর্তে পিছিয়ে আসে। ছটফট করে ক্যাম্প খাটের উপর উঠে বসে সুলেখা। আলোয়ানটাকে তেমনি ব্যস্তভাবে খাটেরই একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। চুপ করে লেস বোনে আর কাকের ডাক শোনবার জন্য কান পেতে বসে থাকে সুলেখা।

কাকের ডাক ডেকেছে অনেকক্ষণ। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে বিজন। এবং এই ঘরের ভিতরেই একটা ঘুমন্ত মূর্তির দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে। ঘুমিয়ে পড়েছেন মহিলা, যিনি বলেছিলেন যে তাঁর চোখে ঘুম সহজে আসে না। সহজে কি এসেছে? ভয়ে লজ্জায় ও উদ্বেগে আধমরা হয়ে, আধ-পেটা খেয়ে আর লেস বুনে বুনে ক্লান্ত হয়েছে মানুষটা, তবেই না ঘুমে ঢুলে পড়েছে। ভাবতে লজ্জা পায় ঐ মহিলাকেই কাল রাতে ভয় করেছিল বিজন।

লেসের বোঝা বুকের উপর তুলে আর দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বাঁধা বেডিংএর উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছেন মহিলা। কানের

একটা তুল খুলে গিয়েছে। মনে হয় ঘুমের ঘোরেই চাপাপড়া খোঁপাটাকে এলোমেলো করে দিয়েছেন মহিলা, নইলে একগাদা চুল মহিলার মুখের উপর এভাবে লুটিয়ে পড়বে কেন ?

একটা অস্বস্তি। অস্বস্তিটা যেন অদ্ভুত একটা মায়ার জ্বালায় ছটফট করছে। মহিলার সুন্দর মুখটার উপর যেন কালো সাপের মত একটা উপদ্রব কিলবিল করছে, ওই এলোমেলো হয়ে লুটিয়ে পড়া কতগুলি চুলের গুচ্ছ। জানবে না, বুঝতেই পারবে না মানুষটা; ওর মুখের উপর থেকে ওই লুটিয়ে পড়া এলোমেলো উপদ্রবগুলিকে সরিয়ে দিলে কেমন হয় ?

পা টিপে টিপে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে বিজন। ছিঃ, সেই মুহূর্তে নিজের হাতটার এই বেহায়া তুঃসাহসের লজ্জায় শিউরে উঠে সরে যায়। মনটা উত্তপ্ত হয়ে যেন ধিক্কার দিতে থাকে। ভুল করে আজ নিজেই নিজের বিপদ হয়ে উঠেছে বিজন। সেই মুহূর্তে দরজা খুলে ঘরের বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ায়।

ট্রেন ছাড়বার সময় হয়ে এল। এই ট্রেনই কাটিহার হয়ে পার্বতীপুর চলে যাবে। বিটপুর স্টেশনে লোকের ভিড় দৌড়াদৌড়ি করে। তার উপর বেশ জোরে বৃষ্টি আরম্ভ হয়।

মেয়েদের কামরায় উঠে বসেছে সুলেখা সরকার। এই কামরারই বাইরে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে বিজন। বিজন জায়গা পেয়েছে অন্য একটা কামরায়।

জানালা দিয়ে মুখ বের করে সুলেখা আস্তে আস্তে বলে, "আপনি এবার যান, আপনার কামরায় গিয়ে বসুন, বৃষ্টি পড়ছে যে।"

বিজন বলে, "যাচ্ছি।"

সব বিপদ কেটে গিয়েছে। কোন বিপদের সামান্য আঁচড়ও পড়েনি তুজনের জীবনে। এই মুহূর্তে একেবারে নিরাপদ পথে ছুটে চলে যাবে তুজনেই। কিন্তু, কী আশ্চর্য, এই শেষ দেখা আর শেষ কথা ঠিক হেসে উঠতে পারছে না।

বৃষ্টিটা আরও জোর করে এসেছে। দেখাদেখির মাঝখানে একটা ঝাপসা পর্দা নেমে এসেছে। এইবার দৌড়ে গিয়ে নিজের কামরায়

ঢুকে পড়বে বিজন। ট্রেন চলতেও শুরু করেছে। স্টেশনের ভিড়ের চীৎকারও জোরে বেজে ওঠে। তারই মধ্যে বেজে ওঠে দুজনের দুটি শেষ কথা।

বিজন বলে, "জানালা থেকে সরে বস, আর মাফলারটা ভাল করে গলায় জড়িয়ে নাও।"

সুলেখা বলে, "হাতের ব্যথাটাকে তুচ্ছ কর না। বাড়িতে পৌঁছেই গরম জলের সেঁক দিয়ে……।"

ঠগের ঘর

ওখানে আলিপুরের আদালতের কাছে পথের উপর একটি বটের ছায়া। আর এখানে বেহালার এক বস্তির মধ্যে একটি মাটির ঘরের দরজার কাছে একটি তুলসীর বেদী।

রোজ যেমন, আজও তেমনিই ঐ তুলসীর বেদীতে একবার মাথা ঠেকিয়ে কাজে বের হয়ে গিয়েছে রাইচরণ। কাজের মধ্যে হল ওই এক কাজ। এতদূর পথ হেঁটে এসে আদালতের কাছে এই বটের ছায়ায় চুপ করে বসে থাকা।

রাইচরণের হাতের কাছে থাকে একটি হস্তরেখা বিচার, অনেকগুলি কড়ি, আর একটি চার-আনা দামের পঞ্জিকা। চোখের সামনে মাটির উপর পাতা থাকে দাবার ছকের মত একটি ছক। সেই ছকের মধ্যে নানা রকম অঙ্ক কিলবিল করে। কোথায় শনি, কোথায় রাহু আর কোথায় মঙ্গল অবস্থান করলে অদৃষ্ট-চক্রের কোথায় কী যে ঘটে যাবে, তার সব উত্তর ওই একটি ছকের মধ্যে নীরব হয়ে রয়েছে। একবার কেউ এসে রাইচরণের চোখের কাছে হাতটা এগিয়ে দিলেই হয়; কেউ এসে শুধু তার রাশিটার নাম বলে দিতে পারলেই হয়; রাইচরণ তখনি একটি শ্লেটের উপর খাড় দিয়ে দেগে অঙ্ক করে তার জীবনের অবধারিত পরিণাম, আসন্ন পরিণামের আভাস এবং আরও অনেক কিছু বলে দেবে।

মানুষের কররেখা আর কপালরেখা দেখে এমন কি স্বপ্নের একটা বর্ণনা শুনেও রাইচরণ ভবিষ্যতের অনেক ভালমন্দ সম্ভাবনার কথা বলে দিতে পারে। বেতের খাঁচার মধ্যে একটা তোতা আছে। এই তোতার কেরামতিও অসাধারণ। মামলায় জিত হবে কি হবে না? হ্যাঁ কিংবা না? এক আনা পয়সা রেখে জিজ্ঞাসু ব্যক্তি রাইচরণের সামনে চুপ করে বসে থাকে। একটি কাগজে 'হ্যাঁ,' এবং একটি কাগজে 'না' লিখে দুটি কাগজকেই মুড়ে দুটি পুরিয়া করে ফেলে রাইচরণ। তার পর এইরকমই শুধু সাদা কাগজের

আরও অনেকগুলি পুরিয়ার সঙ্গে 'হ্যাঁ' ও 'না' কে মিশিয়ে দিয়ে তোতার সামনে ফেলে দেয়। তোতার কানে একটা কড়ি কিছুক্ষণ ছুঁইয়ে রাখে রাইচরণ; তার পরেই বিড় বিড় করে, "দেবীর আজ্ঞা, দেবতার আজ্ঞা, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের আজ্ঞা। ছুঁয়ে ফেল ছুঁয়ে ফেল, নিয়তির পাখি!"

তোতাটা এতগুলি কাগজের পুরিয়া নেড়ে চেড়ে ঠিক একটি পুরিয়া ঠোঁট দিয়ে কামড়ে ধরে, হ্যাঁ কিংবা না। 'হ্যাঁ' দেখে খুশী হয় জিজ্ঞাসু, 'না' দেখে বিমর্ষ হয়।

স্কুলের ছেলে চুপি চুপি এসে জানতে চায়, পরীক্ষায় পাস আছে না ফেল আছে? রাইচরণ বলে, "তিনটি ফুলের নাম বল।" ফুলের নাম শুনেই রাইচরণ বলে দেয়, "পাস"। স্কুলের ছেলে খুশী হয়ে দুটো পয়সা রাইচরণের হাতে তুলে দিয়ে চলে যায়।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বেশির ভাগ সময় শুধু বসে বসে ঝিমোতে হয়। পথের উপর দিয়ে মাঝে মাঝে ভিড় যেন স্রোতের মত গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যায়। কিন্তু এই বিপুল জনতার ভিতর থেকে কজনই বা অদৃষ্টের কথা জেনে নেবার জন্য ব্যস্ত হয়? দু পয়সা থেকে দু আনা, এই তো গণনার দক্ষিণা। সন্ধ্যা হলে যখন পয়সা গোনে রাইচরণ, তখন বুকের ভেতরটা ভয়ে শিরশির করে ওঠে। মাত্র তের আনা! কী করে দিন চলবে?

বটের ছায়ায় বসে বসে যেমন জীবনটা তেমনই চেহারাটাও ঐ বটের ঝুরির মত শীর্ণ আর রুক্ষ হয়ে গিয়েছে। রাইচরণের চেহারাটা ফরসা, মুখটা সাদা কাগজের মুখোশ বলে মনে হয়। আস্তে আস্তে এক একবার উঠে শরীরটা টান করে আর হাই তোলে রাইচরণ। সেই সময় ওর ছেঁড়া গেঞ্জি ভেদ করে বুকের পাঁজরগুলি কাঁটার মত যেন ফুটে বের হয়।

মাঝে মাঝে দেখা যায়, একটু ফাঁকা পেয়ে আর গণৎকার রাইচরণকে একলা পেয়ে কেউ কেউ একাই এগিয়ে আসে। এদিক-ওদিক তাকায়। তারপর বলে, "একটা কথা একটু গুনে বলে দেবেন ঠাকুর মশাই?"

"কী?"

"ভালবাসার মানুষটা ঠকাবে না ত?"

"কতদিনের ভালবাসা?"

"তা মন্দ দিনের নয়। এই ধরুন এক বছর।"

"সধবা কুমারী না বিধবা ?"

"বিধবা।"

"নামের প্রথম অক্ষরটা বলুন।"

"প"

একটু ভেবে নিয়ে রাইচরণ বলে, "যদি দু আনা দেন তবে নখদর্পণ করে বলে দিতে পারি।"

দু আনা পয়সা বের করে রাইচরণের হাতের কাছে রেখে দেয় জিজ্ঞাসু লোকটা। রাইচরণও লোকটার হাত কাছে টেনে নিয়ে তার একটা আঙুলের নখের উপর কড়ি ঘষে। তার পর নখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে। তারপরেই খুশী হয়ে বলে, "হাসছেই ত দেখলাম।"

"তার মানে ?"

"তার মানে ঠকাবে না।"

অন্যদিনের মত আজও বটের ছায়ায় মাঝে মাঝে ব্যস্ত হয়ে ওঠে রাইচরণের গণৎকারিতা। ক্লান্ত হয়ে মাঝে মাঝে ছোলা চিবোয়, আর সামনের টিউবওয়েল থেকে জল খেয়ে আসে।

রাইচরণের বয়স মন্দ হয়নি। চল্লিশ বছর ত নিশ্চয়। কিন্তু এত বেশী শুকিয়ে আর পাকিয়ে গিয়েছে বলেই একটু বুড়ো-বুড়ো দেখায়। কিন্তু এই বটের ছায়া থেকে অনেক দূরে বেহালার বস্তির মেটে ঘরের দরজার সামনে তুলসীর বেদীর কাছে যে এখন গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেই মানুষটির চেহারা কিন্তু আজও তাজা মাধবীলতার মত ফুরফুর করে।

রাইচরণের বউ পারুলবালা। যে রাইচরণ গণৎকার আকাশের রাহু শনি মঙ্গলের মতিগতির রহস্য হাতের মুঠোয় ধরে রেখেছে, সে আজ এই বটের ছায়ায় বসে কোন তন্দ্রার মধ্যে এখনও চমকে ওঠেনি। কিন্তু এতক্ষণে বেহালার বস্তির মধ্যে সেই মেটে ঘরের ভিতরে গণৎকার রাইচরণের অদৃষ্টটাই ভয় পেয়ে চমকে উঠেছে।

দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে মণিবাবু নামে এক ব্যক্তি, যে আজ এই তিন মাস ধরে রোজই রাতে একবার এসে রাইচরণের সঙ্গে তাস খেলে চলে যায়। বড় ফিটফাট চেহারা মণিবাবুর, মানুষটিও বেশ শৌখিন। হারমনিয়ম মেরামতীর কাজ জানে, মন্দ রোজগারও করে না। নইলে এক মাস ঘনিষ্ঠতা হতেই পারুলবালাকে এমন সুন্দর একটি রেশমী শাড়ি উপহার দেয় কেমন

করে? রাইচরণ নিজেও শাড়ি দেখে খুশী হয়ে বলেছিল, "বাঃ, বেশ চমৎকার!"

সেই মণিবাবু বেশ একটু গম্ভীর, এবং বেশ একটু ব্যস্ত ভাবেই বলে, "আর দেরি করে লাভ নেই।"

পারুলবালা বলে, "তুমিই ত আসতে অনেক দেরি করে দিলে। আমি ত ভেবেই মরছিলুম, এ আবার কোন এক নতুন ঠগের পাল্লায় পড়লুম।"

রাইচরণকে আজ ঠগ বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে পারছে পারুল, এবং মনে হয়েছে, এই পৃথিবীর মধ্যে মণিবাবুই একমাত্র মানুষ, যে কখনই ঠগ হতে পারে না, এবং কোন দিনও হবে না।

জ্যোতিষ বিদ্যার কারবার করি, কত রাজা-মহারাজা আমার খদ্দের, কলকাতার বাসায় ঠাকুর-চাকর আছে, এই রকম একটি অতি স্বচ্ছল অবস্থার মানুষ বলে নিজের পরিচয় দিয়ে, পারুল নামে একটি সুন্দরী মেয়েকে এক গেঁয়ো মামাবাড়ির দাসীপনা থেকে উদ্ধার করেছিল যে, সে হল ওই রাইচরণ। আজ পারুলবালা দাঁতে দাঁত চিবিয়ে ভাবে, সেই নির্দয় মামাবাড়ির দাসীপনা তবু ভাল ছিল। কিন্তু এ কী সর্বনাশ করল লোকটা! মিথ্যে কথা বলে পারুলেরও মন ভিজিয়ে দিয়ে, অনেক ভালবাসার কথা বকে বকে পারুলের মনের ভিতরটাকে একেবারে এলোমেলো করে দিয়ে তার পর সত্যিই অগ্নি সাক্ষী করে বিয়ে করে নিয়ে এসে আজ এ কোন দশার মধ্যে পারুলের জীবনটাকে ঠেলে নিয়ে এসেছে রাইচরণ ঠগ?

রাইচরণকে সহ্য করেছে শুধু, ক্ষমা করতে পারেনি পারুল। সব মিথ্যা, সব মিথ্যা। লোকটার শুধু চেহারাটাই দেখতে ভাল ছিল, আর কথাগুলি মিষ্টি। তাই দেখে পারুলের মন ভুলেছিল নিশ্চয়। স্বীকার করে পারুল, এবং সেই ভুলের জন্যই ত তার আজ এই দশা। আটটা বছর ধরে একেবারে একটানা হাভাতে জীবন সহ্য করতে হয়েছে। কত মুলুকেই না পারুলকে ঘুরিয়ে মেরেছে লোকটা। বর্ধমান, ধানবাদ, রাঁচি, মুঙ্গের। মানুষের ভাগ্য গুনতে গুনতে ছটফট করে দুনিয়ার চারদিকে যেন ছুটে বেড়িয়েছে লোকটা, তবু বিয়ে করা বউটাকে পেট ভরে ভাত খাওয়াতেও পারেনি। এক-আধটা গয়নার সাধ ত দুঃস্বপ্ন। এমন দিন গিয়েছে, যখন শাড়ির অভাবে ঘরের ভিতরে গামছা পরে বন্ধ থাকতে হয়েছে।

ধানবাদে থাকতে একদিন কষ্ট সহ্য করতে না পেরে ঘরের বাইরে এসে

যেচে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করে আর দুরবস্থার কথা বলে টাকা নিয়েছিল পারুল। আজও মনে পড়ে পারুলের, সেই ভদ্রলোক ঠিক সন্ধ্যা হতেই এসে ঘরের দরজায় কড়া নেড়েছিলেন। চেঁচিয়ে কেঁদে ফেলেছিল পারুল। অনেক মাপ চেয়ে তবে রেহাই পেয়েছিল।

আজ মনে হয়, সেই বাজে কাঁদুনির কোন অর্থ হয় না। সেই ভদ্রলোককে দরজা খুলে দিলে কী এমন খারাপ হত? রাইচরণকে ঘেন্না করতে করতে এ রকম অনেক কথাই অনেকবার মনে হয়েছে। অনেকবার বলেও দিয়েছে ও রকম দু-চারটে কথা। কিন্তু রাইচরণ নির্বিকার।

আজও নির্বিকার মনে অদৃষ্টের একগাদা নোংরা ঝুলি-ঝোলা নিয়ে কোন এক বটের ছায়ার কাছে গিয়ে বসে আছে লোকটা। মিথ্যে কথা বলে লোক ঠকায়। ঠকিয়ে বিয়ে করে। আজ কিন্তু ওর এতদিনের নির্বিকার ঠগিপনার উপর অদৃষ্টের প্রতিশোধ ঘনিয়ে এসেছে। তাই এসেছে মণিবাবু।

এই তিনটা মাস মণিবাবু নামে মানুষটা অনেক মায়া করেছে বলেই পারুলের সাজটা একটু রঙিন হয়েছে। পারুলের মুখের দিকে তাকিয়ে সেদিন মণিবাবুর চোখ জলে ভরে উঠেছিল। আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল পারুল, "আমার কষ্ট দেখলে আপনি কাঁদবেন কেন? আপনি ত আমার কেউ নন।"

মণিবাবু বলেছিল "কেউ নও বলেই ত দুঃখ হচ্ছে পারুল, তাই যতখানি সাধ আছে ততখানি করতে পারছি না।"

সেই একটি সন্ধ্যায় এই তুলসী বেদীর কাছে দাঁড়িয়ে মণিবাবুর কথাগুলি শুনে পারুলবালার বুকের ভিতরটা ধড়-ফড় করে উঠেছিল। কিন্তু তারপর আর নয়।

মণিবাবু বলেছিল, "যতদিন বাঁচি ততদিন দূরে থেকেই তোমাকে ভালবাসব। থাক, তুমি যেমনটি আছ তেমনটিই থাক। আমি যেন তোমাকে শুধু মাঝে মাঝে দেখতে পাই।"

পারুলবালার গলার স্বরটাই বিভোর হয়ে বলে, "মাঝে মাঝে কেন, রোজই দেখে যেও।"

রোজই এসেছে মণিবাবু এবং রাইচরণের সঙ্গে তাস খেলেছে। বাজার করে নিজের হাতে বয়ে নিয়ে এসেছে কপি চিংড়ি আর মুগের ডাল।

পারুলবালা আশ্চর্য হয়ে দেখেছে, আর মনে মনে ঘেন্নায় জ্বলে গিয়েছে; রাইচরণ নির্বিকার মনে সেই কপি-চিংড়ি আর মুগের ডালের রান্না খেয়েছে। বেহায়াটা যেন নিজের রোজগারের জিনিস গর্ব করে খাচ্ছে।

মণিবাবুকে ভাল লাগে। খুব ভাল করে সেজে মণিবাবুর চোখের সামনে দাঁড়াতে ভাল লাগে। মুগ্ধ হয়ে যায় মণিবাবু। কিন্তু দেখতে পায় পারুল, রাইচরণ নামে যে লোকটা স্বামী হয়ে বসে আছে, সেই লোকটা যেন কিছুই দেখতে পায় না।

"আর এভাবে নয় পারুল", যেদিন মণিবাবু পারুলের হাত ধরে এই কথাটা বলে ফেলল, সেদিন পারুলের মনটাও যেন গলে গেল। পারুল বলে, "আমিও বলছি। আর এভাবে পড়ে থাকার কোন মানে হয় না।"

"তাহলে যাবে ?"

"যাব।"

সেই যাবার লগ্ন ঘনিয়ে এসেছে। বেহালার বস্তির ভিতরে একটা মেটে বাড়ির অদৃষ্ট আজ আর কিছুক্ষণ পরেই শূন্য হয়ে যাবে। ব্যস্তভাবে বাক্স সাজাতে থাকে পারুলবালা।

মণিবাবুই দিয়েছে, সেই সব রঙিন শাড়িতে বাক্স ঠাসা। মণিবাবুই দিয়েছে দুটো গয়না, কানের আর গলার। সে-দুটোও বাক্সের ভিতরে আছে। তবে আর সাজবার ও দেরি করবার কী আছে ?

বাক্সের ভিতরে ছেঁড়া-পুরনো আবর্জনার মত অনেক জিনিস আছে' সেগুলি ফেলে দিলে বাক্সটা একটু হাল্কা হয়।

মণিবাবু বলে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, পুরনো যা কিছু আছে সব ফেলে দাও।"

বাক্স উপুড় করে পারুলবালা। পারুলের দুহাতে যেন ডাকাতির নেশা পেয়ে বসেছে। চোখ দুটো ছুরির ফলার মত চকচক করে। নাক আর কান তেতে যেন জ্বলছে, লালচে হয়ে উঠেছে। আট বছরের জীবনের যত ছেঁড়া নোংরা কুৎসিত স্মৃতিকে এখানে ফেলে রেখে দিয়ে চলে যাবার জন্য ছটফট করছে এক নারীর ঘৃণাভরা মন।

হাঁপাতে থাকে পারুল। মণিবাবু বলেন, "কি হল ?"

পারুল বলে, "একটা লাল চেলির জোড় রয়েছে দেখছি।"

মণিবাবু চেঁচিয়ে ওঠে, "ছুঁড়ে ফেলে দাও।"

চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থাকে পারুল। তারপর চেলির জোড়কে

গুছিয়ে পাট করে তাকের উপর রেখে দেয়। হো হো করে হেসে ওঠে মণিবাবু।

আবার বাক্স সাজায় পারুল। মণিবাবুরই দেওয়া যত উপহারের সম্ভার। আয়না, পাউডার, সুগন্ধ তেল, ঢাকাই, টাঙ্গাইল, বিষ্ণুপুরী, আর ধনেখালির রঙিন শাড়ি! কানের দুল আর গলার হার।

"চল এইবার। আর দেরি করা ভাল নয়।" মণিবাবু ব্যস্তভাবে বলে।

পারুলবালার চোখ দুটো নিথর হয়ে শুধু দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপরেই চমকে উঠে ঘরের মেঝেটার দিকে তাকায়। মণিবাবু বিরক্ত হয়ে বলে, "কী হল?"

পারুল বলে, "এইসব ছেঁড়া কাপড়-চোপড় ছড়িয়ে ঘরটাকে বড় বিশ্রী করে দিল যে! কেমন নোংরা দেখাচ্ছে যে।"

হ্যাঁ, দেখে মনে হয়, চোর ঢুকে একটা একলা অসহায় ঘরের বুকটাকে যেন তছনছ করেছে। পারুল বলে, "একটু দাঁড়াও, যাচ্ছিই যখন, তখন ঘরটাকে একটু গুছিয়ে রেখে যাই।"

"কী আশ্চর্য!" চেঁচিয়ে ওঠে মণিবাবু।

ঘর গোছায় পারুলবালা।

এখানে-ওখানে বাসনগুলি পড়ে আছে। ঘটিটা এরই মধ্যে গড়িয়ে একটা ভাঙা টিনের পেঁটরার পিছনে গিয়ে লুকিয়ে পড়েছে। ঘটিটাকে তুলে নিয়ে দরজার পাশে রেখে দেয় পারুল।

মণিবাবু বলে, "যত সব বাজে যাচ্ছেতাই কাজ আবার শুরু করলে কেন পারুল?"

পারুল বলে, "কিছু নয়, কিছু নয়। লোকটা এসে হাত-মুখ ধোবার জন্য ঘটিটা খুঁজে খুঁজে যেন মিছে হয়রান না হয়......তাই..।"

মণিবাবু গম্ভীর হয়, "সন্ধ্যা হয়ে আসছে কিন্তু পারুল।"

পারুল বলে, "এই ত, আমি তৈরী। শুধু একটু...।"

আবার চুপ করে দাঁড়িয়ে কী-যেন ভাবতে থাকে পারুল। একটা ছেঁড়া কামিজ দেয়ালের একটা গোঁজের সঙ্গে ঝুলছে। ময়লা ছেঁড়া কামিজ, তালি ছিল, সেই তালিটাও খুলে গিয়েছে। তালিটাকে সেলাই করে জুড়ে দিতে, আর কামিজটাকে একটু ধুয়ে কেচে রাখতে পারেনি পারুল, ভুলেই গিয়েছে। তাই লোকটা কদিন ধরে শুধু ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে দিয়ে কাজে বের হয়ে যায়।

মণিবাবুর দাঁতে দাঁতে শব্দ হয় যেন, "মনে হচ্ছে, তুমি এখন ওই ছেঁড়া কামিজ সেলাই করতে বসবে।"

যেন একটা খেলা পেয়েছে পারুল। মণিবাবুর দিকে তাকিয়ে মিনতি করে বলে, "একটু দিই না কেন? কতক্ষণই বা সময় লাগবে?"

"বাঃ!" ভ্রুকুটি করে মণিবাবু।

"আচ্ছা থাক। ভয় পেয়ে আর অপ্রস্তুত হয়ে মণিবাবুর মেজাজ শান্ত করবার জন্য পারুল টেনে টেনে হাসতে থাকে, "আমাকে তুমি যতটা বোকা মনে করছ ততটা বোকা আমি নই।"

মণিবাবুও একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে। বাক্সটাকে নিজেই হাতে তুলে নিয়ে বলে, "চলে এস পারুল। বড় রাস্তায় গিয়ে ট্যাক্সি ধরব।"

পারুল বলে, "তুমি বাইরে গিয়ে দাঁড়াও। আমি এক মিনিটের মধ্যেই বের হয়ে আসছি।"

বাক্সটা হাতে নিয়ে দরজা পার হয়ে বাইরের তুলসীর বেদীর কাছে ছায়ান্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে মণিবাবু। পরমুহূর্তেই দেখে চমকে ওঠে, বুঝতে পারে মণিবাবু, ঘরের ভিতর আলো জ্বেলেছে পারুল। উঃ, কত থিয়েটারি ঢং! মণিবাবুর মনের একটা রাগ হঠাৎ আক্ষেপ করে ওঠে।

দাঁড়িয়ে শুধু ছটফট করে মণিবাবু। অনেকক্ষণ ত হল। এখনও আসে না কেন পারুল?

আবার এগিয়ে এসে দরজার কাছে দাঁড়ায় মণিবাবু। আবার চমকে ওঠে, এবং স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে; কিন্তু দেখেও ঠিক বুঝতে পারে না মণিবাবু, এ কী করছে পারুল? উপুড় হয়ে ঘরের মেঝের মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে যেন প্রণাম করে পড়ে রয়েছে পারুল।

"ও কী হচ্ছে?" গর্জনের মত স্বরে, আর দাঁতে দাঁত চিবিয়ে ডাক দেয় মণিবাবু।

প্রণাম নয়, প্রণামের মত একটা ঢং। উনুনটার কাছে মেঝের উপর মাথা পেতে দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে পারুল। উনুনের উপর একটা কড়া। কড়ার মধ্যে শুকনো একটা রুটি আর এক ছিটে রান্না-করা শাক।

আস্তে আস্তে মুখ তোলে পারুল। মণিবাবুর দিকে তাকায়। তার

পরেই পাগলের মত চোখ করে যেন একটা প্রলাপ বিড়বিড় করতে থাকে। "তাহলে লোকটা আজ ঘরে ফিরে এসে খাবে কী মণিবাবু? বলতে গেলে কিছুই যে নেই। ঐ একটা শুকনো রুটি আর...।"

চীৎকার করে ধমক দেয় মণিবাবু, "তুমি কি এখন তাহলে রান্না আরম্ভ করবে হতভাগী মেয়েমানুষ?"

কোন উত্তর দেয় না পারুলবালা।

মাত্র আর এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে মণিবাবু। তার পরেই বাক্সটাকে বেশ শক্ত করে ধরে নিয়ে দরজার দিকে সরে যায়।

চলে যাবার আগে আর একবার চেঁচিয়ে ওঠে মণিবাবু, "তোমার ওই ঠগ সোয়ামির চেয়ে তুমি আরও ভয়ানক ঠগ। ছিঃ।"

সাধারণী

চেহারাটা সাধারণ, নামটা বেশ একটু সাধারণ। আর, যে-বাড়িটাতে থাকে সেই মেয়ে, সেই বাড়িটা বড় বেশী সাধারণ।

সে-মেয়ের বয়সটাও সাধারণ। অর্থাৎ তাকে ঠিক মেয়েটি বলে মনে করা যায় না, আবার একেবারে একজন মহিলা বলে মনে করতেও ইচ্ছা করে না। সে আজ একবছরেরও আগের কথা, প্রথম যেদিন মালতীর সঙ্গে কথা বলেছিল অনিমেষ, সেদিনের সেই প্রথম কথাটি হল—কেমন আছেন মালতী রায়? আজকাল অবশ্য বলতে হয়—আমার কথাটা বোধহয় শুনতে পেলে না মালতী।

অনিমেষ এই বাড়িতে এলেই বাড়িটাও যেন এক অসাধারণ মানুষকে দেখবার আনন্দে শুধু বার বার আশ্চর্য হয়। ছেলে-বুড়ো সবারই মনে মুখে ও চোখে এক পরম বিস্ময় নীরবে আর সরবে গুঞ্জন করে। সেই গুঞ্জন শুনে খুশী হয়ে চলে যায় অনিমেষ।

এ-বাড়ির ওই বিস্ময়ের গুঞ্জন শুনতে ভাল লাগে, তাই আসে অনিমেষ। তা ছাড়া আর কি কোন কারণ নেই? থাকতে পারে। অনিমেষ বোধহয় একটা সদিচ্ছার টানেও এখানে আসে। ত্রিলোকবাবুর সঙ্গে, এবং সেই সঙ্গে মালতীর সঙ্গেও অনিমেষের পরিচিত হবার প্রথম কারণটাই হল একটা সদিচ্ছার টান।

ভাগলপুর থেকে এখানে বদলি হয়ে এসে প্রায় পনরটা দিন সপরিবারে ধর্মশালাতে থেকে আর বাড়ি খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছিলেন ত্রিলোকবাবু। পঞ্চাশ টাকার মত ভাড়ার একটি সাধারণ বাড়ি চাই।

লোকের উপকার করার মত একটা সোসাইটি আছে এই ছোট শহরে এবং অনিমেষ হল সেই সোসাইটির নতুন সেক্রেটারি। সেদিন ধর্মশালার এক কুঠুরিতে নিউমোনিয়ায় মরমর এক বিখ্যাত বৈদান্তিক সাধুর চিকিৎসার জন্য ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে ধর্মশালাতে এসেছিল অনিমেষ। সেই দিনটিই হল ত্রিলোকবাবুর সঙ্গে অনিমেষের প্রথম আলাপের দিন।

"আপনারা এখানে কেন? কিসের জন্য?"

ত্রিলোকবাবু বলেন, "একটা বাড়ি খুঁজছি, কিন্তু পাচ্ছি না। বড়ই অসুবিধেয় পড়েছি।"

"কত টাকা ভাড়ার বাড়ি হলে চলবে?"

"এই ধরুন পঞ্চাশ টাকা।"

"এই ত আমাকেও অসুবিধেয় ফেললেন।"

আশ্চর্য হয়েছিলেন, বুঝতে না পেরে একটু চমকেও উঠেছিলেন ত্রিলোকবাবু, "তার মানে?"

"তার মানে, হয় এক শ টাকা ভাড়া, নয় দশ টাকা ভাড়া; এই দু রকমের ভাড়ার বাড়ি এই শহরে অনেক আছে, কিন্তু এদিকেও না ওদিকেও না, ওই পঞ্চাশ টাকা ভাড়ার বাড়ি খুব কমই আছে, একরকম নেই বললেই হয়।"

"কিন্তু দশ টাকা ভাড়ার বাড়ি কি আমাদের মত মানুষের পক্ষে থাকবার মত……"

"তা তো বুঝতেই পারছি। এদিকে এক শ টাকার ভাড়া হলে আবার…।"

"না না, সেটাও সম্ভব নয়।"

"তা তো বুঝতে পারছি। দেখি চেষ্টা করে।"

খুবই চেষ্টা করেছিল অনিমেষ, এবং অনেক খোঁজা-খুঁজি করে ও বাড়িওয়ালাকে অনেক বলে কয়ে রাজি করিয়ে এই বাড়িটাকে ত্রিলোকবাবুর জন্য ভাড়া করিয়ে দিতে পেরেছিল।

এবং তার কদিন পরে, বোধহয় ছোট একটা ধন্যবাদ নেবার লোভে, কিংবা বাড়ির মানুষগুলি কত খুশী হয়েছে দেখে একটু খুশী হয়ে যাবার জন্য, কিংবা আর কোন উপকারের দরকার আছে কিনা জানবার জন্য যেদিন আবার এসে ত্রিলোকবাবুর সঙ্গে গল্প করেছিল ও এই বাড়িতে প্রথম চা খেয়েছিল অনিমেষ, সে-দিনই প্রথম জেনে গেল যে, ত্রিলোকবাবুর সঙ্গে অনিমেষের কিরকম একটা অনেক দূরের আত্মীয়তার সম্পর্কও আছে। ত্রিলোকবাবুর মামা হলেন অনিমেষের মেসোমশাইএর একেবারে নিকট আত্মীয়।

তারপর আর কী? আর একদিন এসে, সেদিনই প্রথম মালতীর সঙ্গে

প্রথম কথা বলেছিল অনিমেষ, "কেমন আছেন মালতী রায়? স্টেশন রোডের মেয়ে-স্কুলে কী করতে গিয়েছিলেন। কোন কাজ ছিল বোধহয়।"

মালতীও অনিমেষের প্রথম প্রশ্নের উত্তর হাসিমুখে দিতে পেরেছিল, "হ্যাঁ, কাজ নিয়েছি।"

"টীচার হয়েছেন?"

"হ্যাঁ।"

"কত মাইনে?"

"পঞ্চান্ন টাকা।"

"তাই বলুন। আমি কী ভাবলাম, আর আপনি কী বললেন!"

অনিমেষের মুখের ভাষাটা যেন হঠাৎ করুণ হয়ে আক্ষেপ করে উঠেছে। মালতীর মুখের হাসি আর চোখের সেই শান্ত ও সলজ্জ চাহনিকে প্রথম দিনের ওই একটি কথাতেই চমকে দিয়েছিল অনিমেষের ওই আক্ষেপ। সত্যিই কি অনিমেষবাবুর গলার স্বরটা করুণ হয়ে কেমন করে উঠল, অথবা মালতীরই শোনার ভুল! ত্রিলোকবাবুর মেয়ে মালতীর অদৃষ্টের দাম পঞ্চান্ন টাকা শুনে ব্যথিত হয়ে উঠেছে, এমন মানুষ জীবনে এই ত প্রথম দেখতে পেল মালতী। সেদিন মালতীর মনের বিস্ময়টাই বড় বেশী সাহস করে বড় বেশী কথা বলে ফেলেছিল।

মনের ভাবনাগুলিকে বেশ একটু সন্দেহ করতেও ভুলে যায়নি মালতী। অনিমেষবাবু সবারই উপকার করেন; পৃথিবীর যে-কোন পঞ্চান্ন টাকার দুঃখ দেখলে এইরকমই করুণ হয়ে যায় ভদ্রলোকের চোখ আর গলার স্বর। কী ভেবেছিলেন আপনি? ইচ্ছে থাকলেও মুখ খুলে প্রশ্নটাকে মুখর করে তুলতে পারেনি মালতী। কে জানে এই প্রশ্নের উত্তরে কী কথা বলে ফেলবেন এই ভদ্রলোক, তারপর প্রায়-অচেনা আর একেবারেই অজানা এই ভদ্রলোকের কথার জালে জড়িয়ে হয়ত আর কোন উত্তরই দিতে পারবে না মালতী। সে যে একটা বড় বিশ্রী লজ্জার ব্যাপার হয়ে উঠবে। বোধহয়, অনিমেষবাবু নামে এই ভদ্রলোকের সুন্দর মুখটিকে দেখতে খুব বেশী ভাল লেগেছে মালতীর। সন্দেহ করে মালতী; বুকের ভিতর যেন হঠাৎ একটা নতুন হাওয়া বইতে শুরু করেছে। ভয় পায়, লজ্জাও করে মালতীর।

অনিমেষ চলে যাবার পর নিজের মনের চেহারাখানা আর ভাবনাগুলির কাণ্ডকারখানা দেখে সত্যিই বড় বেশী লজ্জা পেয়েছিল মালতী আর মনে মনেই

ধমক দিয়ে মুহূর্তের একটা ভুল স্বপ্নের শোভাকে ভেঙেচুরে ধুলো করে দিয়েছিল। অনিমেষ এখানে আসে, কিন্তু কারও মুখ দেখতে আসে না। খোঁজ করতে আসে, কোন উপকারের দরকার আছে কিনা। এই ত, এর চেয়ে বেশী কোন কারণ থাকতেই পারে না।

তার পরদিন নয়, এবং অনেকদিন পরে প্রায় তিনটা মাস পার হয়ে যাবার পর যেদিন এক সন্ধ্যায় বাড়িতে আর কেউ ছিল না, শুধু ছিল মালতী, যেদিন বাইরের বারান্দায় একটা আলো এনে রাখতেও ভুলে গিয়েছিল মালতী, শুধু আকাশ থেকে এক টুকরো চাঁদের আলো বারান্দায় রেলিংএর উপর পড়ে হাসছিল; সেদিন অনিমেষের মুখের ভাষাও মুখর হতে হতে হঠাৎ একটা ভুল করে হঠাৎ একেবারে নীরব হয়ে গেল। "তুমি একদিন আমাদের বাড়িতে চল মালতী।"

তুমি! আকাশ থেকে ওই টুকরো চাঁদের মায়া যেন হঠাৎ কাছে ছুটে এসে মালতীর জীবনের কাছে মধুর এক অনুরোধের গান গেয়ে উঠেছে।

না, ভুল স্বপ্ন নয়। সত্যিই যে মালতীর মনের ভিতর একটা ভীরু আশা-আকাশ হতে রাতের আঁধারের গুমোট হঠাৎ মুছে গেল। যেন ভোরের পাখির কলরব শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। একেবারে নতুন একটা জীবন নিয়ে জেগে ওঠার লগ্ন এসে হঠাৎ মালতীর পঁচিশ বছর বয়সের এই কপালে চুমো খেয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে।

রেলিংএর একদিকে থামের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল অনিমেষ, এবং আর একদিকে রেলিংএর উপর দু হাত রেখে পথের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল মালতী। মালতীর মাথাটা হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে, যেন আর এক রকমের ঘুমে জড়িয়ে ধরেছে দু চোখের পাতা। আস্তে আস্তে বলে মালতী, "বেশ ত, কিন্তু আপনি এসে নিয়ে যাবেন বলুন।"

"আমি এসে নিয়ে যাব?"

"হ্যাঁ।"

হঠাৎ চেঁচিয়ে হেসে ফেলে অনিমেষ, "আমার সময় কোথায়?"

মনে হয় মালতীর, অনিমেষের ক্ষণিকের ভুলো মনের ভাষাটাই হঠাৎ সাবধান হয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে। অনিমেষের জীবনের গর্বটা হঠাৎ বোকা হতে হতে আবার হঠাৎ চালাক হয়ে হেসে ফেলেছে। নিজে এসে মালতীকে নিয়ে যাবে, তেমন মানুষই যে নয় অনিমেষ।

মালতীর চোখের পাতায় ঘুম-ঘুম অবসাদ আচমকা ভয় পেয়ে শিউরে ওঠে। জ্বালা লাগে, বুকের ভিতর হাঁসফাঁস করে ঘুরে বেড়ায় সেই জ্বালাটা। ভুল, নিতান্তই ভুল স্বপ্ন, কিংবা স্বপ্নের ভুল। ত্রিলোকবাবুর মেয়ে, পঞ্চান্ন টাকা মাইনের এক মাস্টারনীর জীবন হঠাৎ লোভের ভুলে বোধ হয় পাগলই হয়ে গিয়েছিল, নইলে হঠাৎ এত বেহায়া হয়ে অনিমেষের মত মানুষের কাছে এতবড় একটা দাবি করে ফেলবে কেন?

তবু, বোধ হয় এই ভুল স্বপ্নটাকেই শেষবারের মত ছিঁড়ে দেবার আগে আর একবার জীবনের এই ভয়ংকর বিদ্রূপের সঙ্গে লড়াই করে নিতে চায় মালতী। অনিমেষের ঐ হাসি কি সত্যিই একটা ঠাট্টার হাসি? মালতীর দাবির কথা শুনে অনিমেষের মনটাও কি দুঃসহ কৌতুকের আবেগে হেসে ফেলেছে?

মালতী বলে, "সময় হবে না আপনার, এ-কথার ত কোন মানে হয় না।"

অনিমেষ বলে, "আহা, সামান্য একটা কথা বুঝতে পার না কেন? সময় থাকলেও, আমি নিজে এসে তোমাকে নিয়ে যাব কেন?"

মালতী বলে, "একদিন না একদিন, কাউকে ত নিশ্চয়ই নিজে গিয়ে নিয়ে আসবেন।"

উৎফুল্ল হয়ে, নিজের মনের খুশীর স্বরে গলার স্বর যেন আরও উচ্ছল করে নিয়ে অনিমেষ বলে, "হ্যাঁ এটা ঠিকই বলেছ মালতী, আজই মার কথা থেকে বুঝলাম, এইরকম একটা কাণ্ড ঘটাবার চেষ্টা শুরু হয়ে গিয়েছে।"

একেবারে ধীর স্থির ও স্তব্ধ হয়ে যায় মালতী নামে সেই একটি সাধারণ জীবনের সাধারণ চেহারা। আকাশের এক টুকরো চাঁদের আলো যেন হঠাৎ অভিশাপ হয়ে ওর শরীরটাকেই পাথর করে দিয়েছে।

বেশীক্ষণ নয়, হঠাৎ-আশার ভুল প্রদীপ হঠাৎ নিভে গিয়েছে। তাই জ্বালাটাও যেন হঠাৎ মরে যায়; আর ধোঁয়া সরে যেতেও বেশী দেরি হয় না।

মালতী প্রশ্ন করে, "একটা কথা বলবেন?"

"কী কথা?"

"সেই যে সেদিন আপনি কী যেন ভেবেছিলেন, আর আমি কী যেন বলে ফেলেছিলাম। আমার কথা শুনে আপনি একটু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন।"

"কবে ?"

"সেই যে-দিন আমার পঞ্চান্ন টাকা মাইনের চাকরিটার কথা শুনলেন।"

"ও, মনে পড়েছে। সেই ত, মনে মনে বেশ একটু শক পেয়েছিলাম মালতী। আমি ভেবেছিলাম, তুমি বোধ হয় স্কুল কামিটির মেম্বার হয়েছ। ভাবতেই পারিনি যে, তুমি পঞ্চান্ন টাকা মাইনের একটা টিচার হয়ে বসে আছ।"

"তাতে আমার কোন অপরাধ হয়েছে ?"

"না না, অপরাধ কেন হবে, ছিঃ, আমি কি তাই বলেছি ? আসল কথাটা হল, ওটা একটা অতি সাধারণ কাজ। কত শত মেয়েই ত এই কাজ করে।"

আর বুঝতে কিছুই বাকি নেই, আর নতুন করে কিছু জানবার নেই। অনিমেষের মন পৃথিবীতে কোন এক অসাধারণীর জীবনের কাছে গিয়ে মুগ্ধ হবার জন্য ব্যাকুল হয়ে রয়েছে। রূপে চমক আছে, কথায় গমক আছে, হাসিতে গানের মত মিষ্টি সুরের জোয়ার কলকল করে, এমন একটি নারী। বিদ্বান মানুষ, মনটাও শৌখিন; অনেক টাকা-পয়সারও মানুষ নিশ্চয়। মালতীদের উপকার করাও বোধ হয় ভদ্রলোকের শৌখিন মনের একটা সুন্দর খেলা। এই মাত্র, এর বেশী কিছু নয়। মালতীই ভুল বুঝেছে।

ক্ষমা চায় মালতী, "আপনি মাপ করবেন, আমিই কিছু না বুঝে-সুঝে হঠাৎ আপনাকে একটা বাজে অনুরোধ করে ফেলেছি।"

বিব্রত বোধ করে অনিমেষ, এবং একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলে, "ছি ছি, তুমি এর জন্য আবার একটা মাপ চাইছ কেন ?"

পথের দিক থেকে একটা কলরব আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে বারান্দার উপর ওঠে। এতক্ষণে বাড়ি ফিরলেন মালতীর বাবা আর মা, এবং সেই সঙ্গে মালতীর দুই ভাই পল্টু আর মণ্টু। সবারই হাতে বাজার থেকে কেনা নানা জিনিসের ছোট-বড় এক একটা প্যাকেট।

ত্রিলোকবাবুর দিকে তাকিয়ে অনিমেষ বলে, "ব্যবস্থা করতে পেরেছি। আজই সকালে গিয়েছিলাম; বলে কয়ে মিশন স্কুলের হেডমাস্টারকে রাজি করিয়েছি। পল্টু আর মণ্টুকে ভর্তি করে নেবে; তা ছাড়া গত তিন মাসের ফীও নেবে না।"

শুনে খুশী হয়ে এবং প্রায় চমকে উঠে হাঁপ ছাড়েন ত্রিলোকবাবু, "ওঃ, তুমি আমাকে মস্ত একটা দুশ্চিন্তা থেকে বাঁচালে অনিমেষবাবু।"

আশ্চর্য হয়েছে, চমকে উঠে কৃতজ্ঞতার আবেগে অনিমেষকে অভিনন্দিত করেছে এই বাড়িটা, ত্রিলোকবাবুর ঐ কথাগুলি, আর ওই মুক্ত নিঃশ্বাসের শব্দ। আজকের মত আর এখানে বসে থাকবার কিংবা দেরি করবার দরকার নেই। যে স্তুতির উল্লাস শুনতে পেলে তৃপ্ত হয় অনিমেষের মনের এক শৌখিন আশা, সেই স্তুতি শুনতে পেয়েছে অনিমেষ। মালতীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, "যাই এবার, আজ আর চা খাব না।"

চলে যায় অনিমেষ।

অনিমেষ বলে, "আমার কথাটা বোধ হয় তুমি শুনতে পেলে না মালতী।"

মালতী হাসে, "শুনলাম ত।"

"কী শুনেছ?"

"আপনি স্কুল কমিটির সেক্রেটারির কাছে গিয়েছিলেন, আর আমার মাইনে বাড়িয়ে দেবার জন্য অনেক অনুরোধ করেছিলেন।"

"হ্যাঁ, কিন্তু কোন কাজ হল না। তাছাড়া ওদেরই বা কী দোষ ধরব বল?"

মালতী আবার হাসে, "তা হলে দোষটা আমারই।"

অনিমেষ হাসে না, বরং বেশ একটু গম্ভীর হয়ে বলে, "প্রায় তাই। তোমার কোয়ালিফিকেশনও যে তোমারই মত সাধারণ। ম্যাট্রিক পাস নয়, ম্যাট্রিক ফেলও নয়; ম্যাট্রিক পর্যন্ত। বাঃ।"

ওই বাঃ, ওই ছোট্ট একটি কথা যেন ছোট একটা ধিক্কার, অনিমেষের কথার ফাঁকে ফাঁকে কত সহজে আর অনায়াসে শব্দ করে ওঠে।

অনিমেষেরই বা দোষ কী? ওর মুখের ভাষা থেকে শুরু করে ওর চলবার আর তাকাবার ভঙ্গী পর্যন্ত সবই যেন পৃথিবীর যত আলো-ছায়াকে চমকে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। আর, নিজেও যেন অদ্ভুত এক চমকে ওঠার পিপাসা নিয়ে ছটফট করছে। হয় একেবারে এদিক, নয় একেবারে ওদিক; মাঝামাঝি হয়ে থাকার কোন অর্থ হয় না। দেখে দু চোখ চমকে উঠে মুগ্ধ হয়ে যাক, নয়ত ঘেন্না পেয়ে শিউরে উঠুক। দেখতে ভাল লাগছে না, খারাপও লাগছে না, এমন একটা মোটামুটিকে আর সাধারণকে সহ্য করতে ত ইচ্ছা করেই না, বরং একটু, কখনও বা বেশ একটু ঘৃণা করতে ইচ্ছা করে। সাদা রংকে লোকে মিথ্যাই একটা রং বলে। সাদা দেখে কখনও কারও চোখে রং ধরে না।

তবু মালতীদের বাড়িতে মাঝে মাঝে আসে কেন অনিমেষ? ত্রিলোকবাবুর এই বাড়িটা যে বড় বেশী সাধারণ চেহারার বাড়ি। চকমক করে না, কালিঝুলি মাখাও নয়। এসে চমকে উঠতে হয় না, বিরক্ত হতেও পারা যায় না। এই বাড়ির চেয়ার টেবিলগুলিও যেন ঐ মালতীর মত। পালিশ ঝকঝক করে না, মিটমিটও করে না। একটা সাধারণ চিনে-মাটির পেয়ালাতে চা এনে একটা সাধারণ টেবিলের ওপর রেখে দেয় মালতী। অনিমেষও একটা সাধারণ চেয়ারে বসে সেই চা খায়। চা-টা বেশী মিষ্টি নয়, আবার একেবারে মিষ্টিও নয়। বাঃ।

অনিমেষ বলে, "আমি কিন্তু বিনা চিনিতে চা খেতে ভালবাসি। আবার বেশী মিষ্টি হলে খেতে ঘেন্নাই করে। কিন্তু তোমাদের বাড়ির এই চা, না এদিকে না ওদিকে···বাঃ।"

শুনে চমকে ওঠে মালতীর শান্ত ও সাধারণ এক জোড়া চোখ, যে-চোখের তারা ঘন কালো নয়, আবার ফিকে কালো-ও নয়। অনিমেষের মনে হয়, বেশ আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে মালতী। অনিমেষের বুকের গভীরে কোন এক নিরালা কোণে একটা তৃষ্ণার্ত অহংকারও এতক্ষণে তৃপ্ত হয়ে যায়। মালতীদের এই অতি সাধারণ বাড়িতে অনিমেষের সব অসাধারণত্ব যেন বড় বেশী স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠবার সুযোগ পায়, এবং বড় বেশী চমক লাগে এই বাড়ির চোখে।

সরকারী অফিসে সাধারণ এক কেরানির কাজ করেন ত্রিলোকবাবু। মাইনেটা অবশ্যই সাধারণ রকমের। মালতীর মা অনিমেষের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলেন ঠিকই, আবার বারবার মাথায় কাপড়ও টানেন। না এ-কেলে না সে-কেলে, এও এক অদ্ভুত সাধারণ ব্যাপার। অনিমেষ বলে, "আমার মা জেঠামশাইএর সামনেও মাথায় কাপড় টানেন না, বাবা মা জেঠামশাই আর জেঠিমা রোজ একসঙ্গে বসে তাসও খেলেন। অথচ আপনাকে দেখছি, আমার সামনে এসে কথাও বলবেন, আবার মাথায় কাপড়ও টানবেন। আপনাদের এই এক অদ্ভুত···না মডার্ন না রঘুনন্দন—অদ্ভুত অবস্থা, বাঃ।"

মালতীর মা আশ্চর্য হয়ে বলেন, "কার সঙ্গে কার তুলনা করছ অনিমেষ? তোমার মার মত শিক্ষিত মানুষ সারা-দেশের মেয়ে-সমাজে কজন আছেন বল দেখি? কী সুন্দর কী চমৎকার, সব সময় হাসি-খুশী মানুষটি!"

অনিমেষের বাড়ির জীবনের গর্ব আর গৌরবও যেন মালতীর মার এই

রকমের এক একটা বিস্ময়ের মধ্যে চমক লেগে জ্বলজ্বল করে। শুনতে ভাল লাগে, আরও শুনতে ইচ্ছা করে। এমন একটি দিনও গিয়েছে কি না, যেদিন এই বাড়িতে এসে অনিমেষ বেশ চমৎকার একটি খুশীর উপহার না নিয়ে চলে গিয়েছে।

পন্টু আর মন্টুও এই রকমই চমকে উঠে অনিমেষদার মনটাকে খুশী হয়ে উঠবার সুযোগ দেয়। অনিমেষদাকে দেখে ওরা বড় বেশী আশ্চর্য হয়ে যায়। যেমন সাজপোশাক, তেমনই কথাবার্তা। একই স্টাইলের সাজে দুটি দিনও কখনও অনিমেষ এখানে এসেছে কিনা সন্দেহ। কোনদিন ট্রাউজার আর নেকটাই। কোনদিন ঢিলে পায়জামা আর নাগরা জুতো। কোনদিন শার্টের সঙ্গে ধুতি। কোনদিন সন্ধ্যার পর ক্লাব থেকে বাড়ি ফেরবার পথে টেনিস র‍্যাকেট হাতে নিয়ে, কোনদিন বেশ একটু রাত করে লাইব্রেরি থেকে ফেরবার পথে মোটা মোটা ফিলসফির বই হাতে নিয়ে মালতীদের এই বাড়ির বারান্দার উপর এসে বসে অনিমেষ।

পন্টু আর মন্টু বলে, "এত বই আপনি কখন পড়েন অনিমেষদা ?"

অনিমেষ বলে, "অফিসে। আমি অফিসের ফাইল বাড়িতে নিয়ে এসে কাজ করি, আর বাড়ির বই অফিসে নিয়ে গিয়ে পড়ি।"

পন্টু আর মন্টুর চোখে বিস্ময়ের হর্ষ চমকে ওঠে। "আশ্চর্য !"

আরও অনেক আশ্চর্যের কথা বলে পন্টু আর মন্টু। "উঃ আপনি দেখতে কী চমৎকার অনিমেষদা। উঃ রে বাস, আপনি কত বড়লোক অনিমেষদা, পাঁচশ টাকা মাইনে পান। আপনি খুব বিদ্বান, অনেক অনেক বিদ্বান, না অনিমেষদা ?"

পন্টু আর মন্টুর এই আবোল-তাবোলও অনিমেষের শুনতে বেশ লাগে। হোক ছেলেমানুষ, তবু ওরা অনিমেষের জীবনের গৌরবগুলিকে ত ঠিকই ধরতে আর বুঝতে পেরেছে।

সব সন্ধ্যার আকাশে টুকরো চাঁদের আলো হাসে না। তারা ছড়ান অন্ধকারও থাকে। এক এক সময় এই বাড়ির বারান্দার রেলিংএর ধারে দাঁড়িয়ে চা খেতে খেতে হঠাৎ আনমনা হয়ে যেতে হয়।

সে-দিন এমনই এক আনমনা ভাবনা নিয়ে পন্টু আর মন্টুর সঙ্গে যখন গল্প করছিল অনিমেষ, তখন মালতীর মা হঠাৎ এসে বললেন, "মালতীর এই সম্বন্ধটাও ভেঙে গেল !"

"তার মানে ?"

"মেয়ে পছন্দ হল না।"

"কেন ?"

"কেন পছন্দ করবে ? ঐ ত ছিরি, তার ওপর যদি বিদঘুটে মেজাজ আর জেদ নিয়ে আরও বিচ্ছিরি হয়ে থাকে, তবে…।"

"কিসের মেজাজ আর জেদ ?"

"কিছুতেই সাজবে না। অথচ সাজলে যে ওকে বেশ একটু ভাল না দেখাবে তা ত নয়।"

"সাজতেই জানে না বোধ হয়।"

"খুব জানে। ভাগলপুরে থাকতে পাড়ার যে-কোন বাড়িতে যখনই মেয়ে দেখাবার দরকার হত, তখন মালতীরই ডাক পড়ত মেয়েকে সাজিয়ে দেবার জন্য।"

বলতে বলতে হেসে ফেলেন মালতীর মা। "ওর হাতের সাজান সব কটি মেয়েরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে, পাত্রপক্ষ মেয়ে দেখামাত্র পছন্দ করে ফেলেছে। কিন্তু নিজের বেলায়…ওই এক অদ্ভুত জেদ।"

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অনিমেষ। বেশ গম্ভীরও হয়। বোধ হয় এই বাড়ির একটা বড় রকমের উপকার করে দেবার জন্য অনিমেষের মনের সেই শৌখিন আগ্রহটা একটা প্রবল নেশার ঝোঁকের মত ছট-ফট করে উঠেছে। অনিমেষ বলে, "বলেন ত আমি একটা সম্বন্ধের খোঁজ করি।"

"কর, কিন্তু কী লাভ হবে তাও ত বুঝতে পারছি না। সেই কাণ্ডই আবার হবে। মেয়ে দেখবে আর অপছন্দ করে চলে যাবে। ঐ জেদী মেয়ে সাজতেই রাজী হবে না।"

অনিমেষ হাসে, "আমি রাজী করাব।"

মালতীর মা হাসেন, "তোমাকে অবিশ্যি একটু ভয় করে। দেখ, যদি রাজী হয়।"

মালতীকে রাজী করাবার সুযোগও পেয়ে গেল অনিমেষ। মালতীর মা চলে যেতে মালতীই অনিমেষের কাছে এসে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বলে, "এতক্ষণ ধরে মার সঙ্গে যে ষড়যন্ত্রের কথা বলছিলেন, তার সবই শুনে ফেলেছি।"

অনিমেষ হাসে, "তা হলে কথা রইল। এইবার সাজতে যেন একটুও আপত্তি না হয়।"

মালতী বলে, "আপনি তাহলে সত্যিই চান যে আমি…।"

"নিশ্চয়।"

"আচ্ছা।"

সাজল মালতী। সে-সন্ধ্যায় টুকরো চাঁদের আলো দিয়ে এত বড় আকাশটাও নিজেকে সাজিয়ে নিল। ত্রিলোকবাবুর উপকার করবার জন্য, ত্রিলোকবাবুর মেয়ে মালতীর জন্য অনেক খোঁজাখুজি করে ভাল একটি সম্বন্ধও এনে ফেলেছে অনিমেষ, আর পাত্রপক্ষের দুই ভদ্রলোকের সঙ্গে নিজেও এসে এই অতি সাধারণ বাড়ির বাইরের ঘরে বসেছে।

দেখতেও পেল অনিমেষ, যে-দৃশ্য এই এক বছরের কোন সন্ধ্যায় এই সাধারণ বাড়ির ঘরে ও বারান্দায় কোন নিভৃতে দেখতে পায়নি। সেজেছে মালতী। এ যেন সেই মালতীই নয়। কী অদ্ভুত আর কী সুন্দর একটা রঙিন রূপের চমক গায়ে জড়িয়ে মানুষের চোখের সামনে আজ ধরা দিয়েছে মালতী। চোখের কোলে সরু কাজলের টান, চোখ দুটোই মেঘলা সন্ধ্যার ছবির মত মায়াময় হয়ে গিয়েছে। খোঁপার উপর তিনটে সাদা ফুলের কুঁড়ি। কালো রেশমের একটা স্তবকের মত আলগোছে যেন হেলে রয়েছে খোঁপাটা। ঢলঢল করছে মালতীর চুলের কালো। রঙিন শাড়িটা কোথাও লতার মত পাক দিয়ে, আবার কোথাও যেন ঢেউ তুলে মালতীর সারা শরীরটাকেই ছাদে ছাঁদে ঢেলে আর গলিয়ে একেবারে নতুন করে গড়ে তুলেছে। মোটেই গম্ভীর নয়, বেশ সুন্দর একটি হাসির আবছায়া শিউরে রয়েছে মালতীর ঠোঁটে, ঠোঁট দুটিই ফুলেল শোভার মত যেন একটু ফুলে উঠেছে।

পছন্দ হয়েছে। বেশ স্পষ্ট করে এবং বেশ একটু উল্লাসের স্বরে পছন্দের ফল ঘোষণা করে চলে গেলেন পাত্রপক্ষ।

এইবার অনিমেষকেও চলে যেতে হবে। কিন্তু যাবার আগে মালতীকে একটা কথাও না বলে গেলে কি ভাল দেখায়? কী কথা? কথাটা তাড়াতাড়ি তৈরি করে নিতেও পারে না অনিমেষ; অথচ চোখ দুটোও ব্যাকুলভাবে খোঁজ করে, মালতী কোথায়? বারান্দায় কেউ নেই। বাইরের ঘরেও কি কেউ নেই?

বাইরের ঘরের দরজার কাছে তখন শুধু একজনই দাঁড়িয়েছিল, মালতী। তখনও সেই অদ্ভুত ফুলেল হাসির চমক লেগে ফুলে রয়েছে মালতীর ঠোঁট।

ব্যস্তভাবে মালতীর কাছে এগিয়ে এসে হাসতে গিয়ে হঠাৎ গুমরে ওঠে অনিমেষের মুখের একটা কথা, "ওরা যে সত্যিই পছন্দ করে চলে গেল মালতী।"

মালতী হাসে, "আমার কপাল।"

"কিন্তু···কিন্তু তুমিও সত্যিই মানুষের চোখকে ভয়ংকর ঠকাতে পার।"

"কাকে ঠকিয়েছি?"

"আমাকে। কোন দিন ত এমন অদ্ভুত সুন্দরটি হয়ে আমার চোখের কাছে···।"

মালতী হাসে, "এটা যে একটা নকল চেহারা।"

স্তব্ধ হয়ে যায় অনিমেষের মনের সব প্রশ্নের উৎসাহ। ঠিকই বলেছে মালতী। মালতীর এই চেহারা একটা ছদ্মবেশ, এরই ভিতরে লুকিয়ে আছে সেই খড়ি দিয়ে আঁকা সাদাটে ছবির মত চমকহীন একটা সাধারণ চেহারা। নাঃ, ভালই হল, সত্যি কথাটা সময়মত স্মরণ করিয়ে দিয়ে ভালই করেছে মালতী।

মুখ ঘুরিয়ে আবার পথের দিকে তাকায় অনিমেষ। বুঝতেও পারে না, কখন ভিতরের ঘরের দিকে চলে গেল মালতী। বারান্দার টেবিলের উপর একটা সাধারণ ল্যাম্প; মিটমিট করে না, জলজল করে না। এই পৃথিবীর কতগুলি নিতান্ত সাধারণ আলো-ছায়ার নিষ্ঠুর কৌতুকের বন্ধনে যেন বন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অনিমেষ। জানেও না, কতক্ষণ ধরে এই ভাবে ত্রিলোকবাবুর বাড়ির এই বারান্দায় সে আজ দাঁড়িয়ে আছে।

"মালতী।" বেশ জোরে চেঁচিয়ে ডেকে ফেলেছে অনিমেষ। ডাকটা যেন হঠাৎ জোরে হোঁচট খাওয়া মানুষের আর্তস্বরের মত।

সেই মুহূর্তে ভিতরের ঘরের ভিতরেও যেন দরজার খিল খোলার শব্দ চমকে উঠে একটা আছাড় খায়। ছুটে আসে একটা উতলা আলো-ছায়া। কাছে এসেই চেঁচিয়ে ওঠে মালতী, "কী হয়েছে? আপনি এখনও দাঁড়িয়ে আছেন যে?"

এ আবার কোন রূপ? মালতী যেন তার এতদিনের সেই চেহারাটাকেই মনের হঠাৎ ভুলে কোথাও ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অনিমেষের চোখের কাছে

এসে দাঁড়িয়েছে। মুখ ধোওয়া বোধ হয় সবে মাত্র সারা হয়েছিল, ভুরু দুটি এখনও জলে ভিজে রয়েছে। এলোমেলো খোলা চুল, প্লেনপাড় সাদা শাড়ি আর সাদা সায়া। শাড়িটার অর্ধেকও গায়ে জড়ান হয়নি। সায়াটাকেই বেশী দেখা যায়, সায়ার লেস কুঁচকে রয়েছে। গালে পাউডার নেই, ঠোঁটে রং নেই, চোখে কাজলের একটা ছায়াও নেই। সাদা কাপড়ের ব্লাউজ, তার একটা বোতাম খোলা, গায়ের সঙ্গে যেন আলগা ছোঁয়া লাগিয়ে ফুরফুর করছে ব্লাউজটা।

উত্তর দিতে ভুলে গিয়ে শুধু অপলক চোখের নিবিড় বিস্ময় নিয়ে মালতীর দিকে তাকিয়ে থাকে অনিমেষ। রাগ করে রয়েছে মালতীর ভুরু, সন্দেহ করছে চোখের তারা, ঠোঁটের উপর যেন একটা বিস্ময়ের জ্বালা দাঁত দিয়ে চেপে রয়েছে মালতী। ঘাড় হেলিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে মালতী, তাই বোধ হয় এত সুন্দর হয়ে চিকচিক করছে ওর গলার ওই বাজে একটা সোনার সরু হার। মনে হয়, মালতীর এই অদ্ভুত অসাধারণ চেহারাটাই ঐ বাজে শাড়ি সায়া ব্লাউজের সব সাদাকে রঙিন করে দিয়েছে।

আস্তে আস্তে হাঁপ ছাড়ে মালতী, "উঃ, আপনার ডাক শুনে কী ভয়ানক ভয় পেয়েছিলাম। মনে হল, আপনি যেন হঠাৎ এই বারান্দা থেকে নীচে পড়ে গিয়েছেন।"

দুচোখ ভরা মুগ্ধতা নিয়ে, আর বোধ হয় বুক ভরা মধুরতার চমক নিয়ে মালতীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অনিমেষ। এতদিন ধরে একটা সাদাটে সাধারণের নকল সাজ পরে এই রঙিন চেহারা লুকিয়ে রেখেছিল ওই মেয়ে। সত্যিই অনিমেষকে অনেক ঠকিয়েছে মালতী।

"ছিঃ, এ কী করেছি আমি!" এতক্ষণে যেন হুঁশ ফিরে পেয়েছে মালতী। নিজেরই ভুলো মনের ভুল, আর এই পাগল চেহারাটাকে এতক্ষণে দেখতে পেয়ে হঠাৎ শিউরে ওঠে মালতী। কিন্তু ছুটে পালিয়ে যাবার আগেই বাধা পায়। মালতীর একটা হাত ধরে ফেলে অনিমেষ।

ছটফট করে মালতী, "একি কাণ্ড করছেন আপনি?"

অনিমেষ বলে, "এতদিনে তোমাকে ধরে ফেলতে পেরেছি।"

জঞ্জালীর জ্বালা

ঐ যে রূপসী নারী, যার নাম মুক্তাকণা, যাকে আজ এক বছর ধরে সদাসর্বদা চোখের সামনে দেখছেন ছোট কুমার সাহেব অর্থাৎ রায়জাদা অবনীশ রায়, তাকেই আজও মাঝরাতের অথবা শেষরাতের কোন প্রহরে হঠাৎ ঘুম-ভাঙা চোখ তুলে দেখতে গিয়েই তিনি চমকে ওঠেন। এবং চমকে উঠলেও অনেকক্ষণ ধরে একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে মুক্তাকণা নামে ঐ নারীর মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থেকে কী যেন বুঝতে চেষ্টা করেন ছোট কুমার সাহেব। অর্থাৎ মজিলনগরের রাজবাড়ির সেই শৌখিন আর ফুর্তিবিলাসী মানুষটি, সেই রায়জাদা অবনীশ রায়।

ইনিই হলেন সেই অবনীশ রায়; যিনি স্কচ হুইস্কি, কবুতরের মাংস, ডিটেকটিভ উপন্যাস আর তাসের রং-মিল খেলা ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছু ভালবাসেন কিনা, তা কেউ জানে না। হ্যাঁ, এই এক বছর ধরে আর একটি বস্তু তাঁর ফুর্তিময় জীবনের নতুন বিলাস হয়ে উঠেছে। সে হল ঐ মুক্তাকণা। অবনীশ রায়ের ঘরনী নয় মুক্তাকণা, শুধুই সঙ্গিনী, যদিও এক বছর ধরে দিন ও রাতের সকল মুহূর্তে অবনীশ রায়ের ঘরেরই শোভা আর মোহ হয়ে রয়েছে মুক্তাকণা।

মাঝরাতে অথবা শেষরাতের কোন প্রহরে অবনীশের হুইস্কির নেশা যখন একঘুমের পর ফিকে হয়ে যায়, তখন ধড়ফড় করে জেগে উঠেই দেখতে পায়, ঘরের খোলা জানালার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে মুক্তাকণা। জানালার বাইরে শুধু নিরেট অন্ধকার, তাছাড়া আর কিছুই দেখবার নেই; তবু সেই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে মুক্তাকণা, দু চোখের পলক পড়ে না।

অবশ্য রোজই নয়, মাঝে মাঝে, এবং বিশেষ করে কোন নতুন জায়গায় এসে আশ্রয় নেবার পর প্রথম কয়েকটি রাত্রিতে অবনীশের সঙ্গিনী ঐ নারীর মন যেন একটা নিশির ডাক শুনতে পায়। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, যে-রাতে আকাশে আর মাটিতে ধবধবে চাঁদের আলো ছড়িয়ে থাকে, সে-রাতে

কখনও এমন ঘটনা ঘটে না। চাঁদনি রাতের সঙ্গে যেন একটা আড়ি আছে মুক্তাকণার। যে-রাতে বাইরে আকাশভরা চাঁদের আলো, সে-রাতে ঘরের ভিতর ফরাসের উপর পড়ে অঘোরে ঘুমোতে থাকে মুক্তাকণা।

প্রথম দেখা গিয়েছিল, আগ্রার সেই হোটেলের ঘরে। তার পর একবার সাসারামের ডাক-বাংলোতে। তার পর মধুপুরে অবনীশের নিজেরই এস্টেটের সেই প্রকাণ্ড বাড়িতে, যার চারদিকে বসরাই গোলাপের মস্তবড় বাগান। কে জানে কখন, বোধ হয় ঠিক যখন গভীর ঘুমে অসাড় হয়ে পড়ে থাকে অবনীশ রায়ের নেশাড়ে শরীর, আর বাইরের কালো অন্ধকারে ক্লান্ত জোনাকির পাখাও আর মিটমিট করে জ্বলে না, তখন হয় এই ঘর নয় ওই ঘরের কোন একটা খোলা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মুক্তাকণা। আরও অদ্ভুত ব্যাপার, মুক্তাকণার সারা মুখ জুড়ে সেই সময় যেন একটা কৌতুকের হাসি থমথম করে। যেন বাইরের অন্ধকারের সঙ্গে মনে মনে একটা ঠাট্টার খেলা খেলছে মুক্তাকণা।

মধুপুরের বাড়িতে যে-দৃশ্য দেখতে হয়েছিল, সেই দৃশ্য এই হীরাপুরের বাড়িতে এসেও অবনীশের দেখতে হল। ঠিক সেই রকমই আবার মাঝরাতে ঘরের খোলা জানালার কাছে গিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, আর মনে হয়, সেই রকমই ভঙ্গীতে হাসছে মুক্তাকণা।

দেখতে পেয়েই অবনীশের নেশালস মনের দুঃসহ বিস্ময় যেন হঠাৎ ক্ষুব্ধ হয়ে কঠোর স্বরে চিৎকার করে ওঠে, "কে তুমি? কী করছ ওখানে দাঁড়িয়ে?"

মুক্তাকণা যেন এত শক্ত ধমকের শব্দটাকে শুনতেই পায়নি। আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে তাকায়, এবং আনমনার মত অবনীশের মুখের দিকে একটা শূন্য চাহনি নিয়ে তাকিয়ে থাকে। তারপরেই চমকে উঠে বলে, "আমি, আমি, আমি।"

আস্তে আস্তে মুক্তাকণার দিকে এগিয়ে যায় অবনীশ। গম্ভীরভাবে বলে, "কী ব্যাপার মুক্তা? তুমি ওরকম করে হাসছ কেন? তোমাকে এত অদ্ভুত দেখাচ্ছে কেন?"

সত্যিই মুক্তাকে বড় অদ্ভুত দেখায়। খোলা জানালা দিয়ে শুধু বাইরের ঘন অন্ধকারের ভয়াল চেহারাটা দেখা যায়। দিগন্ত জুড়ে ঠেসে রয়েছে সেই নিরেট অন্ধকার। আকাশে তারা ঝিক ঝিক করে; মনে হয় তারাগুলি ভয় পেয়ে কাঁপছে। দেখা যায় না, নিকটে বা দূরে কোথায় গাছপালার ভিড় মুখ

লুকিয়ে রয়েছে। শুধু বড় বড় তালের মাথাগুলিকে এক-আধটুকু ঠাহর করা যায়। তালের পাতায় বোধ হয় মাথা ঠোকে কোন রুগ্ন শকুন। তাই একটা ক্ষীণ আর্তনাদ যেন আছাড় খেয়ে কাঁপতে থাকে। আর শোনা যায়, দূরের ঝাউবনের একটানা হাঁপানির শব্দ। বাতাস কখনও মৃদু হয়ে, আবার কখনও বা এলোপাথাড়ি ঝড়ের মত হয়ে সেই অন্ধকারের জগৎ থেকে যত আক্ষেপ আর যত অদ্ভুত কাতরানির শব্দ ছড়িয়ে বেড়ায়। মুক্তাকণা চুপ করে আর দু চোখ অপলক করে বাইরের সেই অন্ধকার দেখে, আর কাতরানির স্বর শোনে।

ঘরের ভিতরে আলো জ্বলে, তাই মুক্তার মুখটাকে খুব স্পষ্ট দেখা যায়। দেখতে পায় অবনীশ, বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে মুক্তার চোখ দুটো যেন দপ দপ করে হাসে। অত যত্ন করে বাঁধা খোঁপা, তাও যেন একেবারে ভেঙে-চুরে ঝরে পড়তে চায়। ফুর ফুর করে উড়তে থাকে উসকো খুসকো চুল। মুক্তার কপালটা লালচে হয়ে ওঠে, যেন আগুনের আঁচ লেগেছে। দাঁতে দাঁতে ঘষা লেগে বিশ্রী শব্দও হয়। পান-খাওয়া ঠোঁট, মুক্তার সেই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে যেন রক্তমাখা লালা ঝরে পড়তে চায়। বড় অস্বাভাবিক মুক্তার মূর্তিটা। মাঝে মাঝে থরথর করে কাঁপে মুক্তার শরীরটা। ওর চোখ মুখ ঠোঁট, সবই যেন ঐ অন্ধকারের সঙ্গে এতক্ষণ ধরে নিঃশব্দে কথা বলছিল। কে জানে কোন ভয়ানক রহস্যের কথা। সেই রহস্য যেন একটা ভাষাহীন কৌতুক। তাই মুক্তার চোখ দুটো ওরকম দপ দপ করে হেসে উঠছে।

অবনীশের গম্ভীর গলার স্বর শুনে আস্তে আস্তে মুখ ফেরায় মুক্তা। কিন্তু তবু মনে হয়, অবনীশের কথাগুলির অর্থ যেন বুঝতে পারছে না মুক্তা। তেমনই দুই চোখ অপলক করে অবনীশের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ঘুমভাঙা চোখের ভীত বিস্মিত শিহর মুছে ফেলবার জন্য দু হাতে চোখ ঘষে মুক্তার চোখের দিকে ভাল করে তাকায় অবনীশ রায়। কিন্তু কী অদ্ভুত সত্যিই, মুক্তাকে যে মুক্তা বলেই মনে হয় না। সারাটা দিন, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, কত গানে-গল্পে আর হাসি-ঠাট্টায়, কত রংএ-ঢংএ ও রগড়ে কুমারবাবুর ফুর্তির জীবনকে মাতিয়ে রেখেছিল যে-নারী, সে-নারী এখন এই মাঝরাতের স্তব্ধ প্রহরের কোন অভিশাপে এমন করে এলোমেলো হয়ে বোবা নিশাচরীর মত অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে, আর দু চোখের তারা নাচিয়ে দপ দপ করে হাসে?

অবনীশ রায়ের বিস্ময় এইবার দুঃসহ ভয়ে শিউরে উঠে। চেঁচিয়ে ওঠে অবনীশ, "কথা বলছ না কেন? শিগগির কথা বল। উত্তর দাও মুক্তা।"

মুক্তার চোখ দুটো এইবার ভয় পেয়ে চমকে ওঠে। যেন এতক্ষণে অবনীশের কথাগুলি কানে শুনতে পেয়েছে মুক্তা। ব্যস্তভাবে শাড়ির আঁচল গায়ে জড়িয়ে মূর্তিটাকে একটু স্বাভাবিক করে নিয়ে মুক্তা বলে, "কী বলব? কী শুনতে চাও তুমি?"

ভ্রুকুটি করে চেঁচিয়ে ওঠে অবনীশ, "সত্যি করে বল।"

এইবার শিউরে ওঠে মুক্তার চোখের তারা। অবনীশের ওই প্রশ্নটা যেন তীক্ষ্ণ ছুরির মত একটা ধারাল অস্ত্র। মুক্তার জীবনের এই সুন্দর ছদ্মবেশটাকে এই মুহূর্তে ছিন্নভিন্ন করে দেবার জন্য উদ্যত হয়েছে ওই প্রশ্ন। যদি উত্তর দিতে একটুও ভুল করে মুক্তা, যদি মনের ভুলে কিংবা হঠাৎ ভয়ে সত্য কথাটা বলেই ফেলে মুক্তা, তবে এই মুহূর্তে মুক্তার এত বড় সুখের প্রাসাদ ধূলো হয়ে যাবে। এত টাকা, এত সমাদর, এত আহ্লাদ আর এত সোনা ও জড়োয়ার উপহারে ধন্য হওয়া ঝকঝকে জীবনের সব উল্লাস স্তব্ধ হয়ে যাবে। শুধু তাই বা কেন? অবনীশ নামে খামখেয়ালী ওই বড় লোকের মেজাজ হয়ত এই মুহূর্তে পাগল হয়ে গিয়ে তার এত আদরের মুক্তাকে ঘেন্না করে পিস্তলের একটি গুলিতে শেষ করে দেবে।

অবনীশের এই প্রশ্নটা কি তার মর্মভেদী একটা সন্দেহ? মুক্তাকণাও জানে, অবনীশের মনে মাঝে মাঝে একটা সন্দেহ বড় তীব্র হয়ে ওঠে। ভয় হয় মুক্তার, সেই সন্দেহের আঘাতে মুক্তার উপর অবনীশের এত মায়া আর ভালবাসার নেশাটাই বুঝি চুরমার হয়ে যাবে।

খিল খিল করে হেসে ওঠে মুক্তা, "সত্যি করে বলছি, আমি তোমারই মুক্তাকণা, শুধু তোমারই।"

হ্যাঁ, ঠিক সেই রকমেরই ঝরনার জলের মত উচ্ছল স্বরে হেসে উঠেছে অবনীশের সঙ্গিনী মুক্তাকণা। সকাল থেকে সন্ধ্যা, তারপর রাত, এই রূপসী নারীই হেসে গেয়ে অবনীশের ফুর্তি পিপাসাকে তৃপ্তি দিয়েছে। স্কচ হুইস্কির নেশা কোন নেশাই নয়, যদি মুক্তাকণা নিজের হাতে গেলাস তুলে নিয়ে অবনীশের হাতের কাছে এগিয়ে না দেয়। ডিটেকটিভ উপন্যাসের পাতার পর পাতায় ছড়ান ঘটনার শত রহস্য নিংড়েও কোন রসের স্বাদ অনুভব করা যায় না, যদি অবনীশের বই পড়বার সময় তার গা ঘেঁষে মুক্তাকণা না বসে থাকে।

বাজি রেখে মুক্তাকণারই সঙ্গে তাসের রং-মিল খেলে অবনীশ রায়। মুক্তাকণার কাছে মুঠো মুঠো টাকা হেরে যেতে অবনীশ রায়ের ভালই লাগে। একদিন জাগা চোখেই স্বপ্ন দেখেছে অবনীশ, মুক্তাকণার মুখটা যেন ফুলদানীর উপর রাখা রয়েছে। হাসছে মুক্তাকণার সুন্দর মুখ, কাঁপছে রঙিন ঠোঁট আর চোখের কালো তারা। মনে হয় অবনীশের, মুক্তাকণা যেন তার জীবনের চিরটা কাল এইভাবে মধুর মাদক হাসিতে ভরে দিয়ে তার চোখের সামনে এইভাবে ফুটন্ত রূপ নিয়ে বসে থাকবে।

খুশী হয়েছে, সুখী হয়েছে অবনীশ। তাই অজস্রভাবে অঢেল উপহারে মুক্তাকণার সব সুখের দাবিকেও পূর্ণ করে দেবার জন্য সবক্ষণ তৈরী হয়ে রয়েছে। মুক্তাকণার নিজের ব্যবহারের আলমারিতে তিনটে মখমলের বাক্স সোনার অলংকারে আর জড়োয়াতে ভরে গিয়েছে। একটা সুগন্ধ সাবান দু বার স্পর্শ করে না মুক্তা। অবনীশ নিজেই আপত্তি করে। বাসী সাবান গায়ে মাখলে মুক্তাকণার গায়ের চামড়া খসখসে হয়ে যেতে পারে, ভয় আছে অবনীশের মনে। আগ্রাতে থাকতেই মুক্তাকে কড়া হুকুম দিয়েছিল অবনীশ, "এখন থেকে রোজ আতর-জলে স্নান করবে মুক্তা। সাবধান, যেন ভুলেও কোন ভুল না হয়।"

এত বড় আদরের সিংহাসনে বসিয়ে রাখা হয়েছে যে-নারীকে, তাকেই আজও মাঝে মাঝে সন্দেহ করতে হয়। অবনীশ নিজেরই উপর রাগ করে। মিছিমিছি হঠাৎ ভয় পেয়ে এরকম সন্দেহ মনের ভিতর ডেকে আনবার কোন দরকার ছিল না। পালিয়ে যাবে না মুক্তা, চলে যাবার কোন লক্ষণও দেখা যায় না। কোন দিন কোন ভরা দুপুরের আলোতে জানালার পর্দা সরিয়ে পথের মানুষের মুখের দিকে তাকায়নি মুক্তা। কাউকে চিঠি দেয় না মুক্তা; পৃথিবীর কোন আনাচ-কানাচ থেকে মুক্তার নামে কোন চিঠি আসে না। অবনীশের আদরের জগৎ থেকে মুক্তাকণাকে চুরি করে নিয়ে যাবার মত কোন অভিসন্ধি এই পৃথিবীতে নেই। মুক্তা-কণার প্রাণটাকেই কিনে ফেলেছে অবনীশ। মুক্তাকণাও স্বীকার করে; মেয়েমানুষকে এমন করে এত বেশী ভালবাসা কোন স্বামীও বাসে না।

ওসব ভয় নয়। কিন্তু তবু কেমন যেন মনে হয়, এবং মাঝরাতের এই মুক্তাকণাকে জানালার কাছে ঐ মূর্তিতে ওভাবে দপ দপ করে চোখের তারা নাচিয়ে হাসতে দেখে অবনীশের মনের ভিতরটা যে শিহর সহ্য

করে, সেটা একরকমের ভয়েরই শিহর। মুক্তাকণার মনের গভীরে নিশ্চয় কোন বেদনা লুকিয়ে আছে। নিশ্চয়ই অবনীশকে প্রাণ ঢেলে ভালবাসতে মনের ভিতরে বাধছে। এবং একদিন এই বেদনার টানেই হয়ত অবনীশকে ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসিনী হবার জন্য কোথায় কোন আশ্রমের দিকে ছুটে চলে যাবে।

মুক্তাকণার খিল খিল হাসির স্বর শুনে অবনীশের চোখের তীব্র সন্দেহ ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে যায়। সেই সঙ্গে সরে যায়, ভয় এবং ভয়ের বেদনাও।

মুক্তাও বড় বুদ্ধিমতী। চট করে একটি মিনিটের মধ্যে কেমন সুন্দর আবার নতুন করে পরিপাটি সাজে সেজে অবনীশের সামনে এসে দাঁড়ায়। মুক্তাকণার গা-ভরা গহনার উপর আলোর আভা ঝলমল করে। মুক্তাকণার হাত ধরে সোফার উপর বসে অবনীশ।

মুক্তা হাসে, "তুমি হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে আর ছুটে এসে আমার মুখের দিকে ওরকম রাগ করে তাকাও কেন বল ত?"

অবনীশ হাসে, "তুমি কথা দাও, আর কখনও ওভাবে মাঝরাতে একা একা খোলা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে হাসবে না?"

আশ্চর্য হয় আর ফ্যাল ফ্যাল করে অবনীশের দিকে তাকায় মুক্তা। "কী বলছ তুমি? যত সব মিথ্যে কথা।"

"খুব সত্যি কথা বলছি।"

মুক্তা রাগ করে। "তাহলে বল, আমি একটা পাগল, নয় আমার মাথার রোগ আছে।"

আনমনার মত আক্ষেপ করে অবনীশ, "কে জানে?"

তার পরেই হেসে ওঠে অবনীশ, "তবুও ভাল।"

কোন উত্তর দেয় না মুক্তা। শুধু কুটিল একটা ভ্রূভঙ্গী, তার মধ্যে তীব্র একটা চতুরতার ছায়া লুকোচুরি খেলতে থাকে। জানে মুক্তাকণা, এবং আজও আবার অবনীশের ঐ আক্ষেপ আর অভিযোগের ভাষা শুনে বুঝতে পারে, কিসের সন্দেহে অবনীশের মাঝরাতের ঘুম-ভাঙা চোখ ওভাবে চমকে ওঠে। এক বছর ধরে এত টাকা আদর গহনা আর ভালবাসা দিয়ে কাছে ধরে রাখা নারীর মনটাকে কাছে পাওয়া গেল না, এই ত অবনীশের

সন্দেহ। সাসারামের ডাকবাংলোতে সেই শীতের রাতে অবনীশ স্পষ্ট ভাষায় মুক্তার কাছে এই অভিযোগ করতে গিয়ে ফুঁপিয়ে উঠেছিল। সত্যিই বড় ব্যথা পায় ছোট কুমার সাহেব। মুক্তাকণার ভালবাসায় কোন ঘাটতি কমতি ফাঁকি কিংবা ভেজাল আছে, ভাবতেই চমকে শিউরে আর চেঁচিয়ে প্রায় আধ-পাগলের মত হয়ে যায় ভদ্রলোক।

যেমন আগ্রার হোটেলে, সাসারামের ডাকবাংলোতে আর মধুপুরের গোলাপবাগে, তেমনই আজও হীরাপুরের এই বাড়িতে মাঝরাতের প্রহরে সোফার উপর বসে ফুর্তিময় জীবনের সব চেয়ে বড় সাধের সঙ্গিনী এই মুক্তাকণাকেই হঠাৎ ব্যাকুলভাবে বুকে জড়িয়ে প্রশ্ন করে অবনীশ, "সত্যি করে বল মুক্তা!"

এই প্রশ্ন শোনবার জন্যই মনে মনে তৈরী হয়েছিল মুক্তা। এই প্রশ্নের কী উত্তর দিতে হবে, তাও জানে মুক্তা, এবং মনে মনে সেই উত্তর তৈরি করেও রেখেছে। তাই প্রশ্ন শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই খিল খিল করে হেসে বলতে থাকে। "সত্যি করেই বলছি, তুমি আমার ভালবাসার দেবতা যে গো। আমার স্বামী তোমার চেয়ে ঢের ঢের বড়লোক ছিল, কিন্তু সে মানুষটা ত তোমার মত ভালবাসতে পারেনি কোনদিন। তাই ত ভাবি···ভাবলে আমার পরানটাই যে হেসে ওঠে গো, কী ভাগ্যের জোরেই না তোমাকে পেয়েছি।"

আর বেশী কিছু বলবার দরকার হয় না। অবনীশের ক্লান্ত নেশার সব উদ্বেগ দূর হয়ে যায়। ওই নারী, মুক্তাকণা যার নাম, যার দু চোখের কোলে সরু কাজলের টান এখন আরও মায়াময় হয়ে অবনীশের বুকের নিঃশ্বাসে টান ধরিয়ে দিচ্ছে, সেই নারী হল বিচিত্র এক কাহিনীর নারী। ওই কাহিনীটা না থাকলে মুক্তাকণা আজ মজিলনগরের ছোট কুমার সাহেব রায়জাদা অবনীশ রায়ের শৌখিন জীবনের সর্বক্ষণের আমোদের কাছে এত বড় আদরের জিনিস হয়ে উঠতে পারত না নিশ্চয়। বেশ উঁচু বংশের অতি বনেদী এক পরিবারের মেয়ে হল এই মুক্তাকণা। দিনাজপুরের মস্ত এক জমিদার বাড়ির বধূ হল এই মুক্তাকণা। যেমন বড়লোক, তেমনই শিক্ষিত সেই জমিদার। কিন্তু মুক্তাকণার দুর্ভাগ্য, স্বামী তাকে ভালবাসতে পারেনি। লেখাপড়া জানে না মুক্তাকণা, এই তার অপরাধ। একদিন, শ্রাবণের এক ভয়ানক ঝড়ের রাতে স্বামী হঠাৎ হিংস্রমূর্তি ধারণ করে

ঘুমন্ত মুক্তাকণাকে হাত ধরে টেনে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে ঘরের বাইরে ঠেলে দিয়েছিল, আর মুক্তার হাতে তুলে দিয়েছিল কাল বিষের শিশি। "যাও, আত্মহত্যা করে আমাকে নিশ্চিন্ত করে দাও।" শুধু এই কথা বলে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল সেই জমিদার স্বামী।

তারপর? সে-কাহিনীও শুনেছে অবনীশ। তারপর স্বামীবিতাড়িতা ওই মুক্তাকণা সন্ন্যাসিনী হবার জন্য কাশী রওনা হয়ে গেল। কিন্তু টাকা-পয়সার অভাবে কাশী পর্যন্তও পৌঁছতে পারেনি। গয়া পর্যন্ত এসে, এবং এক সরাইখানার কুঠরির ভিতরে আশ্রয় নিয়ে, আর ঘরের কপাট বন্ধ করে দু দিন ও দু রাত শুধু কেঁদেছিল।

তারপর? তারপরেই অদ্ভুত এক ঘটনার অনুগ্রহে অবনীশের সঙ্গে মুক্তাকণার দেখা হয়ে গেল। ভাগ্য ভাল, সেই সময়ে গয়া শহরেরই কাছে ফল্গুর ধারে অবনীশ রায় তার সেই নতুন বাংলোবাড়িতে ছিল। ভাগ্যিস সরাইখানার দারোয়ান সেই বাবুলালকে আগে থেকেই জানত অবনীশ। আরও ভাগ্যের কথা, বাবুলাল নামে সেই লোকটাও অনেক দিন থেকেই জানত, কি চান, কি খুঁজছেন, এবং কেমনটি পেলে খুশী হবেন ছোট কুমার সাহেব।

বাবুলাল এসে প্রথম খবরটা দিয়েছিল, "আপনি যেমনটি চান, ঠিক তেমনটি জিনিস পাওয়া গেছে হুজুর।"

"কোথায়? কে সে?" হুইস্কির ঢেকুর তুলে প্রশ্ন করে অবনীশ।

সরাইখানার ঘরে দরজা বন্ধ করে কাঁদছে সে। মস্ত বড় এক জমিদারের বউ। দেখতে যেমন সুন্দর, শরীরটিও তেমনি ডাগর, আর চলন বলন বড়ই শরিফ, বহুত বহুত মিঠা।"

"কেন? কিসের দুঃখে কাঁদছে?"

"স্বামী তাড়িয়ে দিয়েছে। তাই কাশী চলে গিয়ে সন্ন্যাসিনী হতে চায়।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় অবনীশ। চোখ জুড়ে তীব্র একটা পিপাসার উল্লাস জ্বল জ্বল করে। বাবুলালের হাত একশ টাকার নোট তুলে দিয়ে অনুরোধ করে অবনীশ, "চেষ্টা কর মুন্সী; যেন কোনমতেই হাতছাড়া না হয়।"

না, হাতছাড়া হয়নি। তাই ত আজ সেই নারী ছোট কুমার সাহেব অবনীশ রায়ের ফুর্তিময় জীবনের সঙ্গিনী হয়ে এই হীরাপুরের বাড়িতে

সোফার উপর বসে আছে, আজ তার গা-ভরা গহনা আলোর আভায় ঝলমল করছে।

মুক্তাকণার মুখের হাসিও ঝলমল করে ওঠে। মুক্তা বলে, "হ্যাঁ, এইবার ভাল করে একটা ঘুম দিয়ে মেজাজ ভাল করে নাও।"

হ্যাঁ, হীরাপুরের কালো অন্ধকারের রাত বোধ হয় এইবার শেষ হয়ে যাবে। তালগাছের পাতায় মাথা ঠুকে কোন রুগ্ন শকুন আর কাঁদে না। দূরের শালবনের দিক থেকে কাকের ডাকের সাড়া শোনা যায়।

বিছানার দিকে লক্ষ্য রেখে এগিয়ে যায় অবনীশ, আর মুক্তাকণা তেমনি সারা মুখের ঝলমল হাসি নিয়ে পান আর জরদার ডিবা খোঁজবার জন্য অন্য ঘরে চলে যায়।

হাঁপ ছেড়ে হেসে ফেলে মুক্তাকণা। বোধ হয় সরাইখানার দারোয়ান সেই বাবুলালের ধূর্ত চোখ দুটোকে মনে পড়ে যায়। বুদ্ধি আছে লোকটার। কী চমৎকার পরামর্শই না দিয়েছিল, আর কেমন সুন্দর একটা গল্পও তৈরি করেছিল লোকটা। মুক্তাকণার কাছ থেকেও এক শ টাকা দস্তুরি আদায় করেছে বাবুলাল। করুক, ভালই করেছে। বাবুলালের পরামর্শ না শুনলে এতদিনে বোধ হয় আবার তারকেশ্বরের সেই গানের ভিতরে ফিরে যেতে হত; কিংবা বেনারসের দালকামণ্ডি; নয়ত কয়লাখনির দেশ ঝরিয়ার বাজার। যত কিপটে ইয়ার আর গেরস্ত লুচ্চার সঙ্গে দুটো টাকার জন্য দরাদরি করবার ও একটা টাকা বকশিশ আদায়ের জন্য হয়রান হবার জীবন; যত ভ্যানতাড়া মাতালের খিস্তি সহ্য করা আর চাইয়ের বাবর হাতে মার খাওয়ার জীবন; বাড়িউলীর ফাইন দিতে দিতে, দালালের দস্তুরী যোগাতে যোগাতে, আর পুলিসের খরচা মেটাতে ফতুর হয়ে যাবার সেই জীবন কল্পনা করলে এখনও বুকের ভিতরটা ভয়ে শিউরে ওঠে।

জরদার সুগন্ধে নিঃশ্বাসের বাতাস মেতে উঠলেও মুক্তার মনের ভিতরটা যেন আবার হঠাৎ মিইয়ে যায়। কাজল-আঁকা চোখ আর পানচিবান রাঙা ঠোঁট থেকে সব হাসির শিহর ঝরে পড়ে যায়। দুরদুর করে বুক। যদি কোন মুহূর্তে কোন কথার ভুলে ধরা পড়ে যায় মুক্তা! যদি একবার বুঝে ফেলতে পারে অবনীশ যে, এই মুক্তা হল তারকেশ্বরের মুকতো, আর ঝরিয়া বাজারের মুক্তাবাঈ? তবে? থরথর করে কাঁপতে থাকে মুক্তার গায়ের ঝকঝকে সোনার গয়নাগুলি। কখনই ক্ষমা করবে না, এক মুহূর্তও

বোধ হয় আর দ্বিধা করবে না ওই শৌখিন কুমার সাহেব; পিস্তল তুলে নিয়ে এসে এক মুহূর্তের মধ্যেই মুক্তার এই ভয়ানক ছলনার হিসেব-নিকেশ করে দেবে।

খুব সাবধান! যেন কখনই ধরে না ফেলতে পারে অবনীশ! মুক্তা তার ভীরু মনটাকেই সাবধান করে দিয়ে, আবার চোখের চাহনিটাকে চতুর করে তুলতে থাকে। জানুক অবনীশ, চিরকাল ধরে জানুক, পৃথিবীর একটা বাজে গলির বাজে মেয়েমানুষ নয়, মস্তবড় এক জমিদার বাড়ির ঘরছাড়া বধূ তার ফুর্তিময় জীবনের একটা অদ্ভুত শখের ক্ষুধা মেটাবার জন্য তারই সঙ্গিনী হয়ে রয়েছে।

নিজেকে আরও ভাল করে বুঝিয়ে আরও সাবধান করে রাখে মুক্তা-কণা। যদি কোনদিন অবনীশের মনের কোন চালাক সন্দেহের কাছে এই ছলনাটা ধরা-পড়-পড় হয়, তবে সেদিন আরও ভাল করে হেসে ঢলে লোকটাকে ভুলিয়ে, আরও মদ গিলিয়ে, এবং আরও আদর করে ঘুম পাড়িয়ে শুধু গয়নার বাক্স আর টাকাগুলি নিয়ে সরে পড়তেই হবে। বড়লোকের পিস্তলের গুলি খেয়ে মরতে হবে কেন? কী আমার সোহাগের পিস্তল রে!

আর কিছুক্ষণ পরে, যখন সকালের ঘুমের পালা শেষ করে আবার উঠে বসবে অবনীশ, তখন আতর-জলে স্নান করে আর ভিজে চুল এলিয়ে দিয়ে অবনীশের চোখের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবে অবনীশের চোখ। জয়ন্তীর মত মস্ত বড় ঘরের এক নারীর দেহ আর মন কিনে ফেলা গর্বের আবেগে বিহ্বল হয়ে মুক্তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে অবনীশ।

ঠিকই ভেবেছে মুক্তা। সকাল হতেই আবার সেই গল্প গান আর হাসির পালা; সেই হুইস্কি, কবুতরের মাংস, ডিটেকটিভ উপন্যাস আর তাসের রং-মিল। শৌখিন ফুর্তিবাজের জীবনে সব আমোদের মেজাজ রংএ ঢংএ মাতিয়ে তুলতে একটুও ভুল করে না মুক্তা।

অবনীশ বলে, "তুমি কিন্তু আজ আবার মাঝরাতে ওরকম ভুতে-পাওয়া মানুষের মত চেহারা নিয়ে খোলা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে হাসবে না।"

ভ্রূকুটি করে মুক্তা, "এ রকম একটা মিথ্যে কথা কেন বলছ গো?"

অবনীশ বলে, "মিথ্যে কথা নয়। খুব সত্যি কথা বলছি।"

মুক্তা জানে, মিথ্যা কথাই বলেছে অবনীশ। সন্দেহের মানুষ নেশার চোখে ওইরকমই দেখে থাকে। মুক্তাও তার ভ্রূকুটিতে একটু অভিমানের ভান ভরে দিয়ে অভিযোগ করে, "তুমিও মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে ওরকম চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আমাকে সন্দেহ করতে পারবে না।"

অবনীশ হাসে। কিন্তু মুক্তা আরও গভীর অভিমানে একেবারে যেন ভেঙে পড়তে চায়। "উঃ, তুমি যখন 'কে তুমি' বলে চেঁচিয়ে ওঠ, তখন আমার যে কী ভয় করে, কি আর বলব?"

অবনীশ বলে, "না, আর কখনও ওকথা বলব না মুক্তা।"

কিন্তু সন্ধ্যা পার হলেই এই দুই জীবনের সব আমোদের মেজাজ ধীরে ধীরে থিতিয়ে আসে। তার পর আরও কিছুক্ষণ, এবং তার পর আরও কিছুক্ষণ, এবং তার পরেই যখন স্তব্ধ পৃথিবীর বুক জুড়ে ঘন অন্ধকার থম-থম করে, তখন মাঝরাতের প্রহরটা আবার ঠিক সেই রহস্যময় অভিশাপ নিয়ে দেখা দেয়। দিনের বেলার এত শক্ত প্রতিজ্ঞাটা যেন অলস অবসাদে ঝিমিয়ে পড়ে। খোলা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ঘন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে মুক্তার চোখ দুটো দপ দপ করে হাসে। হঠাৎ ঘুম-ভাঙা চোখে চমকে ওঠে অবনীশ। তারপর, ঠিক সেই সব প্রশ্ন। সেই সন্দেহ আর ভয়। সেই অভিযোগ। শেষে সেই খিলখিল হাসি এবং আবার নিশ্চিন্ত মনে সোফার উপরে বসে দুজনের সেই রকমেরই গল্প।

অবনীশ বিরক্ত হয়ে বলে, "নাঃ, এই বাড়িটাও একটা অপয়া বাড়ি মুক্তা। ভাবছি, এইবার কোন একটা গেঁয়ো বাগানবাড়িতে গিয়ে থাকব।"

ছোট কুমার সাহেবের এস্টেটের অনেক বাগানবাড়ি আছে। তার মধ্যে সব চেয়ে ভাল বাগানবাড়ি হল এই বাড়ি। চার বিঘা জুড়ে বাতাবি লেবুর বাগান। দুটো বড় পুকুর, একটা পুকুরের মাঝখানে জলটুঙ্গি আছে, ছোট একটা পানসিও সে পুকুরের এক কোণে জলের উপর ভাসে।

মুক্তাকণার হাত ধরে মোটরগাড়ি থেকে নেমে অবনীশ যখন বাগান-বাড়ির ফটকের মাটিতে দাঁড়ায়, তখন সন্ধ্যা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। দূরে কানা দামোদরের কিনারায় কাশবনের সাদার ভিড় তখনও একটু-একটু চেনা যায়। বাতাবী লেবুর ফুলের গন্ধে শুধু সন্ধ্যার বাতাস নয়,

সন্ধ্যার অন্ধকারটাও যেন ভরে গিয়েছে। অবনীশের মনে হয়, ভালই হল, এরকম সুগন্ধভরা অন্ধকারকে বোধ হয় মাঝরাতের কোন প্রহরের অভিশাপ সহ্য করতে হবে না। মুক্তাকণার মাথার রোগ সেরে যাবে।

মুক্তা বলে, "এটা আবার কেমন জায়গায় এলাম গো!"

"এটা আমার সব চেয়ে বেশী পছন্দের বাগানবাড়ি; নাম প্রিয়নিকুঞ্জ।"

"গাঁয়ের নাম কী?"

"ভুবনপুর।"

চমকে ওঠে মুক্তা, "সে কি গো!"

অবনীশ হাসে "হ্যাঁ গো, আর ওই যে একটু দূরে নদীটাকে এখন খুব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, ওটা হল কানা দামোদর।"

যেন ভয় পেয়ে ফিসফিস করে মুক্তা, "সে কি গো!"

ছোট কুমার সাহেবের প্রিয়নিকুঞ্জে ফুর্তিময় জীবনের কোন উপাদানের অভাব ছিল না। ছিল স্কচ হুইস্কি; ছিল কবুতরের মাংস, ডিটেকটিভ উপন্যাস আর তাস। তার উপর ছিল শালুক ছড়ান বড় পুকুরের জলের উপর ভেসে বেড়াবার পানসি, আর বাতাবি লেবুর ফুলের গন্ধে আকুল হওয়া অন্ধকার।

প্রিয়নিকুঞ্জের একটি ঘরে ফরাসের উপর বসে অবনীশের সঙ্গে যখন তাসের রং-মিল খেলে মুক্তা, তখন তার গা-ভরা সোনার গয়না তেমনই ফুর্তির উল্লাসে ঝলমল করে। তারপর অবনীশের হাতে হুইস্কি ভরা গেলাস শিথিল ভাবে যখন কাঁপতে থাকে, তখন নীরব হয়ে যায় রাত্রিটা। এবং তার পরেই কে জানে কতক্ষণ পরে, মাঝরাতের প্রহরে ঘুম-ভাঙা চোখ তুলে তাকাতে গিয়েই দেখতে পায় অবনীশ, কাছে নেই মুক্তা।

আজ আর চেঁচিয়ে ওঠে না অবনীশ। মায়া বোধ করে। চেঁচিয়ে ধমক দিতে ইচ্ছে করে না। মুক্তার মাথার রোগটা বড় নিষ্ঠুর। বড় বেশী কষ্ট পাচ্ছে বেচারা!

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায় অবনীশ। পা টিপে টিপে চলতে থাকে। ঘরের পর ঘর পার হয়ে খুঁজতে খুঁজতে শেষে দেখতে পায় অবনীশ, হ্যাঁ, ঠিকই, দক্ষিণের খোলা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে মুক্তা।

সত্যিই বড় সুগন্ধ ভরা অন্ধকার। মুক্তাকণার মুখটাকে দেখতে একটুও

আশ্চর্য লাগে না, ভয় ত দূরের কথা; বড় বেশী করুণ দেখাচ্ছে মুক্তাকে। চোখ দুটো হাসি-হাসি, কিন্তু চোখের কাজল যেন ভিজে গিয়েছে মনে হয়। বেচারা! কে জানে কেমন একটা মনের রোগে রোজ এই কাণ্ডটা করে, কিন্তু নিজে কিছুই বুঝতে পারে না। এটাও বোধ হয় নিশির ডাক শোনার মত একটা রোগ।

পা টিপে টিপে মুক্তার ঠিক পিছনে এসে দাঁড়ায় অবনীশ। আরও ভাল করে মুক্তার মুখটাকে দেখতে পাওয়া যায় দেখতে থাকে অবনীশ। কিন্তু কী আশ্চর্য, মুক্তা যেন জাগা চোখেই ঘুমোচ্ছে। দেখতে পাচ্ছে না মুক্তা, কত কাছে দাঁড়িয়ে আছে অবনীশ।

কী দেখছে মুক্তা? কী-ই বুঝতে পারছে মুক্তা? ঐ যে কানা দামোদরের কিনারায় কাশবনের হাওয়ায় শ্বাসটানা শব্দের মত একটা স্বর ছুটে ছুটে বেড়ায়, তারই পাশে শ্মশান। দশ গাঁয়ের মড়া ওখানে এসে পুড়ে ছাই হয়। আরও একটু দূরে, ওই যে একটা বাতি মিটমিট করছে, ওটা হল লক্ষ্মাহাটির কলুবাড়ির বাতি। গাঁয়ের আর সব ঘরের চেহারা এখন আর দেখা যায় না। আর, আরও দূরে ওই যে মাঠের একটা জায়গার অন্ধকার লাল হয়ে রয়েছে, ওটা হল নায়েবডাঙা, চাষীরা আখের রস জ্বাল দিচ্ছে। এই সবই যে, কানা দামোদরের এপার আর ওপারের বিশটা গ্রামই অবনীশ রায়ের জমিদারি।

কানা দামোদরের কিনারায় কাশের বনে একটা ঝড় উথলে উঠছে বলে মনে হয়। শ্মশানের আশে পাশে দপ দপ করে নেচে একটা আলেয়া দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে। দেখতে পায় অবনীশ, দু চোখ অপলক করে তাকিয়ে আছে মুক্তা।

"মুক্তা?"

ডাক শুনে মুখ ফেরায় মুক্তা। তার পরেই চমকে উঠে উত্তর দেয়, "কী বলছ?"

অবনীশ হাসে, "ওই যে দপ দপ করে একটা আলো নেচে নেচে দৌড়চ্ছে, ওটা কী?"

"জানি না।"

"ওটা একটা আলেয়া।"

"আলেয়া!" ভয়ে শিউরে উঠে অবনীশের বুক ঘেঁষে দাঁড়ায় মুক্তা।

অবনীশ হাসে, "গাঁয়ের লোক বলে, ওটা হল জঙ্গালীর হাসি।"

"কী বললে ?" চেঁচিয়ে ওঠে মুক্তা। থরথর করে কাঁপতে থাকে মুক্তার গলার স্বর।

অবনীশ বলে, "জঙ্গালীর হাসি।"

অবনীশের হাত ধরে কাঁপতে কাঁপতে কেঁদে ফেলে মুক্তা, "সত্যি করে বল, আমাকে একটু বুঝিয়ে বল না গো, আলেয়াটা জঙ্গালীর হাসি কেন হবে?"

মুক্তার মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেয় অবনীশ, "ওটা একটা গল্প, তুমি মিথ্যে এত ভয় পেও না মুক্তা।"

চোখ টান করে তাকায় মুক্তা, "গল্প?"

"হ্যাঁ। লক্ষ্মীহাটি নামে ওই গাঁয়ে একটা লোক থাকত, কে জানে কোন একটা বুনো কিংবা বেদে জাতের লোক। লোকটার বউটা কিন্তু দেখতে বড় সুন্দর ছিল।

"কী করত লোকটা ?"

"লোকটা যত শিকড় বাকড় আর সাপের কামড়ের ওষুধ হাটে হাটে বিক্রি করে বেড়াত। কিন্তু লোকটাকে রোগে ধরল। আর খাটতে পারত না লোকটা। তখন বউটাই খেটে বেড়াতে শুরু করল।

মুক্তা যেন স্বপ্নের মধ্যে বিড়বিড় করে, "তা, কী আর করবে বল? দুটো পেটে খেয়ে বাঁচতে হবে, আর সোয়ামিটাকেও বাঁচাতে হবে ত?"

"হ্যাঁ, তাই ত। কিন্তু শাক বেচে, পরের বাড়িতে ঢেঁকি কুটেও কিছু হল না। তখন বউটা···"

"বউটার নামটা কী?"

"হ্যাঁ, ওই বউটারই নাম ছিল জঙ্গালী! শেষে বউটা প্রায়ই গাঁ ছেড়ে গঞ্জের দিকে চলে যেত। মাঝে মাঝে বাইরে রাত কাটিয়েও ঘরে ফিরত।"

"মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাবার দুর্ভাগ্যি হলে, আর কোন উপায় না থাকলে, ও-পথে না গিয়ে কোন পথে যাবে বল?"

"তাই ত বলছি। টাকা-পয়সা নিয়ে ঘরে ফিরত জঙ্গালী। স্বামীর জন্য কবরেজী ওষুধ আর ভাল ভাল ধুতি-গামছাও নিয়ে আসত। কিন্তু স্বামীটা কতবার জঙ্গালীর হাত ধরে সেধে বলেছে, "আমাকে সুখে মরতে দে জঙ্গালী, তুই আর বাইরে যাসনে। কিন্তু কে শোনে কার কথা? তারপর একদিন···।"

কানা দামোদরের কিনারায় কাশবনের ধারে শ্মশানের আশে পাশে তখনও সেই আলেয়াটা দৌড়াদৌড়ি করছে। সেই দিকে তাকিয়ে অবনীশ বলে,

"গাঁয়ের লোকেরা বলে, পুরো সাতটা দিন আর রাত বাইরে কাটিয়ে একদিন ঠিক মাঝরাতের সময় গা-ভরা গয়না বাজিয়ে ঘরে ফিরে এল জঞ্জালী।"

মুক্তাকণার দু চোখের তারা দুটো যেন দপ করে জ্বলে ওঠে, "মিথ্যে কথা, ভয়ানক মিথ্যুক গাঁয়ের লোকগুলো। গা-ভরা গয়না অত সস্তা নয়।"

"যাই হক। জঞ্জালী ঘরে ফিরে আসতেই গাঁয়ের লোকে লাঠি হাতে নিয়ে তেড়ে এসে বলে, ঘরে নয় ঘরে নয়, হোই শ্মশানের দিকে চলে যা জঞ্জালী।"

দু চোখের দৃষ্টি উদাস করে তাকিয়ে, আর যেন দম বন্ধ করে অবনীশের গল্প শুনতে থাকে মুক্তা অবনীশ বলে, "স্বামীটা সেদিনই দুপুরে মরে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ ধরে শ্মশানের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ছিল জঞ্জালী। ওর স্বামীর চিতার আগুন তখনও ধিকধিক করে জ্বলছিল।"

"তার পর কী করল জঞ্জালী?" মুক্তাকণা যেন দাঁতে দাঁত ঘষে প্রশ্ন করে।

অবনীশ বলে, "গাঁয়ের লোক বলে, অনেকক্ষণ ধরে বেশ শান্ত ভাবে দাঁড়িয়ে তারপরেই এক গাল হাসি হেসে গাঁয়ের এতগুলি লোকের সামনেই হঠাৎ যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল জঞ্জালী।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, সিগারেট ধরায় অবনীশ। তারপরেই হো হো করে হেসে উঠে বলে, "কিন্তু গাঁয়ের লোকগুলো বলে কী জান? পালিয়ে যায়নি জঞ্জালী। এখনও মাঝরাতে ঐ শ্মশানের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায় জঞ্জালী। ঐ যে আলেয়া, ওটা আলেয়া নয়, ওটাই হল জঞ্জালীর হাসি।"

গল্প শেষ করেই চমকে ওঠে অবনীশ। এ কী করছে মুক্তা? মাথা হেঁট করে আর আঁচলে মুখ লুকিয়ে, এমন করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে কেন মুক্তা?

"কী হল মুক্তা?" মুক্তার মাথাটা টেনে তোলে অবনীশ।

মুক্তা বলে, "গাঁয়ের লোক বড় মিথ্যে কথা বলতে পারে গো। কী সব্বনেশে মিথ্যে কথা!"

অবনীশের চোখের চাহনি হঠাৎ এক ভয়ানক দুঃসহ ও তীব্র সন্দেহের জ্বালায় যন্ত্রণাক্ত হয়ে ছটফট করে। চিৎকার করে অবনীশ, "কী বললে মুক্তা?"

মুক্তা বলে, "ওটা জঞ্জালীর হাসি নয় গো, ওটা যে জঞ্জালীর জ্বালা।"

"কী বললে ? তুমি এ-কথা বলছ কেন ? কে তুমি ?" বলতে বলতে, হিংস্র পাগলের মত মূর্তি ধরে ভিতরের ঘরের দিকে ছুটে যায় আর পিস্তল হাতে নিয়ে ফিরে এসে মুক্তার চোখের সামনে শক্ত হয়ে দাঁড়ায় অবনীশ।

"কে তুমি ?" অবনীশের গর্জনের মধ্যেই যেন আগুনের জ্বালা ঝলক দিয়ে ওঠে।

"আমিই ত। আমি জঞ্জালী।" শান্ত ও অবিচল স্বরে উত্তর দেয় মুক্তা। একটুও ভয় পায় না, একটুও কাঁপে না, অদ্ভুত একটা গর্বের আবেগে সোজা মাথা তুলে তাকিয়ে থাকে মুক্তা।

ছোট কুমার সাহেবের সেই প্রিয়নিকুঞ্জে মাঝরাতের বাতাসে পিস্তলের শব্দ বেজে উঠবার পর বারুদের ধোঁয়ার ক্ষীণ গন্ধও অল্পক্ষণ পরেই মিলিয়ে যায়। কী আশ্চর্য, একটা আর্তনাদও করেনি মুক্তাকণা। রক্তমাখা বুকে হাত রেখে, চোখ বন্ধ করে, খুব জোরে একটা হাঁফ ছেড়ে, সেই সুগন্ধভরা অন্ধকারের দিকে শেষবারের মত তাকিয়ে যেন শেষ-ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ল মুক্তাকণা।

কানা দামোদরের কিনারাতে কাশবন আজও আছে, আর তার পাশে সেই শ্মশানে আজও মাঝরাতে আলেয়া ছুটাছুটি করে। কিন্তু প্রিয়নিকুঞ্জ আর নেই, সেখানে শুধু কয়েকটা পুরনো ইটের ভাঙা দেওয়াল দাঁড়িয়ে আছে। ছোট কুমার সাহেব রায়জাদা অবনীশ রায় আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর হল বাতাবী লেবুর ফুলের সুগন্ধে আকুল এক সন্ধ্যায় ছটফট করে মরে গিয়েছেন।

কিন্তু কে জানে কেমন করে আর কবে, গাঁয়ের লোকের মুখে গল্পটা ভাষা বদল করে ফেলল। হাসিটা জ্বালা হয়ে গেল। লক্ষ্মীহাটির শ্মশানে মাঝরাতে আলেয়াকে দৌড়তে দেখলে আজকের গাঁয়ের লোক গম্ভীরভাবে বলে, "হোই দেখ, জঞ্জালীর জ্বালা আবার ছটফটিয়ে ছুটতে নেগেছে।"

স্বপ্নাতীত

রাস্তার মোড়ে একই সারিতে পর পর অনেকগুলি দোকান। কোনটাতে আলু-পেঁয়াজ, কোনটাতে বেনেতি মশলা; পাশাপাশি তিনটে দোকানে রকমারি মনোহারি সাজান। একটাতে সাদা সাদা আর হলদে গোল্লার স্তূপ, কাপড়-কাচা সাবানের দোকান। রেডি-মেড জামা ছিটের পীস বিক্রি হয় একটা দোকানে। আর পাশেরটা হল পিতল-কাঁসার বাসনের দোকান। এরই মধ্যে একটি দোকান হল ফুলের দোকান।

সব দোকানের মধ্যে ক্রেতার ভিড় সব চেয়ে কম দেখা যায় এই ফুলের দোকানে। অথচ ফুলওয়ালা রমেশ এতগুলি ব্যস্ত দোকানের মধ্যে সব চেয়ে বেশী অব্যস্ত তার এই ফুলের দোকানে কাঠের পাটাতনের উপর সব চেয়ে বেশী অহংকারের মূর্তি নিয়ে চুপ করে বসে থাকে।

কত রকমের বাহারে পাতার গুচ্ছ। বেল আর জুঁই-এর ছোট ছোট দুটি পাহাড় আকারের স্তূপ। সাদা শালুক আর পদ্মের গাদাটা এই উঁচু একটা ঢিবির মত। সাদা হলদে আর লাল গোলাপের তোড়া আছে। জবা করবী আর কাঠগোলাপ ছড়াছড়ি করে পড়ে আছে। এক ঝুড়ি দোপাটি। কাঁটাভরা এক রাশ কেতকীও জলে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে। পথের মোড়ের যত ধুলো আর তেলেভাজা ধোঁয়ার কড়া ঝাঁঝালো গন্ধের মধ্যে ফুলওয়ালা রমেশের দোকান যেন একটি স্নিগ্ধ সুরভিত ঠাঁই সৃষ্টি করে পড়ে আছে।

ক্রেতার ভিড় হয় না। না হক, অন্তত দর্শকের ভিড় হক; কিন্তু তাও যে হয় না। এত বড় ডাঁটাসুদ্ধ রজনীগন্ধার কুঁড়ির থোকা দোকানের পাটাতনের গায়ে হেলান দিয়ে পড়ে রয়েছে, মিষ্টি গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে, তবু এমন মানুষ খুব কমই দেখা যায়, যে একবার থমকে দাঁড়িয়েছে আর ওই তাজা রজনীগন্ধার বড় বড় কুঁড়ির থোকা দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে।

না কিনুক, এসে অন্তত একটু দরাদরি করুক। দর পছন্দ না করুক, অন্তত ফুলের গন্ধ আর বাহার একটু পছন্দ করে চলে যাক। মাত্র এত-টুকু আশা করে রমেশ। কিন্তু রমেশের এই সামান্য আশাও যে সফল হয় না। দোকানের পাটাতনের উপর চুপ করে বসে দেখতে থাকে রমেশ, পথের কিনারায় বসে তোলা উনুন জ্বেলে পাঁপড় ভাজছে যে লোকটা সে-লোকটা ক্রেতার দাবি সেরে উঠতে পারছে না। উনুন ঘিরে ক্রেতার ভিড় জমে রয়েছে। এক আনার গরম গরম ভাজা পাঁপড় খেয়ে তখুনি মুখ মুছে আবার এক আনার পাঁপড়ের জন্য অনেকেই হাঁক দিচ্ছে।

কিন্তু রমেশের দোকানে ফুলের স্তূপ শুধু পড়ে থেকে থেকেই শুকিয়ে যায় মাঝে মাঝে জলের ছিটে দেয় রমেশ। কিন্তু তাতেই বা কী সুবিধা হবে? বাসী হতে হতে পচেই যাবে ফুলগুলি।

সামনেই কাঁচা বাজারের ছোট ছোট একচালা। দেখতে পায় রমেশ, সেখানেও লোকে একরকমের ফুল কেনে। সে-ফুল দেখতে সুন্দরও বটে। বক ফুল, কুমড়ো ফুল, সজনে ফুল। যে-ফুল খাওয়া যায়, সে-ফুলের আদর আছে বটে। কিন্তু সে-আদর কি ফুলের আদর?

প্রতিদিন দোকান খুলবার সময় গাদাগাদা বাসী ফুল, শুকনো ফুল আর পচা ফুল ফেলে দিতে হয়। রমেশ নিজের হাতেই এই সব পচা গলা মরা ফুলের বোঝা তুলে নিয়ে গিয়ে মাঠের এক কোণে দাঁড়িয়ে গরুর মুখের কাছে ফেলে দেয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে, গরুতে শেষে ফুলটাও না খেয়ে ফেলে রেখে গেল না ত

পাশের মশলা দোকানের নিকুঞ্জ বলে, "একটু দাম কমাও রমেশদা, দাম কমাও। এত চড়া দামে এ-সব অকাজের জিনিস মানুষে কিনবে কেন বল?"

হ্যাঁ অকাজের জিনিস বটে। রজনীগন্ধা আর কেতকীকে মুগের ডালের বেশন দিয়ে মাখামাখি করে ত আর তেলে ভেজে খাওয়া যায় না। ঠিকই; কিন্তু দাম কমায় না রমেশ। গাদা গাদা ফুল বাসী হয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, যাক, গরুতেই খাক, তবু পাঁপড়-খেকো মানুষের অনুগ্রহ লাভের জন্য ফুলের দাম কমিয়ে দিতে রাজী নয় রমেশ।

এক একদিন রমেশের দোকানে বেশ একটু ভিড় দেখা দেয়। এই দিনগুলি হল পূজা পার্বণের দিন। কেউ দু পয়সার এবং কেউ বা এক

আনার ফুল কেনে। তবু এই অল্প অল্প বিক্রির জের সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলে। মোটামুটি বেশ কিছু বিক্রিও হয়ে যায়, লাভও মন্দ হয় না, কিন্তু তেমন খুশী হয় না রমেশ। ঠিক ফুলের আদরের জন্য এই ক্রেতার ভিড় নয়। দেবতাকে আদর করবে আর খুশী করবে ফুল দিয়ে, এই মাত্র।

এমন কি, কোন কোন দিন যখন অনেকগুলি মোটা মোটা ফুলের মালা বিক্রি হয়ে যায়, তখন খোঁজ করে রমেশ, "শহরে আজ কোন লীডার এসেছে নাকি নিকুঞ্জ?"

নিকুঞ্জ বলে, "হ্যাঁ, তিনজন লীডার এসেছেন।"

পথের উপর নতুন খাটিয়া নামিয়ে রেখে যখন খালি পায়ে একজন ক্রেতা এসে দাঁড়ায়, তখন রমেশ একটু গম্ভীর হলেও মনে মনে খুশী হয়। যাই হক, মরা মানুষের সঙ্গে তবু কিছু ফুল দিয়ে দেবার কথা মানুষগুলোর মনে হয়েছে।

ক্রেতা হল শ্মশানযাত্রী। পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে কেউ একজন চির-কালের মত বিদায় নিয়েছেন। তাই ফুলের ডাক পড়েছে।

ফুলের দাম একটু কমিয়ে এবং কখনও বা বেশ একটু সস্তা করে দেয় রমেশ, "নিন নিন, আরও দুটো তোড়া নিন। যা হক একটা দাম ধরে দিয়ে চলে যান।"

বলতে বলতে আরও গম্ভীর হয় রমেশ। "পেটের দায়ে ফুল বেচতে হয় মশাই। নইলে এসব কাজে কি আর ফুলের দাম নিতাম। কখনই না। একটা মানুষ চলে যাচ্ছে, তাকে আমিও ত কিছু ফুল উপহার দিতে পারি!"

ফাউ হিসাবে এক গাদা দোপাটি আর গোটা চারেক পদ্ম ক্রেতার হাতে তুলে দেয় রমেশ।

ফুলের আদর আছে তাহলে। এবং যারা ফুলকে ভালবাসে বলেই কিনতে আসে, তাদেরই সব চেয়ে বেশী শ্রদ্ধা করে রমেশ। তা ছাড়া আরও এক রকমের মানুষ আছে, যারা জীবনের আনন্দকেই ফুল দিয়ে সাজাতে ভালবাসে। এদেরও খুব ভালবাসে রমেশ। এরকম ক্রেতাও যে নেই, তা নয়। এই রকমের ক্রেতাদের মধ্যে দুজনের মুখ বড় বেশী চেনা হয়ে গিয়েছে। প্রায়ই এরা আসে। কখনও একসঙ্গে এবং কখনও বা একা একাই।

নিকুঞ্জ বলে, "আমি চিনি। এই মেয়েটিই হল চাটুজ্যে বাবুর বড় মেয়ে।"

কাঁসার বাসন ওজন করতে করতে অনাদি বলে, "ওই ছেলেটিকেও আমি চিনি। নতুন রাস্তায় ওই যে অত বড় বাড়ি, সেই উকিল সনাতন বাবুর ছেলে। বিলেত থেকে ফিরেছে।"

কিসের জন্য ওই মেয়ে আর ওই ছেলে ফুলের আদর করে, সে-রহস্য বুঝতে রমেশের একটুকু অসুবিধা হয় না। বুঝতেই ত পারা যাচ্ছে যে, দুজনের মধ্যে ভালবাসাবাসির পালা চলেছে। বেশ ত, ভালই ত। ভালবাসার রূপটিকে আরও সুন্দর, আরও রঙিন করবার জন্যই ত ওরা ফুল কিনে নিয়ে যায়।

রমেশের মূর্তিটা আরও একটু অহংকারের ভঙ্গী ধরে, এবং হেসে হেসে নিকুঞ্জকে ঠাট্টা করে রমেশ, "তোদের দোকানের খদ্দের আসে যত রাক্ষসের দল। শুধু খাই আর খাই। কিন্তু আমার দোকানে কারা আসে দেখছিস ত? হয় পুজো, নয় প্রেম, নয় ফুর্তি।"

হ্যাঁ, ফুর্তির বাবুরাও মাঝে মাঝে এসে বেল-জুঁইএর মালা কিনে নিয়ে যায়। বাইজী বাড়ি গিয়ে গান শুনবে আর নাচ দেখবে ওরা। মনে মনে এদেরও উপর কোন ঘৃণা বোধ করে না রমেশ। তবু ত, ভেজে খাবার জন্য নয়, গান শোনার আর নাচ দেখবার আনন্দকেই রঙে আর গন্ধে একটু সুন্দর করে নেবার জন্য ওরা ফুল কিনতে আসে।

বিক্রি কম, লাভ কম, কিন্তু রমেশের অহংকারের কোন কমতি নেই। এবং ফুলের দোকানের এই পাটাতনের উপর বসে সে টিটকারি দিয়ে আশেপাশের যত মশলা, বাসন, সাবান, ছিটের কাপড়, আর মনোহারিকে তুচ্ছ করতে থাকে। "বেচলে সেরা জিনিস বেচব, যে-জিনিসকে মানুষ আদর করে মাথায় তোলে, গলায় জড়ায় আর বুকে রাখে।"

রমেশ এই অহংকারে একেবারে মত্ত হয়ে উঠল সেদিন, যেদিন নতুন রাস্তার সনাতন উকিলের বাজার সরকার মশাই নিজে ফুল কিনতে এলেন।

আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে রমেশ, "এত ফুল আজ হঠাৎ কিসের জন্য দরকার হল?"

সরকার মশাই বলেন, "ফুলশয্যা।"

"কার বিয়ে হল?" চেঁচিয়ে ওঠে রমেশ।

"বাবুর মেজ ছেলে, বিলেত থেকে ফিরে এসেছে যে, তারই বিয়ে হয়ে গেল।"

"কার সঙ্গে?" আরও জোরে চেঁচিয়ে ওঠে রমেশ।

সরকার মশাই বলেন, "চাটুজ্যে বাবুর বড় মেয়ের সঙ্গে।"

খুশিতে আত্মহারা হয়ে ফুল বাছতে থাকে রমেশ। এতদিনে যেন রমেশের দোকানের একটি স্বপ্ন সত্য হয়েছে। বেছে বেছে টাটকা তাজা ফুল, গন্ধে আকুল চাঁপা হাস্নাহানা আর রজনীগন্ধা রাশি রাশি তুলে নিয়ে কলাপাতায় জড়িয়ে বড় বড় প্যাকেট করে বাঁধতে থাকে রমেশ।

দশ টাকার ফুল বিক্রি হয়ে গেল। কিন্তু দশ টাকার নোটটার দিকে যেন তাকাতেই চায় না রমেশ। বার বার নিকুঞ্জকে ডাক দিয়ে বলে, "দেখলি ত, আমার ফুলের ঘটকালি দেখলি?"

নিকুঞ্জ হাসে, "হ্যাঁ, দেখলুম বটে।"

রমেশও হাসে, "হ্যাঁ, মনে রাখিস তাহলে। এ হল ফুল। তোর ওই মশলা নয়, আর হরনাথের ওই কয়লাও নয়।"

দিন যায়। রমেশের গর্ব যেমন, তার ফুলের দোকানের দামও তেমন, আর তার দোকানের ওই এক একটা আনন্দের স্বপ্নও তেমনি মাথা উঁচু করে বসে থাকে। কোন ব্যতিক্রম হয় না।

মাঝে মাঝে শুধু মনে পড়ে, এবং ভাবতে একটু দুঃখও হয়, চাটুজ্যে বাবুর মেয়ে আর সনাতন উকিলের ছেলের জীবনে ফুলের দরকার কি ফুরিয়ে গেল? যে-ফুলের স্নেহ ওদের দুজনের জীবনকে মিলিয়ে দিল, মিলে যাবার পর সেই ফুলকে কি এমন করে ভুলে যেতে হয়?

দেড় বছরেরও বেশী সময় পার হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে একটি দিনও ওই দুজনের কেউ আর এল না। না আসুক। স্বামী-স্ত্রী হয়ে এখন সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ওরা, উঠুক। তবু অন্তত চাকরকে পাঠিয়ে একটা-দুটো তোড়া কিনতে পারা যায় ত!

রমেশকে আশ্চর্য করে দিয়ে সেদিনই সকালে দেখা দিল সনাতন উকিলের সরকার মশাই। "কিছু ফুল চাই। নরম নরম, অথচ বেশ রঙিন আর সুগন্ধ।"

"এই নিন না, কত নেবেন।" উৎফুল্ল হয়ে ফুল বাছতে থাকে রমেশ।

তার পরেই কৌতূহল সামলাতে না পেরে প্রশ্ন করে, "কিন্তু ব্যাপারটা কী সরকার মশাই ?"

সরকার মশাই বলে, "বাবুর নাতির অন্নপ্রাশন।"

"বলেন কী ?" যেন আহ্লাদে আটখানা হয়ে দুলতে থাকে রমেশ। "ওই সে-বছর বাবুর যে ছেলের বিয়ে হল, তারই বাচ্চার অন্নপ্রাশন বোধ হয় ?"

সরকার মশাই বলেন, "হঁ্যা।"

ইচ্ছা হয় রমেশের, দোকানের সব ফুল তুলে নিয়ে সরকার মশাইএর হাতের কাছে ঢেলে দিতে।

রমেশের জীবন যে স্বপ্ন দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছে, সেই স্বপ্নই যে একে একে সফল হয়ে চলেছে। গরিব রমেশ এখনও বিয়ে করেনি। বিয়ে করবার মত কাঁচা বয়স থাকলেই বা কী ? এবং মনে পড়ে, সেই গাঁয়ের একটি মেয়ের মুখ, যাকে বিয়ে করবার জন্য মনের ভিতর অনেক আশা আর ইচ্ছা ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। মনে পড়লেই বা কী ? সে-মেয়ের সঙ্গে রমেশের বিয়ে হতে পারে না। মেয়ের বাবা রমেশের মত এত গরিব পাত্রের হাতে মেয়েকে সঁপে দিতে রাজী নয়।

বাস, জীবনের ওই ইচ্ছার পাট চুকিয়ে দিয়েছে রমেশ। ভালবেসে বিয়ে করা, আর জীবনের সঙ্গিনী নিয়ে ঘর করার স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন হয়েই রয়ে গেল। যাক, তার জন্য কোন দুঃখ নেই। রমেশের জীবনের স্বপ্ন সফল হল না, কিন্তু তার এই ফুলের দোকানের স্বপ্ন ত সফল হয়ে চলেছে। চাটুজ্যে বাবুর বড় মেয়ের কোলে সংসারের সব চেয়ে বড় স্বপ্নের আনন্দ হাসছে। আজ তারই অন্নপ্রাশন।

সরকার মশাই চলে যেতেই রমেশ আর-একবার কয়লাওয়ালা হরনাথ আর মশলাওয়ালা নিকুঞ্জকে টিটকারি দেয়, "দেখলি ত ফুলের কাণ্ড! তোদের মশলা আর কয়লার এই সাধ্যি আছে ?"

"কী হল ?" প্রশ্ন করে হরনাথ।

রমেশ বলে, "মানুষের ভালবাসার কোলে একটা বাচ্চা এনে দিয়েছে আমার ফুল। বিশ্বাস করছিস ত ?"

হরনাথ বলে, "তা কাণ্ডকারখানা দেখে বিশ্বাস করতেই হচ্ছে।"

বেশী দিন পার হয়নি। চৈত্র মাসটা সবেমাত্র পার হয়েছে আর বৈশাখের বেলা একটু বেশী গরম হয়ে উঠেছে, এমনই একটি দিনে ঠিক দুপুর বেলায়

ঝিরঝির করে এক পশলা বৃষ্টি ঝরে পড়ল। ছাতা মাথায় দিয়ে হাজির হলেন সনাতনবাবুর সরকার মশাই, "কিছু ফুল চাই।"

খুশী হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে রমেশ। "নিন নিন, সব রকমের ফুল আছে। মালা, তোড়া, তবক, ঝুঁটি, বাহারে পাতার গুচ্ছ। কী কী চাই?"

কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে সরকার মশাই বলেন, "কুঁড়ি আছে? সাদা ফুলের কুঁড়ি?"

"হ্যাঁ, আছে। কিন্তু কিসের জন্য সরকার মশাই?"

নতুন কেনা দু গজ সাদা মলমলের কাপড় পেতে সরকার মশাই বলেন, "দিন, এই কাপড়েই ঢেলে দিন।

ছোট এক টুকরো নতুন সাদা মলমল, তার মধ্যে শুধু কতগুলি সাদা ফুলের কুঁড়ি বেঁধে নিয়ে যাবার জন্য তৈরী হয়েছেন সরকার মশাই। কী ব্যাপার? এ কি বিশ্রী ভয়ানক ফুল কেনার শখ, থরথর করে কাঁপতে থাকে রমেশের আতঙ্কিত দুটি চোখ।

"কার জন্য এই সাদা কুঁড়ি?" চেঁচিয়ে ওঠে রমেশ।

সরকার মশাই বলেন, "বাবুর নাতিটি এই কিছুক্ষণ হল মারা গিয়েছে।"

সাদা ফুলের কুঁড়ি ঝুরঝুর করে সাদা মলমলের উপর ঢেলে দিয়ে কাঁপতে থাকে রমেশ। তার পরেই ডুকরে কেঁদে ওঠে।

ছুটে আসে নিকুঞ্জ। ছুটে আসে হরনাথ। "কী হল রমেশদা?"

রমেশ চোখ মুছতে মুছতে বলে, "ফুল বড় ভয়ানক; বড় সব্বনেশে জিনিষ রে হরনাথ। এর চেয়ে তোদের কয়লাও যে অনেক ভাল। এ যে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি নিকুঞ্জ!"